সুরেশচন্দ্র সাহা

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন

১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

শ্রীসতীশচন্দ্র শিকদার

বন্দনা ইম্প্রেশন (প্রাঃ) লিমিটেড

৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :

শ্রীকানাই পাল

এই লেখকের ঃ

চেরীফুলের দেশে

মালয় থেকে মালয়েশীয়া
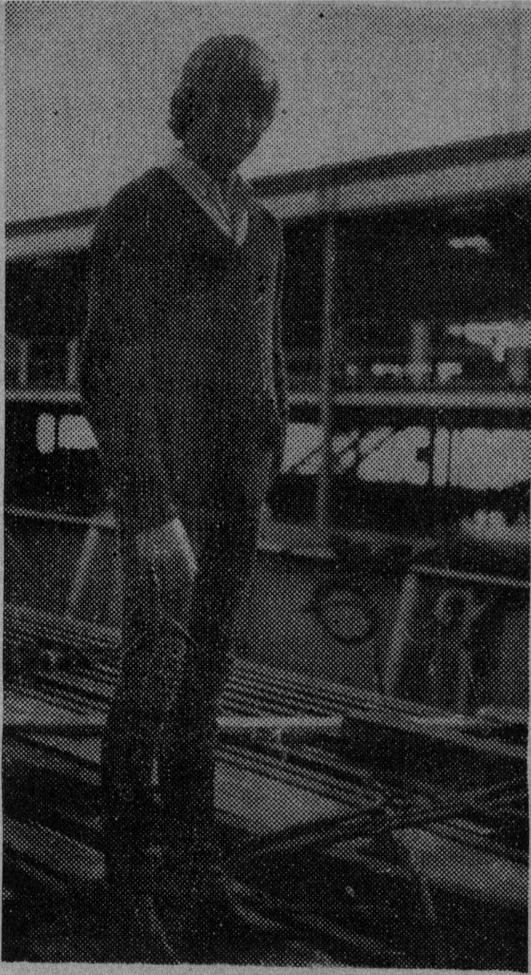
একজন নকল বীট্‌ল! অষ্ট্রেলিয়ার সর্বত্র, বিশেষত মেলবোর্ণে এমন যুবকদের বেশী দেখা যায়।

ক্যাপটেন কুকের বাড়ি। ইংলণ্ড থেকে তুলে এনে মেলবোর্ণে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

মেলবোর্ণ শহরের একাংশ।

॥ এক ॥

একজন খাঁটি অষ্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে আলাপ শুরু হলেই বীয়ারের কথা উঠবে, দেশবিদেশের পানীয়-ঘটিত আলোচনাও কিছু হবে ; তবে বীয়ার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়াবাসী অন্যের কথা লুফে নিয়ে মহোৎসাহে বলবে—'স্ট্রালিয়ান বীয়ার ? মাই ওয়ার্ড, বেস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড !'

অষ্ট্রেলিয়ানরা সত্যি বীয়ার-প্রিয় লোক। দেশে বা বিদেশে দিনে রাতে স্থলে জলে বীয়ার তাদের চাই। বিলেতে গেলেও নাকি সবাই তারা স্বদেশী বীয়ার খুঁজে বেড়ায়, বেশী পয়সা দিয়ে তাই কিনে খায়—স্থানীয় বীয়ার সস্তা হলেও ফিরে তাকায় না। অষ্ট্রেলিয়ানরা নিঃসন্দেহে স্বদেশ-প্রাণ এবং প্রশংসনীয় ত বটেই—যদিও ইংরেজরা এ বিষয়ে অনেকের সঙ্গেই একমত নয়। ভারতে আমরাও কিন্তু হুইস্কি বীয়ার কম গিলি না। তবে সকলেরই মোটামুটি মত এই, বিলেতি জন হেগ, জনি ওয়াকারই আসলি চীজ। অরেঞ্জবুমের বদলে অনেকের অবশ্য ব্যাঙ্গালোরী বীয়ারও চলে, নয়ত শ্রেফ গেলাস গেলাস ধান্যেশ্বরী। মধুর অভাবে গুড়ের মত।

শুধু বেস্ট-ইন-দি-ওয়ার্ল্ড বীয়ার নয়। আরও অনেক কিছুই অষ্ট্রেলিয়ায় আছে—দুধ, মাখন, মাংস, ফল, পশম, গম। লক্ষ্য করবার মত, বস্তুগুলির বেশীর ভাগই খাদ্য তালিকার প্রথম শ্রেণীতে স্থান পায়। আমাদের দেশে অবশ্য এই দুর্লভ সামগ্রীগুলির জন্য লোকের পাব-কি-পাব-না-র মত উৎকণ্ঠাটি কখনই কাটতে চায় না।

শুধু বীয়ার নয়, প্রায়ই শ্রোতাকে শুনতে হবে স্বদেশের নানা জিনিস সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ানদের মন্তব্য—বেস্ট ইন দি সাউদার্ণ হেমিসফেয়ার। অথচ উত্তর গোলার্দ্ধ বাদ দিলে তুলনামূলক বিচারের জন্য কয়টি দেশই বা দক্ষিণ গোলার্ধে আছে। অস্ট্রেলিয়া নামে এমন একটি মহাদেশ যে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের লোনা জল ছুঁয়ে ভাসছে, তাই কি আর কেউ ক্যাপটেন কুকের আগে তেমন করে জানত ? অবশ্য ভূবৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেছিলেন, উত্তর গোলার্ধের জলরাশির মধ্যে যে এত ভূভাগ

রয়েছে তার সঙ্গে ভারসাম্য রাখার প্রয়োজনে দক্ষিণ গোলার্ধের জলে কোথাও-না-কোথাও একটি বৃহৎ ভূখণ্ড থাকতেই হবে—নতুবা উত্তরের পাল্লা সব সময় ভারী হয়ে থাকলে কবে কাত হয়ে পড়ে যাবে। পৃথিবীটা যে আবার ঘুরছে!

কয়েক শতাব্দী আগে কত অভিযাত্রী মানুষই না বেরিয়ে পড়েছিলেন দুনিয়ার দিকে দিকে—হয় আবিষ্কারের নেশায়, নয়ত বাণিজ্যের প্রয়োজনে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত কজনই বা এসেছিলেন? ওলন্দাজ স্প্যানিশ পর্তুগীজ নাবিকদের জন কয়েক কাপ্তান গোছের লোক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল দূর থেকে দেখেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। ১৬০৬ সালে জনৈক ওলন্দাজ নাবিক অবশ্য কুইনস্‌ল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্ক দ্বীপে অবতরণও করেছিলেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আর একজন ওলন্দাজ নাবিক কিন্তু পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মাটি স্পর্শ করেই শিউরে উঠেছিলেন।—কি শুকনো নিষ্করুণ ভূমি, কি কঙ্কর প্রস্তর বালুকাময় স্থান—খাদ্যশস্য নেই, পানীয় জল নেই, কোন ফলের গাছ নেই। কেমন সৃষ্টিছাড়া দেশ। নরদেহধারী কিছু জীবও তাঁর চোখে পড়েছিল—উলঙ্গ কুশ্রী বর্বর সব মানুষ, যাদের দেখলে স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণও জীব-না-শিব বলতেন কিনা জানি না। এরাই অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, পরবর্তীকালে সাধারণ্যে প্রচলিত নাম ব্ল্যাক্‌স। বলাবাহুল্য, এমন দেশে বসবাসের আর্কষণ সেই ওলন্দাজ নাবিক এবং তাঁর সঙ্গীদের একটুও জন্মেনি, তার সঙ্গে আর কেউ কোন যোগাযোগ রক্ষার কথাও ভাবে নি। কারণ যোগাযোগের প্রধান সূত্র যে তখন শুধু বাণিজ্য তা কার সঙ্গেই বা চলবে, এবং কি বস্তুর বিনিময়ে? ভগবান যিশুকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁরা পত্রপাঠ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। সেদিন যোগাযোগ চিরতরে বন্ধ না হলে হয়ত কোন অনতিদূর ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্য একটি শাখা এদিকেও প্রসারিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, রাজ্য বাণিজ্য কিছুই গড়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত এমনি অলক্ষ্যে আরও দেড় শতাধিক বছর চলে গেল। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় এলো ইংরেজ। সেদিন ওলন্দাজদের ফিরে যাওয়ার জন্য ইংরেজরা প্রভু যিশুকে হয়ত বার বার ধন্যবাদ দিয়েছিল।

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ অস্ট্রেলিয়া—দ্বীপতনু মহাদেশ। পূবে পশ্চিমে তিন হাজার মাইলের ব্যবধান, উত্তর দক্ষিণে আড়াই হাজার মাইল। বার হাজার

ছুইশ দশ মাইল তার উপকূল রেখা। ভারতবর্ষের উপকূল সে তুলনায় তিন হাজার ছয়শত মাইল। বিচিত্র দেশ অস্ট্রেলিয়া। অবস্থানের দিক দিয়ে এশিয়ার সঙ্গেই তার প্রতিবেশীত্ব, কিন্তু অধিবাসীর দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়া আসলে ইউরোপীয়। চৌত্রিশটি শ্বেতকায় জাতির সংমিশ্রণে অস্ট্রেলীয় জাতির উদ্ভব। জাতীয় ভাষা ইংরেজী হলেও ইটালীয় গ্রীক পর্তুগীজ জার্মান যুগোশ্লাভ ফরাসী—এই ভাষাগুলিও চলে। তবে এসব হচ্ছে অন্তর্লোকের ভাষা, আপন আপন গণ্ডীর লোকের মধ্যে যার ব্যবহার সীমায়িত।

তখনও এই দ্বীপ-মহাদেশকে লোকে বলত নিউ হল্যাণ্ড। ওলন্দাজরা এখানে নেমেছিলেন মাত্র। ঠিক আক্ষরিক অর্থে দেশ আবিষ্কার করেন নি। সত্যিকারের আবিষ্কার বলতে যা বোঝায় তা করেছিলেন ইংলণ্ডের এক ভাগ্যান্বেষী নাবিক—ক্যাপটেন জেমস কুক। ইয়র্কশায়ারের গ্রেট আইটন গ্রামের এক গরিব ঘরে তাঁর জন্ম। কুক ছিলেন দূর দিক চক্রবালের স্বপ্নচারী—অন্তরে ছিল লোনা জলের বেদনাভার।

ক্যাপটেন কুকের স্মৃতি বিজড়িত সিডনির বোটানি-বেতে একদিন গিয়ে দেখেছিলাম বহু রক্তের ছড়াছড়ি। একটি মোটর গাড়ি বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। আর মাঠের মাটিতে বেড়ার খুঁটিতে কয়েক ঘণ্টা আগের বাসি রক্ত বেশ ঘন হয়ে লেগে আছে। একজোড়া যুবকযুবতী সৈকতবিহারের নেশায় জ্ঞানহারা হয়ে ছুটে এসে কেমন পিষ্ট হয়ে মরেছিল, পরিত্যক্ত গাড়ির জীর্ণদশায় ছিল তারই স্বাক্ষর। হয়ত ঘটনার সময়ে ভিড়ও খুব জমেছিল, লোকের চোখেও জল এসেছিল; কিন্তু আমরা গিয়ে তখন দেখলাম, ওদিকে আর কারও তেমন মনোযোগ নেই। অদূরের মাঠে এ যুগের সভ্যতালোকিত একজন আদিম অধিবাসী তখন ব্যুমেরাঙ ছুঁড়ছিল এবং তাকে ঘিরে বিশাল জনতা হাঁ করে সেই কৌশল দেখছিল। দর্শকদলে ছিল অনেক বিদেশী।—অস্ট্রেলিয়াতে এসেছে, অথচ ক্যাঙারু আর ব্যুমেরাঙ নিক্ষেপ দেখেনি এমন কথা ভাবা যায় না, বিশেষত একজন আদিম অধিবাসী যখন ব্যুমেরাঙের খেলা খেলে।

সেই বোটানি-বে, আদিম অধিবাসী; সেই রক্ত আর ব্যুমেরাঙ। স্মরণ করলাম ক্যাপটেন কুককে। একশ' পঁচানব্বই বছর আগে তিনি এইখানে জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় অল্প-জখম জাহাজ-খানার মেরামতের কাজ চলছিল। সে দৃশ্য দেখে আদিম অধিবাসীরা অবাক

নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সাতবছর পর গভর্ণর হান্টারের সঙ্গে দুইজন যুবক স্বেচ্ছায় সিডনিতে এসেছিলেন—বৃটিশ নৌবাহিনীর অফিসার জর্জ বাস এবং ম্যাথু ফ্লিণ্ডার্স। সিডনি থেকে এই দুইজন তরুণ নাবিক একটি ছোট্ট নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর দীর্ঘ সাতবছর পর্যন্ত তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলভাগ জরিপ করলেন। ইংলণ্ডে ফিরে ফ্লিণ্ডার্স তাঁর সমুদ্র জীবনের দুঃসাহসিক কাহিনী অবলম্বনে একটি বই লিখে নাম দিলেন তার 'ভয়েজ টুটেরা অষ্ট্রালিজ'। তখনও এই নতুন মহাদেশের পশ্চিম দিকটাকে নিউহল্যাণ্ড এবং পূর্ব ভাগকে নিউ সাউথ ওয়েল্স বলা হচ্ছিল। ফ্লিণ্ডার্স ভাবলেন, সমগ্র দেশের একটি মাত্র নাম থাকাই বাঞ্ছনীয়। তিনি নবাবিষ্কৃত এই ভূভাগটিকে অষ্ট্রেলিয়া বলে উল্লেখ করতে লাগলেন। ক্রমে অষ্ট্রেলিয়া নামই কায়েম হল। এইখানে বলা প্রয়োজন, অষ্ট্রেলিয়াবাসী এই দুঃসাহসী দুই নবীন অভিযাত্রীর উপযুক্ত মর্যাদায় স্মৃতিরক্ষা করেছেন। উভয়ের ধন্য নামে বহু রাস্তাঘাটের নামকরণ ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া টাসমেনিয়ার মধ্যবর্তী প্রণালীটিকে আজ বলা হচ্ছে বাস-ষ্ট্রেট। এডিলেডে সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে ম্যাথু ফ্লিণ্ডার্সের নামে—দি ফ্লিণ্ডার্স ইউনিভারসিটি।

অনেকদিন পর কুক দেশে ফিরলেন। তাঁর অভিযানের কাহিনী ইংলণ্ডের লোকের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলল। সবাই ভাবল—বেশ ত একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। জনতার সঙ্গে সঙ্গে রাজা তৃতীয় জর্জও খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

১৭৭২ সালের ২রা জুলাই কুকের জাহাজ আবার সাগরে ভাসল। কুক আবার এলেন তাইহিতি। তাইহিতির লোকেরা আবার তাঁকে উচ্ছ্বসিত স্বাগত জানাল, আর তাঁর সঙ্গে পরম বন্ধুর মত ব্যবহার করল। কুকের কিন্তু মনে হল এই দ্বীপবাসীরা একটুও বদলায় নি। তারা তেমনি বন্ধু-বৎসল, তেমনি চৌর্য পরায়ণ, তেমনি বর্বর। আর নাবিকেরা ভাবল, তাইহিতির মেয়েগুলি ঠিক তেমনি মিষ্টি।—তারাও একটু বদলায় নি! তাইহিতির সেই মিষ্টি মেয়ে, সেই নীল জল, সেই নারিকেলী কুঞ্জবনের আহ্বান আজও নাকি কত মানুষকে ঘরছাড়া করে। সেই ট্র্যাডিশন আজও নাকি তাঁর বজায় আছে।

কুক এবার তাইহিতি থেকে নিউজিল্যাণ্ড, নিউ হেব্রাইডিস, নরফোক দ্বীপ ঘুরে ঘুরে একেবারে দক্ষিণ মেরু সাগর পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। দেশে তখন তাঁর জবর নামডাক। প্রচুর সম্মান মিলল, প্রচুর অভ্যর্থনা

তিনি পেলেন। ঠিক এমনি করেই কিন্তু কুক ক্লাইভ নেলসনদের কাহিনী ইংলণ্ডবাসীদের মনে বার বার দাগ কেটেছে। ইংলণ্ডের অপরাধী অপসারণের নিছক প্রয়োজনে অষ্ট্রেলিয়াতে ইংরেজদের আগমন ঘটেছিল। সেখানকার মাটিতে যেদিন ফলের গাছ জন্মাল, গমের চাষ হল, অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়ার পশম ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রী হল, তখনই অনেক স্বাধীন মানুষ এবং ব্যবসায়ী সেখানে গেল। শুরু হল নতুন যুগ। কুক অষ্ট্রেলিয়ার এই দিগন্তে সেই নবযুগের উদ্গাতা। তাই হয়ত অষ্ট্রেলিয়ার কথায় কুকের কাহিনী কিছুটা না বলে উপায় নেই।

১৭৭৬ সালের জুন মাসে কুকের তৃতীয় ও শেষ অভিযান শুরু হল। উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ক্যাপটেন কুক সদলবলে এলেন টাসমেনিয়াতে। তারপর নিউজিল্যাণ্ড হয়ে আবার এলেন তাইহিতি। এবার দেখলেন, ওলকপির যে বীজ তিনি রেখে গিয়েছিলেন, দ্বীপবাসীরা তাই থেকে প্রচুর ওলকপি ফলিয়েছে, তবে শূয়োর মুর্গীগুলো বংশবৃদ্ধি করার আগেই উদরসাৎ করে ফেলেছে।

তাইহিতি থেকে যাত্রা শুরু হল বেরিং প্রণালীর দিকে। প্রচণ্ড তুষার-পাতের ফলে আর এগোতে না পেরে পিছিয়ে এসে ক্যাপটেন কুক উঠলেন হাওয়াই দ্বীপে, শুধু একটু দম নিতে। হাওয়াইয়ের লোকেরা কুকের জাহাজ থেকে প্রায়ই এটা ওটা চুরি করতে লাগল। কুক একদিন দ্বীপের রাজাকে ধরে আনলেন। পেছনে তাঁর বিক্ষুব্ধ জনতা। রাজাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি জাহাজের দিকে এগোলেন। একটি বর্বর এসে পেছন থেকে সজোরে আঘাত করতেই কুক জলে পড়ে গেলেন। উত্তেজিত হাওয়াইবাসীরা ছুরির আঘাতে তাঁর দেহটি সহস্র টুকরায় কেটে ফেলল। সেদিন ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৯ সাল।

হতভাগ্য ক্যাপটেন কুক আর দেশে ফিরলেন না, কিন্তু দেশের লোকের দৃষ্টি ফেরালেন দুনিয়ার এই দিগন্তে। অষ্ট্রেলিয়ার ভিত্তিস্থাপনের মূলে রয়েছে কুকের সব দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। তখন ভারতবর্ষ নামে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতাভিমানী দেশটি মোগলের দাসত্ব থেকে সবে ক্লাইভের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল, আর চিরদিনের আত্মবিস্মৃত বাঙালীরা বসে বসে ধুকছিল। ক্লাইভের কাহিনীও ইংলণ্ডের মানুষদের তখন খুবই আনন্দ দিয়েছে।—সে হচ্ছে ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্যের কাহিনী,

হিরাঝিল মতিঝিলের কাহিনী, হারেমের বেগমদের ব্যভিচারের কাহিনা— যদিও মুর্শিদাবাদ থেকে নৌকাভরা সোনাদানা হীরামুক্তা পান্না জহরত ইংলণ্ডে পাচার করার কাহিনী স্বদেশের জনসাধারণের কাছে ক্লাইভের লোকেরা মোটেই কাহিনীর মত প্রচার করে নি।

॥ দুই ॥

সিঙ্গাপুর থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে প্রথমে দক্ষিণ পূবে পাড়ি জমিয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় গা ঘেঁষে এগোতে হয়। তারপর সোজা দক্ষিণে নেমে সুণ্ডা প্রণালী অতিক্রমের পালা; সুমাত্রা আর জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী অতি সঙ্কীর্ণ সুণ্ডা প্রণালী।

ভূমধ্যসাগর থেকে আটলান্টিকে প্রবেশের মুখে জিব্রালটারের মত সুণ্ডা প্রণালীর গুরুত্বও অসীম। চারশ বছর আগের ওলন্দাজ পর্তুগীজ ইংরেজ বণিকদের অনেক নৌতৎপরতার সাক্ষী অপ্রশস্ত এই প্রণালীটি ইন্দোনেশিয়ার এক্তিয়ারে। সুকর্ণের আজ্ঞাবহ নৌকর্মচারীরা গোটা কত সাবমেরিণ নিয়ে সাম্প্রতিককালে রাত্রিদিন এই জলপথটুকু পাহারা দিয়েছেন, আর নাম ধাম পরিচয় জানবার অছিলায় বিদেশী জাহাজীদের শাসিয়েছেন—যেন 'ইচ্ছা করলেই ডুবাতে পারি' এমনি একটি ভাব। সাবমেরিণের কর্মচারীরা যখন দূরবীন দিয়ে দূরাগত জাহাজ দেখে তৎপর হয়ে উঠেছেন, সে দৃশ্য সুকর্ণ কখনও দেখেছেন বলে মনে হয় না।—সেই নৌতৎপরতা অব্যাহত রাখা উচিত কিনা, বোগোর প্রাসাদের বিলাসের মধ্যে সে কথা হয়ত কখনও তিনি ভাবেন নি। ইন্দোনেশিয়ার পাশ দিয়ে জাহাজে করে যেতে যেতে বিদেশীরা আজও আলোচনা করে জনৈক ইস্কুল মাষ্টারের পুত্র সুকর্ণের কথা। তাদের অনেকেই হয়ত ইন্দোনেশিয়ার আর কোন কথা তেমন করে জানে না, অথবা জানলেও তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সুকর্ণ দীর্ঘদিনের নামভূমিকার মঞ্চচারী, যদিও শেষ অঙ্কের সূচনায় দুরূহ জটিল অন্তর্বিপ্লবের ঝড়ে বোগোর প্রাসাদ বার বার তাসের ঘরের মত নড়বড় করে উঠেছে।

সুকর্ণের পিতা ছিলেন জাভাদ্বীপের লোক, কিন্তু মা তাঁর বালীদ্বীপ-বাসিনী। মা আর বাবা মিলে বালক সুকর্ণের কানে কানে একটি চরম মন্ত্র

দিয়ে রেখেছিলেন—বৎস তুমি রামা-শ্যামার মত সাধারণ নও—যে কোন কারও তুলনাতেই তুমি উন্নত স্তরের লোক। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর সেরা গুণাবলী, বাগ্মীতা, ওলন্দাজ-বিতাড়নে তাঁর কৃতিত্ব—এ সব কথার মধ্যে বড় কেউ না গিয়ে সবাই সকৌতুকে আলোচনা করে তাঁর জীবনের নারী-ঘেঁষা অধ্যায়গুলি। প্রথম স্ত্রী গ্রহণকালে সুকর্ণের বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। অল্প সময়ের মধ্যেই সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের চাইতে দশ বছরের বড় আর একটি মহিলার তিনি পানিপীড়ন করেন। অবিলম্বে তাঁকেও ত্যাগ করে ষোল বছরের সুন্দরী পদ্মাবতীকে সুকর্ণ বিয়ে করেন। মেঘবতী তাঁরই মেয়ের নাম। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকন্যা নিয়ে ঘর করতে করতে তিনকাল গিয়ে যখন এককালে ঠেকেছে, সুকর্ণজীবনের নতুন প্রেমাভিসার তখন আবার শুরু হয়েছে জাপানের ভ্রাম্যমান প্রবাসে। নাইট ক্লাব খদ্দেরের খেদমদকারিনী টোকিওবাসিনী এক জাপ-নারীকে বিয়ে করে এনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জাকার্তার সরকারী ভবনে। পেয়ার করে নাম দিয়েছেন রত্নাদেবী। রত্না দেবী যখন পাটরাণীর আদরে লালিত, আহাম্মদ সুকর্ণের তখন পদ্মাবতীসহ আর তিনটি স্ত্রী বিদ্যমান—আর তাঁর নিজের বয়স তখন ষাটের উপর!

সুকর্ণের নারীপ্রিয়তা বিশ্ববিদিত। পশ্চিমী রাষ্ট্রনেতাদের মোটামুটি মত এই, সুকর্ণ হচ্ছেন সত্যিকারের 'সিডিউসার অব গার্লস'। পার্টিতে তাঁকে আমন্ত্রণের ভরসা তাঁরা কোনদিনই পান নি। পাছে বা কোন কেলেঙ্কারী ঘটে। কিন্তু সারা জীবনে সুকর্ণ এসব পরমত থোড়াই কেয়ার করেছেন। তিনি একটি জাতির শুধু দীর্ঘ দিনের কর্ণধারই নন সুকর্ণ বিশ্বের এক বিশেষ নাম। তাঁর পদবী নেই, নামের আগে-পিছে অন্য কোন পদও নেই। তিনি অমুকচন্দ্র অমুক নন, শুধুই চন্দ্র—বিশ্বভুবন আলো করা। শুধু নিন্দুক লোকের ধারণা, সব আলোই তাঁর ধার করা। ইন্দোনেশিয়ার উপকূল দেখে দেখে জাহাজে এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরাও শুধু তাঁর কথাই আলোচনা করেছিলাম। কারণ ইন্দোনেশিয়ার অন্য কোন বিশেষ কথা আমরাও যে খুব একটা জানি, চলমান জাহাজের লাউঞ্জে বিলম্বিত আলোচনায় তেমনটি বোধ হল না। তাছাড়া নারীপ্রিয়তাও ত কারও কম নয়।

সুণ্ডা প্রণালীর সহজ পথে পাড়ি না জমিয়ে আমাদের কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে হয়েছিল ভিন্ন পথে। ডাইনে সুমাত্রা জাভার শাখা প্রশাখায় বহুবিস্তৃত

দ্বীপপুঞ্জ। বাঁয়ে বোর্ণিও সেলিবিস মালুক্কাসের মধ্যে পূব দিকে চলতে চলতে দেখতে পেলাম পাল-তোলা অজস্র সেকেলে নৌকো দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে পাড়ি দিচ্ছে ঠিক কয়েক শতাব্দী আগেকার প্রাক-কালের জাহাজ যুগের মত। মনে হল, স্বর্ণ যুগে ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের উন্মাদনায় যে এটম আসার কথা প্রচার হয়েছে, সে খবর বোধ হয় পালে-চলা জাহাজীদের কাছে এখনও পৌঁছায় নি।

জাভা দ্বীপের শেষের প্রান্তে অখ্যাত এক দ্বীপশিখরে একটি স্তিমিত প্রায় আগ্নেয়গিরি চোখে পড়ল। গিরি গহ্বর থেকে আগুনের রক্তিম শিখা ক্ষীণ শক্তিতে উদ্গীরিত হচ্ছে। তাকে ছাপিয়ে ঘন বাষ্পায়িত রাশি রাশি ধোঁয়া বেগে উপরে উঠে আকাশের অনেকখানি গ্রাস করে ফেলেছে। দশ মাইল দূর থেকে দেখে মনে হল, ধোঁয়াটে মেঘপুঞ্জের ভার কমজোরি আকাশটি আর যেন কিছুতেই বইতে পারছে না। আরও এগিয়ে উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার পাহাড়ী উপকূল চোখে পড়ল। তৃণগুল্ম বৃক্ষলতাহীন কঠিন খাড়া পাহাড়ের উপকূল। ভূবৈজ্ঞানিকদের মতে উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চলটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূভাগ। সাগরজলের উপর সর্বাগ্রে মাথা তুলে উঠেই যেন বলেছিল—এই যে, আমি উঠেছি।

উত্তর খণ্ডের সমস্ত অষ্ট্রেলিয়া অতিক্রম করে নিউগিনি বাঁয়ে ফেলে আমাদের জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করে দক্ষিণগামী হয়ে টাউন্‌স্‌ভিলে পৌঁছাল। পুরো তিন দিন জাহাজ চালিয়ে পাইলট নেমে গেলেন। কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডের পূবে অনতিদূরের সাগরে শুরু হয়েছে গ্রেট বেরিয়ার রীফ—সেই বহুল আলোচিত প্রবাল প্রাচীরের এলাকা, নৌচালনের পক্ষে যা বিষম বিঘ্নবিপদের স্থান। ক্যাপটেন কুক কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডের উপকূল ধরে এগিয়ে চলার পথেই বিপদে পড়েছিলেন গ্রেট বেরিয়ার রীফে। আমরা তাঁর প্রায় দুইশ বছর পরে সেই একই পথ অতিক্রম করলাম কত নির্বিঘ্নে, পাইলটের উপর কত সহজে নিজেদের নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দিয়ে।

জানুয়ারী মাস। টাউন্‌স্‌ভিলে ঘোর গ্রীষ্মকাল। মেলবোর্ণ নয়, সিডনি নয়, একেবারে অবিদগ্ধ টাউন্‌স্‌ভিলে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার মাটির প্রথম স্পর্শ পেলাম। টাউনসভিলের সূর্যতাপে দিক্‌দিগন্ত ঝলমল করে, তবে ঝলসায় না। একশ পাঁচ ডিগ্রীর তাপেও গা-জ্বলা গরম নেই। ঘাম

নেই, ঢক ঢক করে জল পানের আকণ্ঠ পিপাসা নেই। আম আনারস কলা পেঁপে খেয়ে খেয়ে কিন্তু মনে হল, যেন জ্যৈষ্ঠ মাসের বাঙলা দেশে আছি। শুধু দিনের তাপে ছিল না জ্যৈষ্ঠের গুমোট গরম।

অষ্ট্রেলিয়ায় পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীর মত নদী নেই। টাউনসভিলের অধঃসীমায় একদিন অলস চরণে ঘুরতে ঘুরতে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। একটি ক্ষীণকায় খাল—তীরে তীরে উইলো গাছ ঝুঁকে আছে, আর বাঁকে বাঁকে স্রোতহীন জল স্থির হয়ে আছে। আধসের তিনপো সাইজের রূপালী রঙের আইসযুক্ত হাজার হাজার মাছ পুচ্ছ নাচিয়ে ঘুরছে। ধরবার কেউ নেই। মনে হল, ১৯৬৫ সালের ১০ই জানুয়ারী বেলা ৪টা বেজে ১০ মিনিটে আমরা কি মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি, অথবা কোন দূর-গ্রহের প্রাগৈতিহাসিক যুগে? এ কেমন করে সম্ভব, লোক চক্ষুর সামনে মনলোভন মৎস্যকুল এমনি করে পাখনা মেলে ভেসে ভেসে কিনারায় এসে মরা গাছের পচা পাতা খাবে, আর মানুষ দাঁড়িয়ে তাই দেখে আনন্দ করবে? মৎস্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙলা দেশ হলে—থাক সে কথা।

যে অষ্ট্রেলিয়াতে অধুনা সমৃদ্ধ অবস্থায় অন্তত দশ কোটি লোক দুধে ভাতে থাকতে পারে, সেখানে মাত্র আছে এক কোটি পনেরো লক্ষ লোক। বাড়তি দুধ মাখন পনির ফল মাংস পশম চাল গম অষ্ট্রেলিয়া থেকে বাইরে চালান করে এরা দুই হাতে পয়সা লোটে। ভাবলাম, তুচ্ছ মাছ ধরে এরা করবেটাই বা কি। স্যুট পরা টুপি-মাথায় ছিপ-হাতে অষ্ট্রেলিয়ানদের অনেকের কাছেই মাছ ধরা একটি শৌখিন খেলা, বন্দুক নিয়ে পাখী শিকারের মত। কলকাতায় যখন শীতের ফসল আলু কপি টম্যাটো অপর্যাপ্ত পেয়েও মাথায় হাত দিয়ে লোকে ভাবে মাছ তেল চালের মনুষ্য সৃষ্টি দুষ্প্রাপ্যতার কথা, তখন ট্রপিক্যাল কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে আমের ফলারে দিব্যি জামাই ষষ্ঠী জমিয়ে তোলা যায়।

টাউন্‌স্‌ভিল ছোট শহর। তার দিগন্তজোড়া খাড়া পাহাড়, প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জল, আকাশের নীলিমা, স্বচ্ছ সুন্দর দিনের স্নিগ্ধ হাওয়া, আম কৃষ্ণচূড়া জবা গাছের ফুলন্ত বাহার—এই সব দেখে দেখে ভাবছিলাম, টাউনস্‌ভিলের বন্দর থেকে কত হাজার টন পশম মাংস দুধ গম রোজ বিদেশে চালান হচ্ছে, তার সূক্ষ্ম হিসেব সংগ্রহ করে কিই বা হবে। বরং দিনের আলোয় টাউন্‌স্‌ভিলকে দেখে নেওয়াই ভাল।

টাউন্‌স্‌ভিলের শ'দুয়েক মাইল দূরে দেখতে গিয়েছিলাম পোর্ট আলমা। সেখানেও আকাশ টাউন্‌স্‌ভিলের মত নীল, বাতাস তেমনি স্নিগ্ধ। শুধু একটি ভীতিপ্রদ বস্তু পোর্ট আলমার ভালর দিকটাকে অনেকটা যেন চিরদিনের মত আড়াল করে রেখেছে—আধা-ভাঙা সুজী-সাইজের কালো কালো কীট; ঝাঁকে ঝাঁকে গায়ে বসে কুট কুট করে কামড়ায়। সে এক গা-জ্বলা চুলকানি-ওঠা কামড়। কেউ বলে না দিলে ধরবার উপায় নেই কিসে বা কামড়ায়। এই কীটের নাম স্যাণ্ড ফ্লাই।

পোর্ট আলমাতে ছোট একটি ব্যাপার ঘটল। বৃদ্ধ গোছের একজন লোক কিছুটা অন্যমনস্কের মত এগিয়ে এলেন—হাতে তাঁর বড় একটি কাঁকড়া। টুকটাক আলাপের পর বিনয়ের সুরে বৃদ্ধটি বললেন—এটার বদলে কিছু খুচরো পয়সা দিতে পার, ভারতীয় পয়সা? ভাবতে লাগলাম কাঁকড়া, পয়সা, কাঁকড়ায়-পয়সায় বিনিময়—ব্যাপারখানা কি? তার চেয়ে বৃদ্ধটি সোজা কেন বলছেন না—কাঁকড়াটি আমি বেচতে চাই। অবশ্য অল্প পরেই জানলাম, কাঁকড়া-বিক্রীর কোন কারবারই তাঁর নেই; বিনিময় প্রস্তাবের পেছনে অন্য একটি কারণ আছে। ভারতীয় টাকা, জার্মান মার্ক, জাপানী ইয়েন, রুশীয় রুবল ইত্যাদি সংগ্রহ করা অষ্ট্রেলিয়ানদের বড় বাতিক, দেশ বিদেশের ডাকটিকিট আর ম্যাচ বাক্স জড় করার মত মস্ত একটি হবি। এর জন্য হয়রান হয়ে ছোটরাও কিন্তু রাতদিন যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। আবার দেশের পয়সা বদল করে বা চিত্তাকর্ষক কোন বস্তু দিয়ে বড়রাও এইসব যোগাড় করে দেন। সেদিনের কাঁকড়া-হাতে বৃদ্ধটি ছিলেন এক শ্রমিক। পোর্ট আলমার জাহাজ ঘাটে মাল ওঠানামার কাজ করতে করতে বৃদ্ধ নজর রাখেন মাছ, ম্যাচবাক্স, ডাকটিকেট ইত্যাদির দিকে। মাংসের টোপ দিয়ে বাঁশের দাঁড়কির মত লোহার খাঁচা ডকের জলে ডুবিয়ে রেখে একদিন পর পর তুলে প্রায়শ তিনি দেখেন বড় বড় মাছ বা খুব লোভনীয় কাঁকড়া। সেদিন বাড়িতে ত রাজসিক ভোজ হয়। বৃদ্ধের ধারণা, এমন বোম্বাই-সাইজ কাঁকড়া দিলে বিদেশী লোকেরা খুশি হয়ে তাঁর নাতির জন্য টাকাটা সিকিটা নিশ্চয়ই দেবে!

বৃদ্ধটি প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন। দুটি সেদ্ধ ডিম, অঢেল মাখনে প্রলিপ্ত রুটি, একবোতল দুধ, একটি আপেল। এই হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম-দেখা কুলী লোকের প্রাতর্ভোজন। দিন গেলে এরা নাকি পঞ্চাশ টাকার

মত মজুরি পায়। বিচিত্র নয়, কাজের ফাঁকে কুলী লোকেরা জাহাজের ফলকা থেকে এটা ওটা সরাবার ফিকির খোঁজে না—কাজের শেষেও গোটা কত খালি বোতল মহাসম্পদ বলে কুড়িয়ে নেয় না ; সামান্য চুরি ছেঁচড়ামির কথা ভুলেও ভাবে না। আমাদের মানুষদের যদি বা বহু ভাগ্যে একটি কাজ জোটে, পয়সা মেলে প্রায়ই কম। ওদিকে মানুষে অফিসারে আয়ের ফারাকও অনেক। এই সব মানুষ একেবারে নির্ভেজাল সৎ হবে বলে আমরা দাবী করি। যে পুলিশ কনষ্টেবলের মাসিক বেতন আশী টাকা, তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার হয়ত এক টাকা। এরা ঘুষ খাবেনা, 'রোজ দাঁড়ি কামাবে, ধোপ-দুরস্ত ইউনিফরম এবং মুখ-দেখার-মত পালিশ-করা জুতো পরবে—আবার বছর-বছর ছেলে-হওয়া সাত আট জনের সংসার চালাবে। কি বিচিত্র !

সদা-হাসি সদালাপী বৃদ্ধ শ্রমিকটি প্রাতরাশ সেরে আবার আলাপ শুরু করলেন। তিনি একজন পুরোপুরি অষ্ট্রেলিয়ান; অষ্ট্রেলিয়া তাঁর আপন জন্মভূমি। সেই কোন্ সুদূর অতীতে তাঁর ঠাকুর্দা স্কটল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছিলেন, ঠাকুমাকে বিয়ে করে এনেছিলেন জার্মানী থেকে। নিজেও তিনি বার দুই ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। কিন্তু কোন দেশই তেমন ভাল লাগে নি, কোথাও বেশীদিন তাঁর মন টেকেনি। হঠাৎ বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করলেন—অষ্ট্রেলিয়া তোমার কেমন লাগছে ? আমি বললাম —ভাল। এমন সংক্ষিপ্ত উত্তরে খুশি না হয়ে আবার তিনি বললেন— শুধু ভাল কি গো ? পৃথিবীর সেরা দেশ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। এমন দেশ কি আর আছে কোথাও ? আমি বললাম—আছে। আমাদের ডি-এল রায়ের কবিতায় !

পোর্ট আলমায় দুইটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। একজনের নাম লিজা অর্থাৎ এলিজাবেথ, আর একজন পামেলা। দুই জমজ বোন। আশী মাইল দূরে গ্লাডষ্টোন শহরে বাড়ি। ইস্কুল ছুটি থাকায় বাবার সঙ্গে এসেছে তাঁর কর্মস্থল দেখতে, আর ডাক-টিকেট সংগ্রহ করতে। একটি পুলের উপর দাঁড়িয়ে ওরা ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। একটি মাছের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ মাছটি খেতে কেমন ? লিজা একটু হাসল, যেন ভাবখানা এই—এটা কি আবার একটা প্রশ্ন ! তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল—সব মাছই ত আমাদের মুখে একই রকম লাগে।

এটার আবার কোন বিশেষ স্বাদ আছে বলে ত ভাবতেই পারি না। আমি বললাম—তা কি হয়? আম আর আমড়া কি একই পদার্থ? ওরা স্বীকার করল যে এক পদার্থ নয়। তবে ভাব দেখে মনে হল, কি করে যে এক পদার্থ হতে পারে না সেই সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

কথায় কথায় লিজা আর পামেলা ছিপ গুটিয়ে নিল। তারপর বলল—এখানকার মরীচিকা দেখেছ? অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম। মরুভূমি কোথায়, যে মরীচিকা দেখা যাবে? তবু ওদের সঙ্গে এগিয়ে চললাম পীচ-ঢালা পথে। দুপাশে ধূ ধূ করা মাঠ। মাথার উপর মধ্যদিনের সূর্য। নির্মল নির্মেঘ আকাশ। পোর্ট আলমার উপর দিয়ে মকর ক্রান্তি চলে গিয়েছে। এখানে সূর্যের আলোয় তেজ আছে, তবে দাহিকা নেই। কর্কট রেখার অবস্থানে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কল্পনা প্রবণ কিশোর বয়সে একদিন ভেবেছিলাম—আজ এই যে কর্কট ক্রান্তি ছুঁয়ে আছি, এমন একদিন কি আসবে, যখন এমনি করেই মকর ক্রান্তি চিহ্নিত মাটি স্পর্শ করতে পারব? একদিন তাও সম্ভব হল। কিন্তু সেই কিশোর দিনের কর্কট শিহরণের পরিবর্তে অনুভব করলাম একটি ভিন্ন অনুভূতি। সামনে তখন মরুমায়া।

পোর্ট আলমার এই অঞ্চল এককালে ছিল সমুদ্রের গর্ভে। ক্রমে একটি সমভূমি জেগে উঠল। ভূমি সংযোজনের উদ্দেশ্যে মানুষ এইখানে আজ বাঁধ বেঁধে হাজার হাজার একর জমি পৃথক করে ফেলেছে। জল শুকিয়ে জমির উপর নুন কনার ঘন সংহত স্তর পড়ে গেছে, শীতের দেশে বরফজমা সমভূমির মত। মরু নেই, মরূদ্যান নেই—শুধুই মরীচিকা, বিরাট প্রান্তরের শেষ দিগন্তে লবণ মাটির উপর অনন্ত জল প্রবাহের মিথ্যা আহ্বান। জলের চেয়েও 'জলন্ত' তার সিক্ত আকর্ষণ। দিনের সূর্য এই মায়া-নদীকে ফোলায়। রাতের চন্দ্র তাকে শুঁষে নেয়।

ক্যাপটেন কুকের সিডনি উপকূলে অবতরণের প্রায় বিশ বছর পর অস্ট্রেলিয়াতে জনবসতি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল।—ইংলণ্ডের দ্বীপান্তরিত বন্দীদের উপনিবেশ। তারপর কত স্বাধীন মানুষও এসেছে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে। অবশেষে একদিন সোনার খনি আবিষ্কার হল। শুরু হল গোল্ডরাশ, সোনা কুড়িয়ে বড়লোক হওয়ার লোভে দলে দলে লোকের পাগলা অভিযান। পামেলাদের পূর্বপুরুষ কিন্তু সে যুগে অস্ট্রেলিয়াতে

শুভাগমন করেনি। মাত্র আট বছর আগে লণ্ডন শহরতলীর ঘরসংসার গুটিয়ে ওদের পরিবার এসেছে অষ্ট্রেলিয়ার গ্লাডষ্টোনে। অনেক আলাপের পর কিন্তু মনে হল, দেশ ছেড়ে এলেও আর সব মানুষের মত অষ্ট্রেলিয়ান না হয়ে ওরা মনেপ্রাণে রয়েছে আত্মম্ভরী ইংলিশম্যান। এখন ভাগ্য ফিরেছে। বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে। ঐহিকের অনেক কামনাই পূর্ণ হয়েছে। অথচ এই জনমানবহীন মুল্লুকে ওদের মত অভ্যাগতের জন্য অধুনা সমৃদ্ধিগুলি যারা তিলে তিলে গড়ে তুলেছে, তারা কিন্তু কনভিক্ট —লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডভোগী নিষ্পেষিত মানবতা। অষ্ট্রেলিয়ার কথায় অবশ্য সে কাহিনী আরও বিশ্লেষণের অবকাশ আছে। সেদিন পামেলার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—দেশ ছেড়ে হঠাৎ ষোল হাজার মাইল দূরে এসে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত কেন করলেন? জবাবে ভদ্রলোক অবশ্য সহজ সুরেই বললেন—ইংলণ্ডের শীত অসহ্য বলে চলে এসেছি এই সূর্যালোকের মুল্লুকে। অষ্ট্রেলিয়া অনন্ত সূর্যালোকের দেশই বটে। তার আলোকের আহ্বান একেবারে মানুষের মনকে স্পর্শ করে।

মরীচিকা দেখে পামেলাদের সঙ্গে ফিরে এলাম। গ্লাডস্টোন থেকে ওদের পোর্ট আলমায় আসার আসল উদ্দেশ্যটি আমি কিন্তু ভুলি নি। তাই সঙ্গে যা কিছু ভারতীয় ডাকটিকেট আর খুচরো পয়সা ছিল তা ওদের সানন্দে দিয়ে একটু হাল্কা সুরে বললাম—রাণী এলিজাবেথ মাউণ্টব্যাটেন-নন্দিনী পামেলাও যে আমাদের অতি পরিচিত নাম। তোমরা ছাড়া ভারতীয় ডাকটিকেট পাওয়ার যোগ্যতর পাত্রী এখানে আর কে আছে। ওরা কিছু বুঝে না বুঝে হি হি করে হাসল।

পামেলারা ভারতীয় শাড়ি পরা মেয়ের ছবি দেখতে চাইল। সাপ্তাহিক দেশ বসুমতী অমৃত পত্রিকার সিনেমা বিভাগ থেকে অনেক ছবি দেখালাম। ওরা দেখে খুশি হল, যেমন খুশি হয়েছিল ডাকটিকেট পেয়ে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ফরমায়েস মত ঘড়ি ক্যামেরা নাইলন টেরিলিন না পেলে মন ভার করে। হয়ত অনেক সময়ই ভাবে—এ সবই যদি না পেলাম, তবে বিদেশ-ঘোরা মানুষের সঙ্গে পরিচয় থাকাটার কি কোন অর্থ আছে?—হয়ত বা নেই-ই। তুচ্ছ ডাকটিকেট বা বিদেশী খুচরো পয়সা সংগ্রহের জন্য বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের হন্যে হয়ে ফিরতে দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

॥ তিন ॥

সিডনি শহরের সার্কুলার কীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম ফেরীবোটের জন্য। ওপারে তোরুঙ্গা পার্কে যেতে হবে বলে মনেপ্রাণে তৈরী হয়ে তখন কেবলই হাতের তালিকায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম—পার্কের বস্তুগুলির কিছুই যেন দেখে আসতে ভুল না হয়। সিডনি ব্রীজের মতই অবশ্য দর্শনীয় তোরুঙ্গা পার্ক হচ্ছে আসলে একটি চিড়িয়াখানা। ভারতের হাতি থেকে এ্যামাজান নদীর কুমীর—সবই সেখানে আছে। সারাদিনে দেশ বিদেশী মানুষেরও তাই বেদম ভিড়। কিন্তু সার্কুলার কীতে গিয়ে ফেরী চড়বার আকর্ষণও কারও কম নয়। প্যারামাট্টা নদীর এপার থেকে ওপার আর কতটুকুই বা পথ। তবু সেই ফেরীতে না উঠলেই যেন নয়। অনেক কৌতূহলী লোক আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই দেখে—যেন ফেরীবোটের এপার-ওপার যাওয়া-আসাটাই এক তামাসার ব্যাপার। সুখের বিষয়, সিডনিবাসীরা ফেরীগুলিকে গরুভেড়া ঘাস-বিচুলি পারাপারের খেয়া নৌকো করে তোলে নি, লগী বৈঠার টানে নদী পার হয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানার সখ মেটাতে চায়নি।

সেদিন আর আমার ফেরী ধরা হল না। একটি দৈত্যের মত লোক কোথা থেকে এসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন—আপ কেইস্তা হায়? কৌতুকবোধ হল। শ্বেতাঙ্গ লোক। অচেনা। মুখে বাঁধা বুলির দু একটি হিন্দীবাক্য। আমিও অগত্যা কুশল শুধালাম, হিন্দী আর হিন্দুস্থানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাই বা কি জিজ্ঞেস করলাম, নাম ধাম পরিচয় জানতে চাইলাম। ভদ্রলোক এক গাল হেসে বোম্বে ধরণের হিন্দীতে বললেন যে নাম তাঁর কোরোশেকো। আলাপের মজাদার সূত্র পেয়ে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চললাম শহরের দিকে।

কোরোশেকোর আদি নিবাস ছিল চেকোস্লোভাকিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আগত প্রতিটি মানুষের মত কোরোশেকোরও একটুখানি ইতিহাস আছে, দেশ-ত্যাগের একটি বিশেষ কারণ আছে। কোরোশেকো পালোয়ান। পাতিয়ালার মহারাজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১৯৩৭ সালে
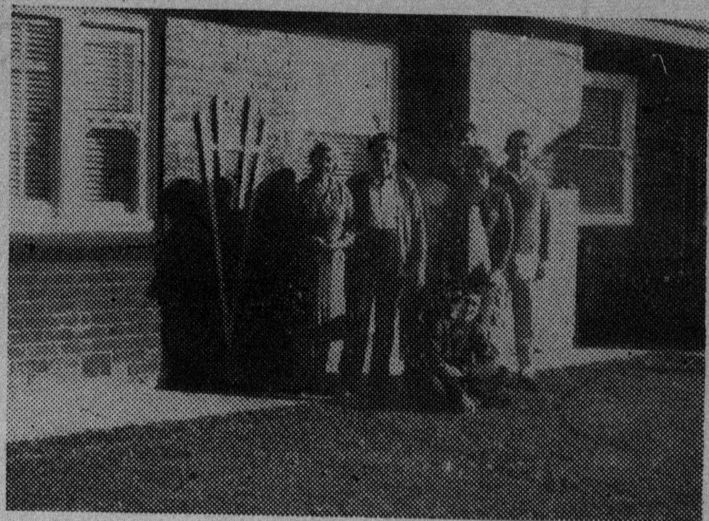
সারিনাম পরিবার

গাম অরণ্য

এই সেই মারে নদী

আঙুর খেতে জোসেফি পিতানি।

তিনি ভারতে এসেছিলেন কুস্তি খেলতে। তারপর ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বোম্বে দিল্লী কলকাতায় কুস্তির মার প্যাচ দেখিয়ে বিস্তর পয়সা করেছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতের ইংরেজ কর্তারা তাঁকে বললেন—তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে, নতুবা নির্বাসন শিবিরে। কোরোশেঙ্কো উপায়ান্তর না দেখে চারবছর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করলেন। তারপর যুদ্ধ শেষে চলে গেলেন দেশে। তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট সরকার বললেন—তুমি অনেকদিন ক্যাপিটালিষ্ট বৃটিশের অধীনে কাজ করেছ। সুতরাং তোমার স্থান জেলে। কোরোশেঙ্কো তাঁর চিরাভ্যস্ত কন্টিনেণ্টাল টানে বললেন—এভরিহোয়ার ট্রাবল। আমি সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি বল নি, ক্যাপিটালিস্ট ইঙ্গ-মার্কিন জোটে হাত মিলিয়েই ত কম্যুনিস্ট রাশিয়া হিটলার নিধন সমাধা করেছিল? কোরোশেঙ্কো বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—বে-ফায়দা মেট, বিলকুল বে-ফায়দা।

একজন হাঙ্গেরীয় ভদ্রলোকের একটি চমকপ্রদ গল্প শুনেছিলাম। বুর্জোয়া পিতার পুত্র বলে কম্যুনিষ্ট সরকার তাঁকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তর্ক করে বলেছিলেন—বুর্জোয়ার ঘরে জন্ম বলে আমাকে শাস্তি দিলে, কিন্তু আসল বুর্জোয়া ত আমার পিতা। তাঁকে ত তোমরা স্পর্শ করলে না? সাম্যবাদী কর্তারা উত্তরে নাকি বলেছিলেন—তাঁর কথা আলাদা। উপযুক্ত নথীপত্রের সাহায্যে তোমার বাবা প্রমাণ করতে পেরেছেন, যে বুর্জোয়ার ঘরে তাঁর জন্ম হয়নি—তাঁর বাবা অর্থাৎ তোমার ঠাকুর্দা ছিলেন সামান্য এক মজুর।

যাই হোক, ঝুটমুট সব ঝামেলা এড়াবার জন্য কোরোশেঙ্কো রাতারাতি পালিয়ে এলেন অষ্ট্রেলিয়াতে। অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসের স্থায়ী সুযোগ পেয়ে কোরোশেঙ্কো যে খুবই খুশি, তাঁর দিলখুশ পালোয়ানী মেজাজে সেই ভাবটি সব সময়ই ধরা পড়ে। সিডনি শহরের এক জনবহুল কেন্দ্রে আজ বড় একটি হোটেলের তিনি মালিক। অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুরই তাঁর অভাব নেই। সিডনি হোটেলের আপন কক্ষে মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে গোঁফে তা দিতে দিতে তিনি সাম্যবাদী চেক-সরকারের কথা মাঝে মাঝে মনে করে অট্টহাস্য করেন। শুধু কোরোশেঙ্কোই নন,

পোলাণ্ড গ্রীস হাঙ্গেরী হল্যাণ্ড ইটালী জার্মানী—যে কোন মুলুকের মানুষই কোরোশেঙ্কোর মত এমনি করে অস্ট্রেলিয়ায় জমিয়ে বসেছেন।

যে সার্কুলার কীতে দাঁড়িয়ে পালোয়ানজীর সঙ্গে কথা হল, সেই-খানটিতেই সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া-কলোনীর উদ্বোধন হয়েছিল, সেই ফেরী-ঘাটের গোলীয় তীরেই ইংলণ্ডের কনভিক্ট-বাহী প্রথম জাহাজখানা ভিড়েছিল। তখনও ঘাট বাঁধান হয়নি, সার্কুলার কী নামকরণ হয়নি, আজকের জগদবিখ্যাত সিডনি ব্রীজও গড়ে উঠেনি। 'সার্কুলার কী'র-ক্রমবিকাশের ইতিহাস আসলে হচ্ছে সিডনি শহরের আদি ইতিহাস। —অস্ট্রেলিয়ারই ইতিকথার ভিত্তি।

ক্যাপটেন কুক কিন্তু 'সার্কুলার কী' পর্যন্ত আসেন নি, পৃথিবীর এই সুন্দরতম পোতাশ্রয়টিও দেখেন নি। তাঁর জাহাজ ভিড়েছিল কয়েক মাইল দূরের বোটানি উপসাগরে। কুকের শোচনীয় মৃত্যুর সাত বছর পর লর্ড সিডনি বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, যে কুকের আবিষ্কৃত বোটানি-বে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব সম্রাট অনুমোদন করেছেন।

প্রথম কিস্তিতে ইংলণ্ড থেকে সাতশ পঞ্চাশজন কনভিক্ট অস্ট্রেলিয়াতে পাঠানো হবে বলে বৃটিশ সরকার সাব্যস্ত করেছিলেন। তারই অনুপাতে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ এবং খাদ্য, বস্ত্রাদি ও অন্যান্য সামগ্রীও দেওয়ার ব্যবস্থা হল। নতুন দেশে পৌঁছেই যাতে কনভিক্টরা কিছু কিছু কৃষিকর্ম শুরু করতে পারে সেজন্য কাস্তে লাঙল খুরপি ইত্যাদিও দেওয়া হল। ওদিকে চিরকেলে নাক-সিটকানো বৃটিশ লোকেরা ঠাট্টা করে লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় বলতে লাগল—ভারী ত চোরের উপনিবেশ, তার জন্য আবার এত উদ্যোগ আয়োজন, এত ঢাক ঢোল পিটানো!

কনভিক্‌ট ও রসদবাহী জাহাজগুলির সর্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল রাজকীয় নৌবাহিনীর কর্মচারী ক্যাপটেন ফিলিপকে। ১৭৮৭ সালে পোর্টস মাউথ থেকে রওনা হয়ে ক্যাপটেন ফিলিপ লোক লস্করসহ জাহাজগুলি এনে ১৭৮৮ সালের ২০শে জানুয়ারী বোটানি উপসাগরে ভিড়িয়ে দিলেন। তারপর গভীর হতাশায় চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কোন সৌন্দর্য নেই, সম্পদ নেই, লক্ষ্মীশ্রী নেই। সবাই ভারী দমে গেলেন; যেন কি করতে হবে সে কথাটি কেউ দয়া করে বাৎলে না দিলে ঐখানেই চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ক্যাপটেন ফিলিপ একটি ছোট্ট

নৌকোয় জনকয়েক অনুচর নিয়ে উত্তর দিকে উজিয়ে গেলেন। সেখানেও প্রত্যক্ষ করলেন এক অপরিসীম রিক্ততা। কিন্তু পোতাশ্রয় হিসেবে জায়গাটি তাঁর পছন্দ হল। এইখান থেকে জলস্রোত বহুবিভক্ত নদী ধারায় ডাইনে বাঁয়ে এগিয়ে গেছে। ক্যাপটেন ফিলিপ স্থানটির নাম দিলেন সিডনি কোভ। তারপর বোটানি-বেতে ফিরে গিয়ে সব কটি জাহাজ সরিয়ে এনে সিডনি কোভে নোঙর করলেন। জাহাজ থেকে নেমে যে স্থানটিতে তাঁরা সিডনির মাটির প্রথম স্পর্শ পেলেন, তারই নাম আজ সার্কুলার কী—সমগ্র সিডনি শহরের হৃদকেন্দ্র হয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন ফিলিপের দল সিডনি কোভে নেমে অবাক হয়ে দেখলেন, কোথাও কোন রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর নেই, জনমানব নেই, হাট বাজার নেই। ফলের গাছ, শস্যের মাঠ, গৃহপালিত পশাদিও কিছু নেই। শুধু অদূরের উচ্চ টিলায় এক শীর্ণ পাণ্ডুর পাখী ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হয়ে বসে বসে কি যেন ভাবছিল ; আর নবাগতদের মনে হয়েছিল সে কি এক কঠোর তপশ্চর্যায় যেন রত আছে। সার্কুলার কীর সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পেলাম—ঠিক সম্মুখ দিকটাতে ক্যাপটেন ফিলিপের আবক্ষ মর্মর মূর্তি ; আশ পাশে অজস্র ফুল গাছের কেয়ারী। তারপরই গোটা কত সমান্তরাল সড়ক বহু ইমারত নিয়ে ফিলিপের মূর্তি থেকে পেছু হটতে হটতে থেমে গিয়েছে সেই তপশ্চারী পাখী-বসা উচ্চ টিলার কাছটিতে, যেখানে গেঁথে তোলা হয়েছে সিডনি ব্রীজের প্রথম ধাপ। বাঁয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটি প্রশস্ত সড়কের ডবল-ডেকার ব্রীজের উপরে, নিচে এবং মধ্য পথে রেল, মানুষ আর মোটর গাড়ি চলছে। রাস্তার ওপাশটিকে ফিলিপ স্ট্রীট, জর্জ স্ট্রীট, এ-এম-পি বিল্ডিংস ইত্যাদি নিয়ে রচিত হয়েছে মর্তের অলকাপুরী। পেছন দিকের কোণ ঘেঁষে বহু কোটি টাকার প্রকল্পে নির্মীয়মান রয়েছে বিশ্বের এক বিস্ময়কর স্থাপত্যকর্ম, সিডনি অপেরা হাউস—যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয় যেন কয়েকটি মনোহর নৌকোর তোলা-পালের পরিপাটি সমাবেশ।

সার্কুলার কীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কলোনীর গভর্ণর রূপে ক্যাপটেন ফিলিপ শেকল-বাঁধা কনভিক্টদের জাহাজ থেকে ডাঙায় নামাবার নির্দেশ দিলেন। তারপর সবাই মিলে গোল হয়ে দাঁড়ালেন। সিডনির আকাশে এই প্রথম উড়ল বৃটিশ পতাকা ; সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার আকাশেও

এই প্রথম বটে। কারও অভিনন্দন-বাণী পাঠ হল না, কোন খবর কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা হাজির থেকেও ডেসপ্যাচ লিখে পাঠাল না। একেবারে নিঃশব্দ অনাড়ম্বরে অষ্ট্রেলিয়া-উপনিবেশের উদ্বোধন হল। দুঃসহ ক্লেশের মধ্যে ভিত্তি স্থাপিত হল ভাবীকালের এক ভাগ্যবান জাতির। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী হঠাৎ কোথা থেকে যেন ছুটে এসে খুব হৈ চৈ করল, বর্শা উঁচিয়ে ভয় দেখাল, চাঁই চাঁই পাথর ছুঁড়েও মারল। কনভিক্‌ট অকনভিক্‌ট লাট বেলাট সভয়ে টের পেলেন, নতুন দেশে স্বাগতমের রকমটি তেমন কিছু সুবিধার নয়।

প্রথম দুই বছরে সিডনির আশে পাশে কোথাও কোন খাদ্য শস্য জন্মে নি। দুই দুবার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে বিলেত থেকে জাহাজ এলো বলে ক্রম-নিঃশেষিত রেশন কমিয়ে দেওয়া হল।—নয়া কলোনীর লোকের আর কষ্টের সীমা রইল না। শেষ পর্যন্ত জাহাজ এলে দেশের চিঠি এলো। খবর এলো। খাবার এলো। সবাই অবাক হয়ে এই প্রথম শুনল, ফরাসী দেশে বিপ্লব শুরু হয়েছে। ১৭৮৯-৯৩ সালের ফরাসী বিপ্লব।

দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে। নব প্রতিষ্ঠিত কলোনীর কোন উন্নতি আশাই কেউ দেখছে না। সিডনির কাছে-কিনারের জমিতে চাষের চেষ্টা করে কোনই ফল হল না। যারা চাষ আবাদের চেষ্টা করল, তারা কিন্তু দেশে কোন দিনই কৃষিকর্ম করে নি। মাথার উপর খড়্গ এবং পিঠের উপর বেত্রের ভয়ে সিডনিতে করতে হয়েছে। ফিলিপ দেখলেন, কনভিক্ট দিয়ে বড় জোর দুটো রাস্তা তৈরী করা যায়, অথবা কিছু খানা ডোবা ভরাট করা যায়। তার বেশী নয়। মাথায় একটি নতুন পরিকল্পনা এলো।—খুব বেশী করে স্বাধীন নাগরিক আহ্বানের পরিকল্পনা। এরই ফলে পরবর্তী কালে যে সব কৃষক পরিবার এসেছিল তারা কৃষিকর্ম জানা লোক। অষ্ট্রেলিয়ায় এসে বিনা পয়সায় তাদের মজুর মিলল। সব কনভিক্ট মজুর। বেত মেরে মেরে তাদের দিয়ে কাজ করান শুরু হল। সামান্য অজুহাতে পঞ্চাশ থেকে এক হাজার পর্যন্ত বেত্রাঘাত। তার তীব্রতা সইতে না পেরে অনেকেই যেত মরে; যারা বেঁচে থাকত, তারা আর মাথা তুলতে পারত না—হতাশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে হত তাদের জীবনাবসান। এই হচ্ছে সেদিনের সিডনি-জীবন, অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতকায়দের আদি যুগের ইতিকথা।

সিডনির সত্যিকারের উন্নতি শুরু হল গভর্ণর ম্যাকরির কালে। ১৮১১-১২ সালে। সিডনির সমাজে তখন মদের স্রোত বইছিল। সরকারী অফিসাররা মদের চোরা কারবার করে পয়সা লুটছিল। মদ খেয়ে সবাই তুরীয় আনন্দে পড়ে থাকত, বিয়ে না করে স্ত্রীপুরুষ একই বাড়িতে অবৈধ-ভাবে বাস করত। চোরা কারবার, মদ, যৌন ব্যাভিচার নিয়ে সিডনির সমাজ চিত্র তখন সমসাময়িক লণ্ডনের চেয়েও অধম। আজও এই চরম সভ্যতালোকিত যুগে অনেক দেশে এসব এখনও চলছে। তবে তা নিয়ে বড় কেউ ছি ছি করে না—শুধু অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম যুগের কথা শুনে কানে আঙুল দেয়।

ম্যাকরি এসে মদ খাওয়া কমিয়ে দিলেন, সজ্জনের পোষণ এবং দুর্জনের শাস্তিবিধান করলেন। যে সব কনভিক্ট কর্ম কুশলতা দেখাতে সক্ষম হল, তাদের মুক্তি দিয়ে উচ্চপদে নিয়োগ করলেন। সাইমন লর্ড নামে একজন কনভিক্টকে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পর্যন্ত বহাল করেছিলেন। সাইমন একদিন অষ্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল আট বছরের কারাবাসের শাস্তিতে, একশ' গজ ঢাকাই মসলিন চুরি করার অপরাধে।

ম্যাকরি দলে দলে কনভিক্টদের মুক্তি দিলেন স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত হতে। উপরতলার লোকগুলি গেল গেল বলে রব তুলল। যারা বিনা পারিশ্রমিকে একাধিক কনভিক্ট খামারে খাটিয়ে আপন আপন সম্পদ বৃদ্ধি করছিল, তারা ক্ষেপে গেল। বিলেতে নামী বেনামী চিঠি পাঠিয়ে সবাই জানাল—ম্যাকরি অতি দুর্জন আর জুয়াচোর লোক। বিলেত থেকে সরজমিন তদন্তের জন্য 'বিগে কমিশন' এলো। কমিশনের কর্তারা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ। তাদের অনেকেরই বিচার বুদ্ধি ছিল আচ্ছন্ন, স্বভাবতই বড় লোকের সম্পদ বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ। বিগে কমিশনের রায় গেল ম্যাকরির বিরুদ্ধে।

অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা কিন্তু আজও গভর্ণর ম্যাকরিকে মনে রেখেছে। তাই শহরে শহরে ম্যাকরি স্ট্রীট চোখে পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার সর্বত্র, ইংলণ্ডের ওয়েলিং-টন এলবিয়ন ভিক্টোরিয়া রোডের মত। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নাম আমরাও অবশ্য পথের মাঝে টেনে আনি। তবে তা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে কোন্ দলের লোক তার উপর।

সিডনিতে গিয়ে কিন্তু আজ কল্পনা করা যায় না যে এই শহরের আশে-

পাশেই একদিন চাষের কাজ শুরু হয়েছিল, টাসমেনিয়াতে আপেল চারার মত অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম আঙুর গাছও রোপিত হয়েছিল সিডনির মাটিতে। কতই বিচিত্র ঘটনা জড়িয়ে আছে সিডনির সঙ্গে। আজ ভাবতেই পারা যায় না প্রথম যুগের সিডনিতে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। দুই একটি ইস্কুল সবে বসেছে। উপযুক্ত শিক্ষক বলতে কিছুই নেই। শুধু উচ্চারণ করে পড়া আর বানান শিখতে মাথা পিছু খরচ তখন আট পেনি, তার সঙ্গে লেখা আর সামান্ত অঙ্ক থাকলে এক শিলিং। ক্যাপটেন ফিলিপ কলোনীর ভিত্তি-স্থাপন করে গেলেন। তারপর কিছুদিন পর্যন্ত স্বার্থান্ধ সামরিক কর্মচারীরা শুধু নিজেদের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপর কিছু দিনের মধ্যে সিডনির রঙ্গমঞ্চে ম্যাকরির আবির্ভাবে শুরু হল সংস্কারের যুগ।

সিডনিতে স্ত্রীলোকের অবস্থা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল চরম শোচনীয়। ১৮৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত যে সব লোক এলো তাদের মধ্যে ছিল অনেক অসহায় স্ত্রীলোক। সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই নেই। সিডনির জাহাজ ঘাটায় তাদের মালামালের মত নামিয়ে দেওয়া হত। শীতের রাতে ঠক ঠক করে সবাই কাঁপত। আশ্রয় আশ্বাস আহার কিছুই নেই। তখন ইংরেজরা ভারতের অধীশ্বর, ভারতের সোনা দানা সম্পদ ঐশ্বর্যের মালিক। ভারতের ইংরেজ সমাজে বিলাসের স্রোত বইছে, আর খাস ইংলণ্ডে তখন কত লোক নিঃস্ব। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের মানব সমাজে বড় করুণ অবস্থাই ছিল। ১৮৮৫ সালের হিসেবে পর্যন্ত দেখা যায়, একমাত্র লণ্ডন শহরে তখন পতিতার সংখ্যা ছিল আশী হাজার, আর নেপথ্য-পরিচালকরা এই পাপ-ব্যবসা থেকে কমপক্ষে রোজগার করত সাড়ে দশ কোটি টাকা। শত শত গৃহহারা লোক টেম্‌স নদীর উপর লণ্ডন ব্রীজের আনাচে কানাচে শুয়ে রাত কাটাত।—পেটে তাদের ক্ষুধা, পরনে ছেঁড়া কাপড়, আর শীত নিবারণের জন্ত গায়ে খবর কাগজ জড়ানো। সারা দেশে বেকারীর অন্ত নেই। দুটি দশ বছরের শিশু পুত্রসহ একজন স্ত্রীলোক ষোল ঘন্টা খেটে মজুরি পেত এক টাকারও কম। বেশীর ভাগ তারা ম্যাচ ফ্যাক্টরির শ্রমিক।

১৮২৫ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সময়ে দুই লক্ষ স্বাধীন নাগরিক ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিল। স্ত্রীলোক ছিল অনুপাতে কম। ওদিকে ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে কনভিক্ট আনা হয়েছিল আশী হাজার।

তবু ঘরে ঘরে আরও বিনে পয়সার চাকরের প্রয়োজন হল। সুতরাং আরও কনভিক্ট এলো এবং নারী পুরুষের সংখ্যার অসাম্য আরও বাড়ল। তখন শুরু হল নির্বিচারে স্ত্রীলোক আমদানি। সেই স্ত্রীলোকের দলে বেশীর ভাগ ছিল লণ্ডন ডাবলিন এডিনবরার রাস্তা-ঝেঁটানো মেয়ে, সমাজের নোংরা আবর্জনার মত পতিতার দল। সিডনি শহরে এবং দূর দূরাঞ্চলে চাকুরি দিয়ে অথবা বিয়ের ব্যবস্থা করে তাদের প্রতিষ্ঠা করা হল। সুতরাং একদিকে পরের বাড়িতে বেগার-খাটা পুরুষ কনভিক্ট, অপর দিকে পতিতা ও মেয়ে-কনভিক্ট—তার মাঝে অল্প-সংখ্যক তথাকথিত ভদ্রলোক। এই হচ্ছে তখনকার অষ্ট্রেলিয়া।

অল্প নারী অনেক পুরুষ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া এগিয়ে চলল। আজও কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ঘাটতি নারী বাড়তি পুরুষের দেশ। ক্রমবিকাশের যুগে যুগে এই দেশে এসেছে শুধু কাজের লোক।—চাষের লোক কিংবা চাকুরি আর ব্যবসায়ের লোক। আজও কিন্তু নবাগতের দলে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক আসছে অনেক কম। তাই আজকের অষ্ট্রেলিয়াতেও একশত জন স্ত্রীলোক পিছু একশ তেতাল্লিশ জন পুরুষ, নারী পুরুষের সংখ্যায় সৃষ্টি করেছে ব্যাপক অসাম্য। অনেকে অভিযোগ করে আজ বলাবলি করছে, যুদ্ধ শেষের জার্মানীতে যখন চার বিবি পিছু এক সাহেব ছিল, তখন অষ্ট্রেলিয়ার ঘরে ঘরে আরও কেন বিবি আমদানি করা হয়নি।

কনভিক্‌টের ঘরে জন্মালেও সিডনির প্রথম যুগের নাগরিকেরা কিন্তু কনভিক্‌ট-জনোচিত অপরাধ প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি। তাছাড়া আরও একটি অভাবনীয় ব্যাপার সবাই তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল—অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে নবজাত সন্তানরা দৈর্ঘ্যে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে সবাইকে দিল হার মানিয়ে। অথচ ইংলণ্ড থেকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আগত লোকেরা পরিহাস করে তাদের বলতে লাগল 'কারেন্সি ল্যাড্‌স এণ্ড কারেন্সি ল্যাসেস'। অবশ্য সামান্য কিছু কারণ ছিল। তখনও অষ্ট্রেলিয়ার কোন জাতীয় সরকার দানা বাঁধে নি। টাকশাল তৈরী হয় নি। নিজস্ব কোন মুদ্রাও প্রচলিত হয় নি। আর্থিক লেন দেন চলত তখন বিলেতি মুদ্রা, স্প্যানিশ ডলার, এমন কি কিছু কিছু ভারতীয় সিক্কা টাকায়—যদিও এই সব অর্থ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তখন কাগজের নোট চালু হল। এমন কি বড় বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের নোট পর্যন্ত ছেপে

নিয়েছিল। দশ শিলিঙের এমন একটি নোট দিয়ে হয়ত মাত্র তিন শিলিঙের উপযোগী জিনিস কেনা যেত। কিন্তু বিলেতি টাকায় মিলত তারই মূল্য-মানের জিনিস। এর প্রচলিত নাম ছিল স্টারলিং। স্থানীয় নোটগুলিকে বলা হত কলোনিয়াল কারেন্সি অথবা শুধুই কারেন্সি—যার অর্থমূল্যের গৌরব ছিল একেবারে যৎসামান্য। অষ্ট্রেলিয়ার এই যুগে ইংলণ্ড থেকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে যে সব লোক এসেছিল, তারা কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া-জাত সুশ্রী কনভিক্‌ট-সন্তানদের মানব সন্তানোচিত সম্ভ্রমের চোখে না দেখে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। উপহাস করে বলতে লাগল কারেন্সি ল্যাড্‌স অল্পমূল্যের বাজার চালু নোটের মত। তবে আরও একটি বিস্ময়কর কারণ আছে। তখন সিডনি-সমাজে নারীর সংখ্যা কম ছিল বলে বেশ কিছু স্ত্রীলোক তার সুযোগ নিয়ে দেদার পয়সা রোজগার করল। অর্থ লেন দেনের কারবার সূত্রে তাদের দেহে যে অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব ঘটল, তারা হয়ে পড়ল না-ঘরকা, না-ঘাটকা।—সরকারী নথীতে তাদের চিহ্নিত করা হল অর্ফ্যান বলে। বিশুদ্ধ সাহেবরা তাদেরও নাম দিয়েছিল কারেন্সি ল্যাডস। দেহ দানের দক্ষিণাটিই যেন শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ!

কারেন্সি ল্যাডরা ক্রমে বড় হল। নিজেদেরকে অষ্ট্রেলিয়ান বলে পরিচয় দিতে তারা গর্ববোধ করল। এবং ক্রমে তারাই বিবেচিত হল দেশের নবজাগৃতির অগ্রদূত বলে। ইংরেজদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তারা একদিন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল—তোমরা কে হে হরিদাসের দল!—অষ্ট্রেলিয়ার সম্পদ কনভিক্‌টের সৃষ্টি, আর তাতে আমাদেরই আছে অবাধ অধিকার। তোমরা নিপাৎ যাও।

আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে কয়েদীর বংশধররা 'লোকাল-বর্ণ্‌' মানুষ নামে পরিচিত। তারা জাতি গোত্র ধর্মের সমস্ত রকম শুচিবাই মুক্ত। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এসে ভারতবর্ষের ভদ্রলোকেরা দেখে অবাক হন, যে কালাপানির সমাজে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানে বন্ধুতা হয়, খানাপিনা চলে, হামেশা বিয়ে পর্যন্ত হয়! ভরসার কথা, ভারতীয় সাহেবরা পোর্টবিলিয়ারের লোকাল-বর্ণ্‌দের জন্য কোন উদ্ভট নাম চালু করেন নি।

এ পর্যন্ত সিডনির গোড়ার কথার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। সিডনির গোড়ার কথা আসলে গোটা অষ্ট্রেলিয়ার গোড়ার কথা। অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম শহর সিডনি। লোক সংখ্যাও পচিশ লক্ষের বেশী।

যে অর্থে লণ্ডন নিউইয়র্ক টোকিও আধুনিক ও ঐশ্বর্যবান এবং হংকং ব্যাঙ্কক সিঙ্গাপুর সুন্দর, সেই অর্থে সিডনির সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আধুনিকতা তিল পরিমাণ কম নয়। অষ্ট্রেলিয়ান জাতি আজ যে উন্নত শির, পৌনে তিন মাইল দীর্ঘ সিডনি ব্রীজ তারই প্রতীক। তিপ্পান্ন হাজার টন ইস্পাতের কারিগরীতে একশ' কোটি টাকায় তৈরী সিডনি ব্রীজকে বাদ দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কথা ভাবতে পারা যায় না।

সিডনিবাসীদের ছাড়াও কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াকে ভাববার উপায় নেই। মেলবোর্নওয়ালাদের মত তাদের আত্মম্ভরিতা নেই, আবার বিন্দুমাত্র লজ্জা-বোধ নেই অতীত ইতিহাসের জন্ত। সিডনিবাসীরা স্বভাবত সরল প্রকৃতির মানুষ; পোশাকে আচরণে যাকে বলে ন্যূনতম ফরম্যাল। শুধু একটুখানি দোষ এই, পুলিশের উপর তারা দারুণ চটা। পুলিশ, কড়া আইন, কনভিক্‌ট অকনভিকটে ভেদাভেদ—এই সব কিছুর বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব পুরুষের মনেই ত ছিল পুঞ্জিত ক্ষোভ। তাই সে দুঃস্বপ্ন-যুগের কেতা কানুনের পরিবর্তে যে অনাড়ম্বর উদার আচরণ ক্রমশ চালু হয়ে পড়েছিল, আজও সিডনিতে তার নজির আছে। আলাপে পোশাকে চালচলনে সিডনিবাসীদের সে সরলতা আজও বজায় আছে। নতুন আগন্তুককেও সিডনিবাসীরা প্রাণখোলাভাবে জিজ্ঞেস করে—OWEYERGOIN' MATE, ORRIGHT (হাউ আর ইউ গোইং অন মেট, অলরাইট?) সিডনির কুলী হকার ট্যাক্সি-চালকের কাছে রাজা মহারাজা ফিল্ম্‌ স্টার—সবাই মেট অর্থাৎ সাথী বা বন্ধু।

চার

বিচিত্র সিডনি শহর। একটু এদিক ওদিক কান পাতলেই যেন লোনা জলের আহ্বান অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করে। দক্ষিণ সিডনির ডারলিং হারবার থেকে এলিজাবেথ-বে পর্যন্ত দূরত্বটুকু জলের ধার দিয়ে অতিক্রম করতে অনেক-গুলি তিনকোনা বাঁক পড়ে—উলুমুলু-বে, ফার্ম কোভ, ওয়ালশ-বে। আবার ওপারে নিউট্রাল-বে, কিরিবিল্লি পয়েন্ট, ল্যাভেণ্ডার-বে। সিডনির আসল সৌন্দর্য এই বাঁকগুলির তীরে তীরে, বিশেষ করে আলো ঝলমল রাতে।

শহরের অন্তর্দেশে জলতরঙ্গের সিডনি আসলে প্রশান্ত মহাসাগরের সন্তান।

লোনা জলের নুন কণা তার শিরায় শিরায় সম্পৃক্ত। ক্রোণুল্লা থেকে উত্তরে পাম বীচ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বেলাভূমি জুড়ে অনেকগুলি গোলীয় উপকূল আছে—মালাবার মারুব্রা কুগী; বোন্ডাই ম্যানলি কার্ল কার্ল; লংরীফ কোলারয় নারাবীন; সোনাভেল এভালিন ডি-হোয়াই। একটি মাত্র শহরের উত্তর দক্ষিণে চল্লিশ মাইলের মধ্যে এতগুলি সহজলভ্য সৈকতবিহার কেন্দ্র কিন্তু অন্য দেশে বড় বেশী নেই।

ইটালী আর হাওয়াই দ্বীপে নাকি অনেক হোটেলেরই নিজস্ব প্রাইভেট বীচ থাকে; শুধু হোটেলবাসীদের প্রীত্যর্থে নিরঙ্কুশ অধিকারের সমুদ্র সৈকত গড়ে তোলেন হোটেল মালিক। অনেক ভাগ্যবান লোকও আবার একেক টুকরা জমিতে আপন আপন নামের মার্কায় তৈরী করেন সমুদ্র সৈকত। সুতরাং অনুমান করা শক্ত নয়, লোক কত বিলাস-সচেতন হলে এবং পয়সা কত বেশী থাকলে এমন সন্তরণ-কেন্দ্র তৈরী করা সম্ভব। কোন কোন সাগর তীরে আবার অদ্ভুত সমস্যা থাকে। বালু নেই। সৌখিন মালিকরা লরীভরা বালু কিনে স্তরে স্তরে ফেলে তিলে তিলে গড়ে সমুদ্র সৈকত, ডেমক্রেসির যুগে এ্যারিস্টক্রেসির সংরক্ষিত আসন।

অষ্ট্রেলিয়ার সাগরতীরগুলি সর্বজনীন—প্রাইভেট মালিকের দম্ভ সেখানে নেই, কোন বালু সমস্যাও নেই। সোনা রঙের মিহি বালুকার গভীর স্তর বিধাতা সেখানে আপন হাতে সাজিয়ে রেখেছেন। গ্রীষ্মকালের ছুটির দিনে অষ্ট্রেলীয় সাগরতীরে লীলা চাপল্য দেখলে মনে হয়, এই বুঝি বা জীবন। চলা আর থামা, ছন্দ ও মিল, উল্লাস এবং উচ্ছ্বাস এক হয়ে এসে বালুবেলায় বিকাশ ঘটায় সে-জীবনের। বালু বিলাসের ক্ষণিক শয্যা থেকে জেগে উঠে ওরা যেন বলতে চায়—জেনেছি, আমরা এবার জীবনকে জানতে পেরেছি। অবশ্য ওদের জানার বস্তুটি তমসার ওপারে আদিত্যবর্ণ সনাতন পুরুষকে জানার মত নয়।

কিংস ক্রস সিডনি শহরের একটি নাম করা অঞ্চল। সিডনি শহরের অনেক পরিবর্তনের অগ্রদূত। তিরিশ বছর আগে নাকি সিডনি বধূরা এইখানে ভর-দুপুরের বাজারে সওদা করতে বার হত। পরণে তখনও রাত্রিবাস। আজকের কিংস ক্রসে আর তেমন দৃশ্য দেখা যায় না, তেমন বাজারও আর নেই। কিংস ক্রসের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হোটেল রেস্তোরাঁ নাইট ক্লাব ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। সিডনির অলকাপুরী কিংস ক্রস আজ বার বিলাসের

কেন্দ্রভূমি। তবে তার ভোজনালয়গুলিতে খাদ্যাখাদ্যের যে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, যদিও কিছু কিছু নাম পালটেছে। আজ মটনকে বলা হচ্ছে ল্যাম্ব, হয়ত ব্যাপক মেষপালনের কল্যাণে অষ্ট্রেলীয় সৌভাগ্যোদয়ের প্রতীক প্রাণীটিকে একটুখানি মর্যাদা দিতে। আমরাও অবশ্য ফাউলকে অন্যের মত চিকেন বলি, যদিও আমাদের মুর্গীগুলো আগের মতই প্রহর ঘোষণা করে, খেতেও লাগে তেমনি। আর তাদের আণ্ডাগুলির সাইজও আগের চাইতে তেমন কিছু বড় হয় নি। সত্যি আজ অনেক পরিবর্তন এসেছে সিডনির, আর সিডনি জীবনের সে পরিবর্তন মটন ফাউলের মত শুধু নাম বদলায় নি, একেবারে খোলস বদলেছে এবং কিংস ক্রস থেকে সেই জীবন সাগরসৈকতে গিয়ে পার্শ্বপরিবর্তন করেছে।

দীঘাতে আমাদের সমুদ্রতীর আছে, তবে অনেকেরই যাওয়া ঘটে না পয়সা নেই বলে। যাদের পয়সা আছে সমুদ্রের ডাক আবার তাদের কাছে তেমন করে হয়ত পৌঁছায় না। কেউ কেউ অবশ্য কলকাতা থেকে বাসে উঠে নদীর ধারে ধারে মাইল পঞ্চাশেক দক্ষিণে গিয়ে পিকনিক করে ফিরে আসে। তারপর বিদেশে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখে—রবিবার ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলাম। সেখানে নদীর যেমন বিস্তার, তাতে বঙ্গোপসাগরের কোস্ট দেখলাম বলা চলে!

সিডনি সূর্যালোকের শহর। গড় উত্তাপ তার পঁচাত্তর ডিগ্রী। আবার শীতের তাপমাত্রাও পঞ্চাশ ডিগ্রীর নিচে বড় একটা নামে না। তাই সিডনির সাগরতীরে নিত্যভিড় লেগে আছে। ছুটির দিনে সিডনিবাসীরা মহোৎসাহে ছোটে ম্যানলি বোণ্ডাই মারুব্রাতে। মারুব্রা যাওয়ার মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে আমিও একদিন স্পেশাল বাসে উঠে বসে পড়লাম।

জোয়ান জোয়ান ছেলে আর মেয়েতে বাস ছিল ঠাসা। ছেলেগুলির পরণে হাফ প্যাণ্ট। খালি গা, খালি পা। লাসভারী বিরাট বিশাল বপু। মেয়েগুলির পরণে স্কার্ট, কারও বা অতি আঁটসাট খাটো স্ল্যাক্স—দেখলে মনে হয় যেন ছোট বেলাকার পোশাক পরে এসেছে। গায়ে জামা রাখার সামান্য আভাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, কেউ কিন্তু কাউকে ছল করে দেখছিল না। ছেলেগুলির লোহা গিলে হজম করার বয়স। প্রাণে অফুরান রস। যে বয়সে মেয়ে দেখলেই ভাল লাগে, যুবতীমাত্রকেই এঞ্জেল বলে মনে হয়, ঠিক তখন এরা ডজন ডজন শীলার সঙ্গে জলকেলী করতে যাচ্ছে। মারুব্রাতে

বাস থেকে নামবার সময় দেখলাম, সবগুলি মেয়ের হাতেই একটি করে প্লাস্টিকের ডালি। তার মধ্যে একটি বড় এবং একটি করে ছোট তোয়ালে। সমুদ্রসৈকতে বিকিনীর মত দুটি তোয়ালে না হলেও নয়।

সমুদ্রতীরে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী কিশোর কিশোরীর বেজায় ভীড়। পাঁচ ছ বছরের শিশুরাও বাদ নেই। অবিরাম জনস্রোত বইছে। কেউ কেউ এসেছে গাড়ি হাঁকিয়ে। গাড়ির পেছনে ছোট্ট জালি বোট। গাড়ি থেকে বোট নামিয়ে এঞ্জিন চালিয়ে বসে পড়েছে। কারও সঙ্গে সার্ফ বোট, কারও হাতে লাইফ র‍্যাফ্‌ট। অনেকে এসেছে দলে দলে, অনেকে যুগলে যুগলে। সবাই জলে নেমে এলোপাথারি স্নান করবে, সাঁতার কাটবে, জল ছিটাবে—তারপর এসে বালুশয্যায় শুয়ে শুয়ে সূর্যের তাপে চামড়ার রঙ ট্যান করবে। আর বিদেশী আমি প্রাণ ভরে দেখব, পাতা ভরে লিখব এবং লোকের এনাসিন এ্যাসপ্রোর খরচ বাড়াব!

সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য। মনে হল, সেখানে মেয়েদের সংখ্যাটাই যেন সবচাইতে বেশী। যত সব উর্বশী মেনকা রম্ভার দল। নিম্নাঙ্গে তাদের একফালি ন্যাতা, নিতম্বের সঙ্গে ফিতে দিয়ে পেছনে ফিরিয়ে বাঁধা। সবার দেহেই বন্য স্বাস্থ্য। যুবকগুলি লাল টকটকে জাঙ্গিয়া পরা। বিশাল বক্ষ। ভীমোরু। সবাই যেন পুরুষাকারের সজীব মূর্তি। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভারতবাসীকে বলেছিলেন গীতা পাঠের বদলে ডনকুস্তি করে লৌহ-কঠিন শরীর গঠন করতে। ম্যানলি মারুব্রার সাগরসৈকতে স্বামীজীর কল্পনা তেমনি সব ইস্পাতে গড়া যুবক গণ্ডায় গণ্ডায় দেখেছিলাম। সিডনির ম্যানলি বীচের নাম রেখেছিলেন গভর্ণর ম্যাকরি সাহেব। এই সৈকতভূমিতে এসে তিনি কতগুলি কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসী দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তাদের দৈহিক গঠনে ছিল একটি বিশেষ ছাঁদ, ইংরেজীতে যাকে বলে ম্যানলি; দৃপ্ত পুরুষালি অবয়বের ভাস্কর সুলভ কারুকর্ম। তাই তিনি স্থানটির নাম দিয়েছিলেন ম্যানলি বীচ। ভাগ্যের পরিহাস, এইখানেই আদিম অধিবাসীরা তাঁকে পুরস্কৃত করেছিল বর্শাঘাত করে। সৈকতবিহার-রত খালি-গা অষ্ট্রেলিয়ান যুবকদের আজ দেখলে সেই উদার হৃদয় রাজপুরুষ নিশ্চয় খুশি হতেন।

স্পেন দেশের কৃষ্ণকেশী, ইটালীর স্থূলাঙ্গী, পাষাণে উৎকীর্ণ প্রতিমার মত গ্রীক নারীরা জলে দৌড়ঝাপ করে সাঁতার কেটে উঠে এসে একপাল

পুরুষের সামনে ছোট তোয়ালেতে গা মুছে বড় তোয়ালে বিছিয়ে শুয়ে পড়ছে। তারপর শুরু হচ্ছে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভরে রঙ পরিবর্ত্তনের সাধনা, চর্মবিশারদের যন্ত্রকৌশল বর্হিভূত কায়দায় শাদা রঙকে তামাটে করার চেষ্টা।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ হলেও একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। অন্যদেশের সঙ্গে তার সাধারণ সীমানা নেই। সুতরাং হরবকত সীমানা-সংঘর্ষের বালাই নেই। খাদ্যসমস্যা ধর্মবিদ্বেষ বর্ণ বৈষম্যও প্রায় কিছুই নেই। এমন সমস্যামুক্ত দেশ পৃথিবীতে আর কটি বা আছে। হয়ত শ' খানেক বছর পরে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরের রাজ্যগুলিতে সূর্যতাপের ক্রিয়া প্রকটভাবে দেখা দেবে। তখন মানুষের চামড়ার শাদার ভাগ কমে গিয়ে কালোর স্থায়ী দাগ পড়বে। দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা তখন ছুটির দিনে সাগর তীরে বালুমেখে প্রায় দিগম্বর হয়ে শুয়ে শুয়ে চামড়া ট্যান করার সাধনা করবে এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াকে হয়ত বলবে কালো লোকের দেশ। কে জানে তার আগেই শাদা কালো নানা জাতির আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে অষ্ট্রেলিয়া বর্ণবিদ্বেষের কেন্দ্র হবে কিনা। সে যাই হোক, আপাতত কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে, শাদা লোকেরা যখন ইচ্ছা করে চামড়ায় ঘোলাটে রঙ ধরাতে সক্ষম হয়, সেটা হল ওদের ভাষায় যাকে বলে 'কিউট'—আর যারা ঘোলাটে রঙ নিয়ে জন্মায় তারা সুন্দর নয়। বালুশয্যায় শুয়ে শুয়ে তারা যে রঙ বদলের সাধনা করে নি!

অষ্ট্রেলিয়াতে এখন এমন যুগই এসেছে যে বিকিনী পরে বের হতে না পারলে আর যেন কারও মেয়ে ছেলে বলে পরিচয়দানের যোগ্যতাটুকুও থাকবে না। অথচ ওদিকে কিন্তু রোজ রোজ সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার সুযোগও অনেকের ঘটে ওঠে না। কিন্তু তার জন্যও পরোয়া নেই। বিকিনী পরে ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বসে সান-বাথ নিয়ে তারা আপাতত দুধের সাধ ঘোলে মেটায়! তারপর প্রথম সুযোগেই ছোটে সমুদ্রের দিকে। ছ'বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ীরও বিকিনী চাই। —নাইলে তাদের কাছে সমুদ্রের স্বাদ নেই, আলোর ধক নেই, বালুর আকর্ষণ নেই। তাই আজকের দিনে সমুদ্র সৈকতের অর্থই হল বিকনী জগত। অথচ অষ্ট্রেলিয়ায় বিকিনীর চল কিন্তু খুব বেশী দিনের কথাও নয়। এমনকি ১৯৬১ সালের অকটোবরের আগেও বিকিনীর চল ছিল না অষ্ট্রেলিয়াতে। সকলকে হঠাৎ হতচকিত করে এক বিকিনীপরা সিডনিবাসিনী নভেম্বরের গ্রীষ্মদিনে

বোম্বাই বীচে চলতে গেলেই বীচ-ইনস্পেকটর অশালীনতার অজুহাতে তাকে বহিষ্কার করে দিলেন। তখন সেই ঘোর যুবতী বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলল—বিকিনী পরে এখানে আসতে মানা কেন? আমার দেহে ত লুকোবার মত এমন কিছুই নেই! একথা শুনে অনেকেই বিকিনী-শোভিতা দুঃসাহসিনীকে বাহবা দিল, আর চার্চিল সাহেবের সেই বহুখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করে একটু হাসল।—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চার্চিল সাহেবের স্নান ঘরে ভুল করে হঠাৎ ঢুকে পড়ে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। চার্চিল কিন্তু কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে মুখে লীলাময় হাসি টেনে বলেছিলেন —দেখলেন ত, মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কাছে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর লুকোবার মত কিছুই নেই!

বোম্বাই বীচে সেদিন যেন একটি বিপ্লবের সূত্রপাত হয়ে গেল। বাহ্যত অনেকে ছি ছি করলেন বটে, তবে সৈকতে সৈকতে এমন সুদুর্লভ নগ্ন সৌন্দর্য দেখা যাবে বলে মনে মনে তাঁরাই খুশি হলেন সব চাইতে বেশী। পত্র-পত্রিকায় টিপ্পনীকারদের কেউ কেউ নীতিশাস্ত্রঘেঁষা কিছু উপদেশ বর্ষণ করলেন। তারপর আরও কিছু হৈ চৈ হবার পর সবাই সব সমালোচনা ভুলে বিকিনীর ভক্ত হয়ে পড়লেন। তুলি-টানা ভুরু, রঙ করা ঠোঁট, রাশ-টানা কেশ—তার উপর এলো বিকিনী এবং একটি প্রশ্ন—ততো কিম্?

এটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার টপলেস বটমলেসের যুগসন্ধিকাল। তাই এখন আর অশোভনতার প্রশ্ন নেই, সমালোচনার বালাই নেই। এখন বরং প্রতিযোগিতা চলছে, বিকিনীকে আরও কতটুকু ছাট-কাট করা যায়, কোন্ কায়দায় তার ক্ষীণ আবরণ-ক্ষমতাকে খর্ব করা যায়—অধোদেশের সামান্য দেহাংশকেও আবরণের আভাস থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। আশঙ্কা করি, প্রশান্ত সাগরের নববৃন্দাবনে স্বেচ্ছা-বিবস্ত্রণ-সাপেক্ষ জলকেলী শুরু হয়ে গেলে আমাদের যমুনা পুলিনের বস্ত্রহরণ লীলার মাধুর্য হয়ত অনেকের কাছেই কিঞ্চিৎ ফিকে বোধ হবে।

অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। প্রাচীন লোকেরা আমাদের মত মারাত্মক রকমের প্রাচীনপন্থী নন। তাজা তরুণ প্রাণোচ্ছল ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে তাঁরা সগর্বে বলেন—ঐ দেখ আগামী দিনের অস্ট্রেলিয়া। সাগরের তীরে তীরে নবজীবনের জয়গান গেয়ে বিপুল বলে তার আবির্ভাব ঘটছে। প্রাচীনতার অহেতুক অহঙ্কার নেই বলেই ত সহজ

বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকে যাচাই করে কত সহজে তাঁরা আগামীকালটিকে অভিনন্দিত করছেন।

শুনেছিলাম অষ্ট্রেলিয়ার দোকানে দোকানে কয়েক বছর আগেকার অ-বিক্রীত মালের জন্য বস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিস্তর লোকসান হয়েছে। খুব বিচিত্র নয়।—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন, রোজগারের অজস্র খোলা পথ, বালুবেলায় স্বচ্ছন্দ বিহার, দৌড় ঝাঁপ এবং অপর্যাপ্ত পুষ্টিবর্ধক খাদ্য অষ্ট্রেলিয়ানদের দৈহিক গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সমুদ্রসৈকতের যে কোন ইন্‌স্পেক্‌টরকেই আজ বলতে শোনা যায়—আমার পঁচিশ বছর চাকুরী জীবনে দেহের এমন বলিষ্ঠ শ্রী আর কখনও দেখি নি।

দৈহিক গঠনে পরিবর্তনে আমেরিকার সঙ্গে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার অনেক মিল আছে। পঁচাত্তর বছর আগে চৌদ্দ বছর বয়সী মার্কিনী ছেলেমেয়েদের যে গড় উচ্চতা এবং ওজন ছিল এখন তার চাইতে উচ্চতা বেড়েছে পাঁচ ইঞ্চি, ওজন পঁচিশ পাউণ্ড। এমনকি মাত্র পঁচিশ বছর আগে ষোল বছরের যুবকদের যে দৈহিক গঠন ছিল, বর্তমান আমেরিকায় চৌদ্দ বর্ষীয় তরুণদের সেই দৈহিক গঠন দেখা যাচ্ছে।

দেহের দীর্ঘতা পৃথিবীর কোন দেশেই বোধহয় তেমন কোন বাস্তব সমস্যা সৃষ্টি করে না, এমনকি টোপর মাথায় বাঙালী বরের পক্ষেও নয়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় করেছে—বিশেষ করে ইউরোপ থেকে নবাগত বিদেশীদের বিয়ের বাজারে। অষ্ট্রেলিয়ান মেয়েদের স্বদেশীয় দীর্ঘদেহী পুরুষদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার আগ্রহ বেশী দেখে আগন্তুক যুবকরা হতাশার সুরে বলেছে —এখানে আবার আমাদের চান্সটা কোথায়!

সিডনির মারুব্রা সৈকতে সেদিন সাঁতার কেটে সিক্ত বসনে দেহের সিক্ত সম্পদ নিয়ে মেয়েরা উপরে উঠে আসছিল। সামনে গিয়ে ছবি তুলতে চাইলাম। অস্ফুটে উঁহু শব্দ করে ত্রিং করে লাফ দিয়ে সবাই ক্যামেরার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। এই মেয়েগুলির বেশীর ভাগ ছিল ইস্কুলের ছাত্রী। বয়স কম। পুরুষ বন্ধু নেই। তবে পুরুষের সাহচর্য যে ভাল লাগে সেটা বুঝতে শিখেছে। হাফ-প্যান্ট পরা খালি-পা খালি-গা এক ভদ্রলোকের মাথার টুপিতে লেখা ছিল—'ইন্‌স্পেক্টর, মারুব্রা বীচ'। অপটু সাঁতারুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, হারানো-প্রাপ্তির সদ্‌গতি করা, ফার্স্ট-এডের বন্দোবস্ত করা তাঁর কাজ। নিরাসক্তভাবে ঘুরতে দেখে আলাপ করলাম। মুহূর্তে

মনে হল, যেন অনেকদিনের চেনা। আপন লোকের মত বিনা ভূমিকায় ভদ্রলোক বলে গেলেন—প্রশান্ত মহাসাগরের জল কেমন থৈ থৈ করছে, তাই না? আমার বিশ বছর চাকুরি জীবনে একটি প্রাণীও কিন্তু এখানে ডুবে মরে নি, একটি মানুষকেও হাঙরে কাটে নি। কি করেই বা কাটবে বল? জলের নিচে সাঁতার কাটার সীমানায় লোহার জাল দিয়ে রেখেছি না? ভদ্রলোককে সাধুবাদ জানালাম। তারপর আমার ছবি তোলার উদ্দেশ্য ও সমস্যার কথা বললাম। ইনস্পেক্টর সাহেব বললেন—এটা কি আবার একটা সমস্যা?—ভেরি ইজি মেট! এরপর একদল তরুণ ছেলেমেয়ের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—বাছাধনরা, যদি বিখ্যাত হবার বাসনা থাকে তবে ইদিকে এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াও। কলকাতার কাগজে তোমাদের ছবি ছাপা হবে। দেখলাম, বিখ্যাত হবার বাসনা সবার এত প্রবল, যে পোজ নিতে শেষ পর্যন্ত কাড়াকাড়ি। আগে ভেবেছিলাম কার ছবি বা তুলতে পারব। এখন সমস্যা হল, কাদের ছবি বাদ দেব।

সমস্ত সৈকত জোড়া জলকেলী বালুকেলীর মধ্যে ম্যানলি বোণ্ডাই মারুব্রার সর্বত্র একটি জিনিস বিশেষ করে চোখে পড়ে—সৈকত সীমার ধনুক বাঁকা রেলিঙের নিচে জোয়ান জোয়ান সব ছেলের দল শুয়ে আছে। সবার সঙ্গেই প্রিয় বান্ধবী তেমনি জোয়ান, তেমনি শয়ান। একে অন্যের মুখে মুখ, বুকে বুক চেপে শুধু কোমরে কোমরে বিঘতখানেক ব্যবধান রেখে পড়ে আছে। চারি চক্ষু বোজা। এরা কখনও সাঁতার কাটে না, ছবি তোলে না, বালু ছিটায় না। বালুর উপর শুয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে বই পড়ারও ভাণ করে না। সৈকতভূমিতে এদের আগমন শুধু জোড়ায় জোড়ায় বিভোল হয়ে শুয়ে থাকার জন্য। এদের কাছে প্রেম মানে দেহবিলাস, যা ঠিক মিঠাই মণ্ডার মত ভাল করে ভোগ করা যায় না—বরং আর পাঁচজনের উপস্থিতির মধ্যেই দুজনে একেবারে একাত্ম হয়ে সম্ভোগ করতে হয়। তাই বোধ হয় এদের একমাত্র কামনা এমন মন্থর দিনের যেন অবসান না হয়। আকাশ ভরা উদার আলো যেন লুট না হয়।

এই আত্মমগ্ন সৈকতবিলাসীদের দেশে কোন বিবাগী চির কৌমার্যের সঙ্কল্প করে কিনা, কোন মূঢ় বোনের বিয়ে, ভাইয়ের পোষ্য, পিতার ঋণ এবং সকল অভাগ্যের সব বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করে কিনা জানি না। তবে সমুদ্রের সৈকতে সৈকতে এই হচ্ছে এদের জীবনের একটি স্বতন্ত্র প্যাটার্ন, দৈহিক গঠনে পরিবর্তনের মত দেহবিলাসের এক নবপর্যায়।

জোসেফির বাড়িতে কমলা লেবুর বন
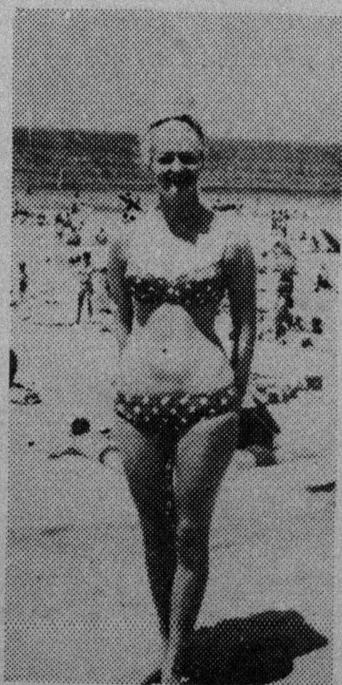
সমুদ্র সৈকতে বিকিনী পরা মেয়ে

পোর্টপিরির প্রান্তে গ্রাম গড়ে উঠেছে

গমের খামারে একটি কৃষকের বাড়ি

আমাদের দেশেও অনেক পরিবর্তন এসেছে, সাহিত্যে নতুন চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে অনেককে বলতে শুনেছি—চোখের সামনে যা নিত্যদিন ঘটছে সেই কথাটি খুলে বলতে দোষটি কোথায়? কোন এক বিখ্যাত সাহিত্যপত্রের পাতা ওলটাতে একদিন চোখে পড়েছিল আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ কলি—"ছোট মাসি, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে আমি প্রথম যৌন আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলাম'। মারুব্রা সৈকতের পরিপ্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করে মনে হল আমরা হয়ত মুখে মুখেই সিডনিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি!

মারুব্রা থেকে ফেরার পথে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। নাম ক্রিষ্টীন। মারুব্রার শহরোপকণ্ঠে ক্রিষ্টীনদের বাড়ি। সুতরাং সে নিত্য দিনের সৈকতচারিণী। ক্রিষ্টীন তখন সদ্য-সাগর থেকে উঠে এসে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। মাথার চুলগুলি জলে ছপ ছপ করছে, গা থেকে জল ঝরছে তার উদ্ধত যৌবনশ্রীর উছলে-পড়া মহিমার মত। বিকিনী পরেই ক্রিষ্টীন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল। ক্রিষ্টীনরা জানে, দরজায় এগিয়ে এসে মা এই বেশবাস দেখে পোড়ারমুখী বলে স্বাগত জানাবে না, পাড়ার লোকেরাও ছি ছি করবে না। মনে হল, মারুব্রা সৈকতে সমাগত সমস্ত মেয়ের মধ্যে ক্রিষ্টীনের চামড়ার রঙ সব চাইতে তামাটে, আর সে সম্বন্ধে ক্রিষ্টীন নিজেও বেশ সজাগ। জিজ্ঞেস করলাম—তোমার এমন রঙ ধরল কেমন করে বল ত? ক্রিস্টীন বলল—এবারকার ছুটি কাটিয়েছি কুইন্‌সল্যাণ্ডে। ট্রপিক্যাল কুইন্‌সল্যাণ্ডের সমুদ্রসৈকতে আলো এবং বালু আমার দেহে খুব ভাল কাজ করেছে যে।

ক্রিস্টীন মারুব্রা থেকে রোজ সিডনিতে গিয়ে চাকুরি করে। প্রথম কর্মজীবনে ওর প্রবেশ সরকারী আপিসের কেরাণীরূপে। তারপর একটি হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীতে কিছুদিন করল রিসেপশনিস্টের কাজ। তাতেও অরুচি ধরল। বসে বসে কাজ করা ওর মোটেই পছন্দ নয়। ক্রিস্টীন বলল—জীবনে চাই বেগ, চাই উত্তেজনা। তাই ঐ হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীতেই বাস-ড্রাইভারের কাজ নিয়েছি। এখন এয়ারপোর্টে যাত্রী আনা নেওয়া করি।

আমার কিন্তু মনে হল, বেগ ও উত্তেজনার পশ্চাতে বার বার ছুটাছুটি করে ক্রিস্টীন একবারও নিরাশ হয় নি, পুরুষ হয়ে না জন্মাবার জন্য নিরুপায়

বিধাতাকেও অভিশাপ দেয় নি। কথায় কথায় আরও জানলাম, বাস-ড্রাইভারীও ক্রিস্টীন আর বেশী দিন করবে না। কিছু পয়সা হলেই বিলেতে যাবে। একটি কাজ জুটিয়ে নেবে। তারপর যা-হোক-কিছু একটা পড়ার শেষে ভায়া-জার্মানী অষ্ট্রেলিয়াতে ফিরে আসবে। ক্রিস্টীন বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলল—অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ ত আর দুনিয়াতে নেই। এমন দেশ ছেড়ে কি কোথাও বেশীদিন থাকা যায়, বল ত?

কুইন্‌সল্যাণ্ডে কিন্তু ক্রিস্টীনের দুটি জিনিস লাভ হয়েছিল। এক—বয়-ফ্রেণ্ড। দুই—রঙের সাধনায় সিদ্ধি। ক্রিষ্টীনের সেই বয় ফ্রেণ্ড এখন আছে জার্মানীতে। ইংলণ্ড-ফেরত ক্রিষ্টীনের সঙ্গে সেইখানে হবে তার পুনর্মিলন। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিষ্টীনরা এমনি করেই বিদেশে যায়, এমনি করেই ফিরে আসে। বিলেতে যাব, ফিরে এলে বড় চাকুরি পাব এবং সেই সূত্রে সামাজিক মর্যাদা বাড়বে—এমন উদ্দেশ্য নিয়ে এরা কেউ বিদেশে যায় বলে মনে হয় না।

মনে করেছিলাম লাস্যময়ী ক্রিস্টীন বুঝি বা শুধুই নারীজাতীয়া, মনেপ্রাণে শুধুই বা পুরুষের বিলাস-সঙ্গিনী। মারুব্রা সৈকতের সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরিহিতা সবগুলি মেয়ে সম্বন্ধে এর চাইতে উন্নত কোন ধারণা আমার মনে আর উদয় হয় নি। অথচ ক্রিস্টীনের চলার নিঃশঙ্ক বীরভঙ্গী, আলাপের উচ্ছ্বাসহীন ঋজুতা, দেহের রেখায় রেখায় সদ্য স্নানের স্নিগ্ধতা—সব মিলিয়ে মনে হল, লালসার প্রলেপে দৃষ্টিটাকে ঘোলাটে করে ক্রিস্টীনের মত মেয়েদের দেখার মত বড় অন্যায় আর কিছু যেন নেই। তখনও আমার মনে গভীর-সঞ্চারী একটু আলোড়ন আছে। সঙ্কোচের ভাবটিও কেটে যায় নি। অথচ ক্রিষ্টীন কিন্তু তা মোটে বুঝতে পারে নি, বুঝবার মত পরিবেশেও ওর মানসিক কাঠামো তৈরী হয় নি। ক্রিষ্টীনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে চলতে আমি এই প্রথম আবিষ্কার করলাম, যে বসনের স্বল্পতার মধ্যে সব সময় দৈহিক আমন্ত্রণ বিজ্ঞাপিত থাকে না।

ক্রিষ্টীন হাঁটা-পথেই তার বাড়িতে গিয়ে উঠল, আমি চললাম ভিন্ন পথে। আলাপের প্রারম্ভে যাকে যৌবনমত্তা নারী বলে মনে করেছিলাম, সেই ক্রিষ্টীনকে এখন কত সহজ আর স্বাভাবিক, কত শান্ত আর অমায়িক বলে মনে হল।

পাঁচ

মেলবোর্ণ অষ্ট্রেলিয়ার একটি বিশেষ শহর। এর রূপে রঙে মেজাজে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন নিউইয়র্কের স্কাই স্ক্রেপারের বৈশিষ্ট্য—হামবুর্গ ব্রিমেন বনের চাইতে যা ভিন্ন ধরনের। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম যুগ-উদ্বোধনের দিনে ইয়ারা নদীতীরে আরব্ধ এই শহরটিকে দেখলে মনে হয় যেন ম্যাঞ্চেস্টার এডিনবরা লিভারপুলের মত মেলবোর্ণও একটি ইংলণ্ডীয় শহর, যদিও ইংলণ্ডীয় মানুষের সঙ্গে সেখানে ইউরোপের বার জাতির বাস। বিলেতের সঙ্গে মেলবোর্ণের সত্যিকারের মিল কিন্তু আবহাওয়ায়। মেলবোর্ণের গ্রীষ্মদিনেও হঠাৎ কখন শীত পড়ে, বৃষ্টি ঝরে, আঁধার ঘনায়। সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়। আর মেলবোর্ণবাসী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোকেরা ইংলণ্ডের মুণ্ডপাত করতে করতে বলে—ফানি ইংলিশ ওয়েদার! তবে আমরা কিন্তু অন্য বিষয়ে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরসাগর তীরে মিল দেখি।—ভারতের 'সেক্রেড-কাউ' জাতীয় উদ্ভট কোন খবরে অপরিমেয় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে লণ্ডনের মত মেলবোর্ণের কাগজওয়ালারাও সস্তায় জনচিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করে।

অবশ্য দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজের চাইতে একটি ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য আমাদের কলকাতাতেও আছে—যাকে বলে বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য। একটা ঢিলেঢালা মন্থর মেজাজ, প্রাচীনতা, ঘিঞ্জি বস্তী, গরু, মিছিল, ট্রামবাস-পোড়ানো পাণ্ডা এবং অন্তঃপ্রবাহী পাপচক্রের জগাখিচুড়ি কলকাতার সারা অঙ্গে লেপটে আছে।

অষ্ট্রেলিয়াতে কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই মেলবোর্ণের মত শহর। এর পূর্বপ্রান্তে ফিজরয় গার্ডেনসের একপাশে ক্যাপটেন কুকের কটেজ। ইয়র্কশায়ারের দূর গ্রামের যে কুটিরে সেই বিশ্বজয়ী নাবিকের জন্ম হয়েছিল, সেই কুটিরখানি ভেঙে মেলবোর্ণে এনে অনুরূপ ছাঁদে খাড়া করা হয়েছে।—এটি আসলে ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মানুষের জন্য ইয়র্কশায়ারবাসীদের স্নেহের দান। অথচ ক্যাপটেন কুক মেলবোর্ণের মাটিতে কোনদিনই পদার্পণ করেন নি। তাঁর অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের সঙ্গেও মেলবোর্ণের কোন সম্পর্ক নেই। কুকের কুটির দেখে মনে হল, মেলবোর্ণবাসীরা যেন এই বস্তুটিকে প্রতীকরূপে খাড়া

করে গোটা মেলবোর্ণের গঠন প্রকল্পে একটি ইংলিশ মেজাজ আরোপ করেছে। মেলবোর্ণের লোকেরাও একটু আভিজাত্যগর্বী, উন্নাসিক এবং যাকে বলে একটু রিজার্ভ ধরণের। অবশ্য এমন অভিযোগ শোনা যায় খাস অষ্ট্রেলিয়ানদের কাছেই।

মেলবোর্ণের কলিন্স্ স্ট্রীট দেখে আজ কল্পনা করার উপায় নেই যে এইখানে, মাত্র সোয়াশ বছর আগে, শুধু কৃষ্ণকায় মানবদের এলোমেলো আড্ডা ছিল। মেলবোর্ণের শ'খানেক মাইল উত্তরে বেণ্ডিগো শহরে নব্বুই বছরের এক বৃদ্ধ বাস করেন। জন সাচ তাঁর নাম। সাচের বাবা এই কলিন্স স্টীটেরই মোড়ে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখেছিলেন কৃষ্ণকায়দের লড়াই! যুদ্ধ শেষে বিজয়ী দল এইখানে বসেই ভোজে মত্ত হয়েছিল। খুব বড় একটি সবুজ রঙের সাপ মেরে তার গায়ে কাদার প্রলেপ দিয়ে আস্ত সাপটাকে জলন্ত আগুনে ঝলসানো হয়েছিল। তারপর খোলস ছাড়িয়ে চাক চাক করে কেটে মহানন্দে ভোজ।

মেলবোর্ণের বয়স তখনও খুব বেশী নয়। সিডনি জাঁকিয়ে উঠেছে। টাসমেনিয়াতে কলোনীর প্রসার হয়েছে। এমন কি এক বছর আগে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত হয়ে গেছে। এমন সময়ে ১৮৩৭ সালে মেলবোর্ণের জন্ম হল।

জন ব্যাটম্যান নামে অসম সাহসী একজন লোক উত্তর টাসমেনিয়ার লন্সেষ্টনে গিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন। ১৮৩৫ সালে জন কয়েক শ্বেতাঙ্গ সহচর এবং আদিম অধিবাসী নিয়ে এসে হাজির হলেন তিনি বর্তমান মেলবোর্ণের দক্ষিণ দিকটাতে। তারপর ইয়ারা নদী বেয়ে এগিয়ে একটি স্থান নির্বাচন করে ভাবলেন—এখানে ত দিব্যি একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সেদিনের সেই ব্যাটম্যান-পরিকল্পিত গ্রামটিই আজ মেলবোর্ণ শহর—সেকালের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে পরে বড় হয়ে উঠেছে।

তখন মেলবোর্ণের লোকসংখ্যা শ'পাঁচেক। ভেড়ার সংখ্যা একলক্ষ। ১৮৩৮ সালের মেলবোর্ণ দৈর্ঘ্যে আধ-মাইল। তার তিনশ' পঞ্চাশটি বাড়িতে হাজার খানেক লোকের বাস। বাড়িগুলি ছোট ছোট, সরু ডালের বেড়েতে কাদা মেখে দেওয়াল করা। রাস্তাগুলি নোঙরা।—দেড়শ বছর পরে আমাদের এখানকার গ্রামগুলির মত আর কি! এমন জিনিস যে আজও কোথাও আছে অষ্ট্রেলিয়ায় কিন্তু এখন আর সে কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

মেলবোর্ণের দ্রুত প্রসার হল। ১৮৩৮ সালের শেষের দিকে তিনটি সংবাদপত্র, দুটি ব্যাঙ্ক, তিনটি গীর্জা স্থাপিত হল। তখন এক একর জমির দাম একশ' টাকা। মাত্র দু বছর পর তার দাম হল পঞ্চাশ হাজার টাকা। দুর্নিবার গতি ও বেগ মেলবোর্ণে আজও অব্যাহত। একরোখা গোঁ নিয়ে যেন এগিয়ে চলেছে মেলবোর্ণের মানুষ, অত্যন্ত অনুচ্ছ্বাস ব্যস্ততায়। নিত্য নতুন ব্যবসা আর শিল্পের সঙ্গে প্রসারিত হচ্ছে শহরের কলেবর। দ্রুত গড়ে উঠছে একটির পর একটি করে উপনগর। সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মূল শহরের ক্লেদগুলি নাকি আত্মপ্রকাশ করে উপনগরে, সুঠাম দেহের পক্ষে শিরা উপশিরার মত। মেলবোর্ণের উপনগর জর্ডনভিল ওকপার্ক মেরিলষ্টোনে কিন্তু তার তেমন কোন পরিচয় নেই।

সারা অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী স্থাপনের দাবী নিয়ে সিডনি মেলবোর্ণ দুইটি শহরই ক্ষেপে উঠেছিল। কোন্দল এড়াবার কৌশল হিসেবে বুদ্ধিমান লোকেরা শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন একটি তৃতীয় স্থান—অখ্যাত অশ্রুত ক্যানবেরা। ক্যানবেরার স্থান আজ অদ্বিতীয়। রূপে গুণে ঐশ্বর্যে রাজধানী ক্যানবেরা আজ রাজরাজেশ্বরী, গরীব পিতার কন্যা থেকে একেবারে রাজরানী।

অষ্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগ লোকের মনের টান কিন্তু মেলবোর্ণের দিকে। ইউরোপ থেকে প্রতি বছরে একলক্ষ হিসেবে বহিরাগত অষ্ট্রেলিয়াতে আসছে। —চল্লিশ ভাগ তার ভিক্টোরিয়া রাজ্যে এবং সে চল্লিশ ভাগের বেশীর ভাগই থাকতে চায় মেলবোর্ণে। এখানে এসে ইউরোপের লোকেরা টাটকা শীত, কখনও অল্প-গরম কম-ঠাণ্ডা আবহাওয়া, পরিষ্কার আকাশ, রুজি রোজগারের খোলা পথ—সবই পায় আশাতীত প্রাচুর্যে। অষ্ট্রেলিয়ার অন্যত্রও অবশ্য এসবের খুব অভাব নেই, তবু মেলবোর্ণের প্রতি সবার যেন কিসের দুর্বলতা। মেলবোর্ণ ছেড়ে কোথাও কেউ যেতে চায় না—যদিও কার্লটন কলিংউড রিচমণ্ডের বস্তিতে অনেকেরই ঘিঞ্জিময় জীবন যাপন করতে হয়। এ যেন কলকাতার নামে ঠাকুরপুকুরে বাস করা—অথচ চিত্তরঞ্জন চৌরঙ্গী নিউ আলিপুরের নাগরিক জীবন ঠাকুরপুকুরের চাইতে কতই ভিন্ন।

মেলবোর্ণে বাগান আর পার্ক তৈরী করা হয়েছে সতেরশ' একর জমিতে। গাছের সংখ্যাও নাকি কমপক্ষে সত্তর হাজার। তবু শহরের এই সব পার্ক-এলাকা উপনগরের লোকদের কম কাজেই লাগে—বরাহনগর বেহালাবাসীদের পক্ষে গড়ের মাঠ ব্যবহার করার কম সুযোগের মত। আর মেলবোর্ণের

লোক? সপ্তাহভর ভিড়ের মধ্যে সময় পার্ক খোলা মাঠ গাছের শোভা দেখে দেখে কবিত্ব করা তাদের ধাতে সয় না। অথচ রবিবারের ছুটির দিনে শহর ছেড়ে যে কে কোথায় যায়, অথবা কে ঘরে লুকিয়ে থাকে বলা দায়। অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহরের মত রবিবারের মেলবোর্ণও মৃতের শহর, ৺নেহেরুর মতে কলকাতা যেমন মিছিলের শহর।

ব্যাটম্যানের কালে মাত্র পাঁচশ' লোক নিয়ে যে মেলবোর্ণের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তার আশে পাশে ছিল উৎকৃষ্ট তৃণাচ্ছন্ন অজস্র জমি। তাই অনেকে দূর এবং অদূরের জমিতে গরু ভেড়ার কারবার সুরু করল। মেলবোর্ণ প্রকৃতপক্ষে শহরের রূপ নিল সোনার খনি আবিষ্কারের সূত্রে। এই সূত্র ধরেই কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ঔপনিবেশিক জড়তা কাটিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিল।

১৮৫১ সালে সোনা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোরিয়া রাজ্যের পত্তন ঘটল। তখন ভিক্টোরিয়ার লোকসংখ্যা আশী হাজার। দশ বছর পর লোকসংখ্যা লম্ফে লম্ফে বেড়ে হল সাড়ে পাঁচ লক্ষ। মেলবোর্ণ হল অষ্ট্রেলিয়ার সামাজিক জীবনের ভিত্তি, সারা মহাদেশের আর্থিক রাজধানী। খনি অঞ্চল থেকে মেলবোর্ণ পর্যন্ত ত্রস্ত জনস্রোত বইতে লাগল। সিডনি এডিলেড হোবার্ট থেকেও দলে দলে লোক এলো মাটি খুঁড়ে সোনা কুড়িয়ে বড়লোক হওয়ার জন্য। এরই নাম গোল্ড-রাশ। তখনও সরকারী শাসন কায়েম হয়নি, সংরক্ষিত এলাকা বলে খনি অঞ্চল চিহ্নিত হয়নি। যে যেমন সুযোগ পাচ্ছে মাটি খুঁড়ছে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সোনা মিলছে। এই গোল্ড-রাশের দিনে সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা দেখা দিল। যারা চতুর লোক, তারা কিন্তু মাটি থেকে সোনা সংগ্রহের বদলে খাদ্য আর মদ্যের ব্যবসা সুরু করল। তারাও ধনী হল ব্যবসা করে।

১৮৫২ সালের প্রথম নয় মাসে গোল্ড-রাশ অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর সাগরের ওপার থেকে একমাসে উনিশ হাজার লোক এসে মেলবোর্ণের জাহাজ ঘাটায় নামল। সবাই এসেছিল সোনা কুড়াবার লোভে। এই সোনা কুড়ানো টান যেন আজও অব্যাহত আছে মেলবোর্ণে। তাই আজও নবাগতরা আসতে চায় এইখানে—যদি হঠাৎ আশাতীতভাবে ভাগ্য ফেরে। সোনা কুড়াবার সূত্রেই কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ানদের নাম হয়েছিল 'ডিগার' অর্থাৎ খননকারী। ভিক্টোরিয়া রাজ্যের এবং মেলবোর্ণ শহরের লোকেরা

একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে অভিবাদন করতে লাগল 'হ্যালো ডিগ' বলে। অষ্ট্রেলিয়াতে লোকে আজও 'ডিগ' শব্দটিকে ভোলে নি। আজও কিছু লোক বিশ্বাস করে, ডিগ সম্বোধনে ধ্বনিত হয় অস্ট্রেলিয়ার অতীত ঐতিহ্যের গৌরব। এশিয়ার ভিয়েৎনামে ইজমের যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যও আজ প্রাণপণে লড়ছে। সংবাদ প্রচারে তাদের সম্পর্কে হরদম 'ডিগ' শব্দটির ব্যবহার চলছে। 'পাঁচজন অস্ট্রেলিয়ান নিহত'র বদলে অষ্ট্রেলীয় সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে—'পাঁচজন ডিগ সৈনিক নিহত।'

চার্চিল্ সাহেব কোনদিনই অষ্ট্রেলিয়াকে কলোনীর অধিক ভাবতে পারেন নি। আর বৃটেনের জনসাধারণের মনোভাব? তাঁরাও কি আর বেশী কিছু ভাবতে পেরেছিল! কিছুদিন আগেও বৃটেনের ক্রম-নিঃসম্বল মানুষকে বলতে শুনেছি—বেশী অসুবিধা হলে অষ্ট্রেলিয়া ত আছেই। সেইখানে চলে যাব। অষ্ট্রেলিয়াটা যেমন সবার পিতৃপিতামহের তালুক—যখন খুশি এলেই ভোগদখল নিয়ে বসা যাবে!

তখন জার্মান-বৃটিশে যুদ্ধ চলছে। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া থেকে সৈনিক নাবিক রসদ নিয়ে জার্মান-সাগরেদ তুর্কীদের ঠেকাতে হয়েছিল গ্যালি-পলীতে। অষ্ট্রেলিয়াতে কিছু লোক তখনই সন্দিগ্ধভাবে ভাবতে শুরু করেছিল—সাত সাগর তের নদীর পারে ওরা আমাদের কে, যে আমাদের প্রাণ বলি দিতে হবে ওদের প্রাণ রাখতে?

এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানীরা উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইনে বোমা ফেলল। তখন অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সব সৈন্য দেশের সাত হাজার মাইল দূরে, চার্চিলের নির্দেশ পালনে রত। অষ্ট্রেলীয় সৈনিকদের দেশে পাঠাবার দাবী উঠলে চার্চিল গররাজী হলেন। তখন থেকেই অষ্ট্রেলিয়ায় জাতীয় চেতনা আরও বাড়তে লাগল। ক্রমে অষ্ট্রেলিয়ানরা দুর্জয় আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বতন্ত্র সার্বভৌম জাতিরূপে মাথা তুলল। আর অনেকে বৃটিশের কলোনিয়াল মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় মনে মনে বিরূপ হয়ে রইল। চার্চিলের তিরোধানের পর অষ্ট্রেলিয়াতে তাঁর স্মৃতি তহবিল গঠন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক লোকই উষ্মা প্রকাশ করেছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার কর্ণধারদের মনের টান কিন্তু অনেকদিনই ছিল লণ্ডনের দিকে। বৃটিশ রাজের খেতাব পাওয়া স্যার রবার্ট মেনজিস চার্চিলের মৃত্যু দিনে লণ্ডন বেতার ভাষণে বলেছিলেন—এই লণ্ডন, আমাদের লণ্ডন

ইত্যাদি। তখন অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা টিপ্পনী কেটে বলেছিল—লণ্ডনটা আবার আমাদের হল কি করে?—বিলেতি সাহেবদের চোখে আমরা আজও ত ডিগার—আফ্রিকার নিগার, আর ইণ্ডিয়ার নেটিভদের মত।

প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ যুগের সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় নতুন রাষ্ট্র চিন্তা এবং রাজনীতি বোধের উদয় হয়েছিল, নিজেদের গড়া আইনে দেশ শাসন করা উচিত বলে ডিগার-অষ্ট্রেলিয়ানরা ভাবতে শুরু করেছিল—সাগর পারের শাসন তাদের কাছে মনে হয়েছিল অর্থহীন। সোনা আবিষ্কার না হলে হয়ত এত লোকের এত শীঘ্র অষ্ট্রেলিয়ায় আগমন ঘটত না, পৃথক জাতীয়ত্বের কথাও শোনা যেত না। আরও দীর্ঘদিন অষ্ট্রেলিয়া হয়ত কয়েদ-কলোনী হয়েই থাকত। জাতীয় সত্তা দানা বাঁধার জন্য সোনা আবিষ্কারের মত একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রয়োজন ছিল, যাকে কেন্দ্র করেই সেদিন লোক আগমন থেকে ভূমি-বণ্টন, আত্মনিয়ন্ত্রিত সরকার, নবজীবনের পত্তন—সব কিছু সম্ভব হল। মেলবোর্ণ সেই সোনার শহর। মেলবোর্নিয়ানরা ডিগারদের রক্তবাহী হয়েও কিন্তু উন্নাসিক ইংরেজ সংস্কৃতিরই পতাকাবাহী। এখনও মেলবোর্নের হাওয়ায় একটুখানি রক্ষণশীলতা আছে। ইংরেজের চরিত্রগত দার্ঢ্যের ভাবও একটুখানি আছে।

মেলবোর্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায় হামেশা একটি জিনিস দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।—সরু পাতলুন ছুঁচাল জুতো পরে জোয়ান জোয়ান ছেলের দল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। মাথা ভরা তাদের মেয়েলী চুল। দেখে দেখে খটকা লাগত মেয়ে, না পুরুষ। অবশ্য আজ অষ্ট্রেলিয়ার সর্বত্র এই দৃশ্য সব সময় চোখে পড়ে। তবে মেলবোর্নের স্থান কিন্তু সর্বশীর্ষে। মেয়ে-ভ্রম-হওয়া লম্বা চুলওয়ালা এত বেশী ছেলে দেখা যায় না আর কোন শহরে। অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্টি কেন্দ্র মেলবোর্নের মর্তলোকে একদিন বীট্‌লদের পদধূলি পড়েছিল। সেদিন তাঁরা যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন, মেলবোর্নের যুবকরা আজও তাতে মোহাচ্ছন্ন। তাদের লম্বা লম্বা মেয়েলী চুল তারই প্রমাণ।

বীট্‌ল আগমনের আগে মেলবোর্নের সে কি প্রস্তুতি! প্রতি রবিবারে বীট্‌ল-ডে, তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্ম মহড়ার দিন। শহরে বীট্‌ল পরচুলা পর্যন্ত চালু হয়ে গেল। শহর প্রবেশের দিনে তিন লক্ষ মেলবোর্ন-বাসী বীট্‌ল-দর্শনের জন্য প্রস্তুত। তার দুই লক্ষের হাতে ছিল ট্র্যানজিস্টর

রেডিও। সবাই মুহুর্মুহু ঘোষণা শুনছে—এই যে বীট্‌লরা এসে পৌঁছাল, এই তারা গাড়িতে উঠল, এই যে গাড়ি বিমান বন্দর থেকে রওনা হচ্ছে। তারপর রেডিওতে গান শুরু হল—আমরা জনকে ভালবাসি, পলকে ভাল-বাসি জর্জকে ভালবাসি, রিঙ্গোকে ভালবাসি।

বীটলদের গান শুরু হয়েছে। বিরাট হল ঘরে তখনও বেসামাল হল্লা চলছে। সেই গর্জ্জনশীল কোলাহল যেন আর থামবার নয়। এক সাংবাদিক ভদ্রলোক সইতে না পেরে জনতার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলেছিলেন—শাট আপ! সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকটি তাঁর জামার হাতা আকর্ষণ করে জবর তর্জনের সঙ্গে বললেন—সামনের সারিতে যে শীলারা বসে আছে তারা যদি একবারটি টের পায় যে তুমি বীট্‌ল-বিরোধী, তাহলে মজাটা একবার বুঝবে মেট!

অষ্ট্রেলিয়াতে জুলিয়েট শ্রেণীর মেয়েদের আজ পাইকারী হারে বলা হয় শীলা—ফ্লার্ট গার্ল, এই অর্থে। এরা বিয়ের বয়সী, রসিকা এবং প্রেমিকা—রোমিও জন মনমোহনকারিনী। প্রেমিক প্রবররা আদর করে এদের বলে শীলা, বুড়োরা বলে ব্যঙ্গচ্ছলে। তবে সামনে বলার হিম্মৎ কারও নেই। দলবদ্ধ শীলাদের বিরক্তি ভাজন হওয়া যে বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়, সে কথাটি সবাই কিন্তু মর্মে মর্মে জানে।

মেলবোর্নে বীট্‌ল আগমনের দিনে শীলাদের উৎসাহটাই যেন ছিল সব চাইতে বেশী। তাদের দেখে দেখে সবাই বলছিল, যেন কতদিন পরে দূরাগত প্রেমিকের সঙ্গে তাদের বহু বাঞ্ছিত মিলনের একটি শুভ লগ্ন এসেছে। রিসেপশন হলে অভিনন্দনের সময় একজন শীলা আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে ত বলেই উঠল—ছুঁয়েছি, আমি বীঠ্‌লকে স্পর্শ করেছি। আজ আমি ধন্য! জানি না, আমাদের হেমন্ত মুখার্জি অথবা লতা মুঙ্গেশকর গান গাইলে, কিংবা পি.সি সরকার ম্যাজিক দেখালে এমনি অবস্থা কখনও হয়েছিল কিনা এবং রাজনৈতিক আড়কাঠিরাও তার সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছিল কিনা। ইংলণ্ডে বীট্‌লদের নিয়ে অবশ্য আরও বেশী কিছু হয়ে গেছে। দেশের বিধ্বস্তপ্রায় আর্থিক মেরুদণ্ডটিকে উজ্জীবিত করবার জন্য বীট্‌লদের কাজে লাগাবার কথাও শোনা গেছে। সাধে কি আর বলে হুজুগের যুগ।

সেদিন ইংলণ্ডের বীট্‌ল এসে যখন ভারতের রবিশঙ্করের পায়ের কাছে

বসে সেতার বাজনার পাঠ নিলেন, তখনই আমাদের তাবৎ সাহেব-ঘেঁষা লোকগুলি বোধহয় সন্দেহ করল, শঙ্করজীর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পাণ্ডিত্য না থেকেই যায় না। হয়ত অনেকদিন পর তাদের বাইরে থেকে ঘরের দিকে চোখ ফেরাবার সুযোগ ঘটল। আশা করি বিশ্ব বন্দিত শঙ্কররা এইবার আরও বেশী করে বিদেশে যাবেন। নাচ দেখিয়ে সেতার শিখিয়ে বিস্তর বিদেশী মুদ্রা তাঁরা সংগ্রহ করলে আমাদের মত পরগাছাদের যে অনেক লাভ।

বীট্‌ল-মোহ দিয়ে কিন্তু মেলবোর্ন সংস্কৃতির বিচার করা চলে না। এ হচ্ছে আসলে কৃষ্টি-বিকারের উপর একটি সাময়িক বিষ-ফোঁড়া। তাই মেলবোর্নের রোমিওরা আজ বীট্‌লদের মত চুল রাখে, আর তাদের পেছনে শীলারা পাগলিনী-প্রায় ছোটে।—চুলওয়ালা এই যুবকদের মধ্যে তারা যে বীট্‌লদেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়! অন্য শহরের যুবকরা আজ মেলবোর্নে এলেই বীট্‌ল চুল রাখার দীক্ষা নিয়ে ফিরে যায়। রোমে গিয়ে রোমান হওয়ার বদলে রোমিও সাজা আর কি!

ছয়

মেলবোর্নে ইয়োহান ভন ভিলহেন নামে একজন ফিনল্যাণ্ডীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। চুলের রঙ তার সোনালী, গায়ের রঙ লাল, আর চোখের রঙ সমুদ্রনীল। ছিপছিপে গড়নের নতুন জোয়ান।—যে স্বপ্নরাজ্যের রাজকুমার।

ভিলহেনের মধ্যে আসলে কিন্তু কৌমার্যের কোনই বালাই নেই। সে বেকার—এই তার তখন পরিচয়। অথচ সেজন্যও ওর কিছুমাত্র কিন্তু ভাবনা নেই। যেখানে সেখানে খাচ্ছে, যার তার সঙ্গে ঘুরছে—কাল কি খাবে কোথায় যাবে এমন কোন সম্ভব অসম্ভব দুশ্চিন্তা ওর যুবকত্বের চাপল্য ভেদ করে কখনই বাইরে আসার ফুরসত পাচ্ছে না। আমাদের অতীত গুরুরা শিখিয়েছেন সবাইকে নিস্পৃহ হতে, কালকের ভাবনা আজ না ভাবতে। এই বিদেশী বিজাতীয় যুবকটিকে দেখে কিন্তু মনে হল, সেই সন্ন্যাসী সুলভ নিস্পৃহ জীবনের আহ্বান ওর কাছে যেন একটি নির্মল সত্যের মত ধরা দিয়েছে।

আসরে আড্ডায় রাস্তায় রোওয়াকে ভিলহেন যা কিছু বলে তার যে খুব

একটা ভারিক্কি অর্থ আছে তা নয়, কোন ফিলজফি বা মতবাদ প্রচারও সে করে না—নেহাৎ বলতে হয় তাই যেন বক বক করে। ওর আপাত বেকার দশায় এখন যে কথাটি অত্যন্ত অল্প ভেবে বেশী করে ও বলছিল সে হচ্ছে এই যে অষ্ট্রেলিয়া দেশটি ভদ্রসন্তানের পক্ষে ঠিক বাসোপযোগী স্থান নয়। আসলে ডিলহেনের মনে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি চটিতং ভাব ঘোঁট পাকিয়ে আছে এবং তার কারণ এই, এবার ওর মন ছুটেছে বিবাগী হয়ে বাইরের কোন দেশে—অথচ যাওয়ার মত কোন উপায় করে উঠতে পারছে না। ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুর হয়ে ভারতবর্ষের পথে কি করে পাড়ি জমান যায় এখন ডিলহেন শুধু সেই স্বপ্ন দেখেছিল। ডিলহেন নাকি শুনেছ, যে ইউরোপীয়রা যখন গাছের কোটরে পাহাড়ের গুহায় বাস করত, ভারতবাসীরা তখন সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে। এমন দেশ ওর দেখা চাই, নিজের বুদ্ধিতে যাচাই করে জানা চাই সেদেশের অবস্থাটি আজ কেমন।

ফিনল্যাণ্ডের স্মৃতি ডিলহেনের কাছে আজ তেমন মধুর নয়, তেমন করে মনে রাখার কোন কারণও ঘটে নি। ওর বাবা মাছের জাহাজের মালিক। সেই জাহাজের ভাসমান কক্ষেই ডিলহেন পৃথিবীর আলোয় প্রথম চোখ মেলেছিল। বাল্টিক সাগর, শ্বেত সাগর, উত্তর আটলান্টিকে মাছ ধরে এবং ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, জার্মাণীতে বিক্রী করে ওর মৎস্যজীবী পিতা বিস্তর টাকা আয় করতেন। আর মা রান্না করে স্বামী এবং নাবিকদের খাওয়াতেন।

সেই বরফ জমা শীতের সাগর ডিলহেনের ভাল লাগে নি, উত্তর আটলান্টিকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিভীষিকা আজও তার কাটে নি। ডিলহেন কিন্তু সেই ভাল-না-লাগা জীবনের কথা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে শিখেছিল মাত্র আট বছর বয়সে, সুইসজারল্যাণ্ডের বোর্ডিং ইস্কুলে পড়তে এসে। সেই তার মাটির প্রথম স্পর্শ, সেই প্রথম তার মাটির মানুষের সঙ্গে মিতালী। সমুদ্রে আর সে ফিরে যায় নি, ফিরে যায় নি হেলসিঙ্কী শহরে। সেখানে তাদের মাটি নেই, জমি নেই, বাড়ি নেই—আছে শুধু ভাসন্ত জাহাজের আশ্রয়।

হাই ইস্কুলের শেষে দুই বছর পর্যন্ত এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন ডিলহেনের মনে হল, এ ঠিক তার পছন্দ মত বিদ্যা নয়। তখন ওর আঠারো বছর বয়স। পড়া ছাড়ল, সুইসজারল্যাণ্ড ছাড়ল। হাজির হল গ্রীসে। তারপর ইটালী জার্মানী ফ্রান্স হয়ে পীরানীজ পার হল। এলো স্পেনে। সেখান থেকে আবার ফ্রান্সে ঢুকে ক্যালে বন্দরে খেয়া পার হয়ে

গিয়ে উঠল লণ্ডনে। জুরিখ থেকে লণ্ডন—দুই বছরে পরিব্রাজক জীবনে কুলী থেকে কেরাণীর কাজ করতে করতে মাটির জীবনে আবার বিতৃষ্ণা এলো। তখন ভাবল—একবার সাগরে গেলে কেমন হয়।

ডিলহেন সাগরে এলো নাবিক হয়ে, জাহাজ-ক্যাপটেনের বয়ের কাজ নিয়ে। কিন্তু দিশেহারা হল সে খাবার কথা ভেবে। তৈরী করার লোক নেই। জাহাজের বাবুর্চিগুলি মদ গিলে পড়ে আছে ত আছেই। কোনদিন যে উঠে তারা হেঁসেলে ঢুকবে, খাবার করবে তেমন ভরসা পেয়ে উঠল না। ঠিক এমনি সময়ে ক্যাপটেন একদিন তাজা তরুণ ডিলহেনকে ডেকে বললেন —তুমি আমার বাবুর্চি আর বয়ের কাজ একই সঙ্গে কর না কেন? ডিলহেন বলল—সেদিন রান্নার কাজ হাতে পেয়ে কিন্তু আমি বেজায় খুশি। জোয়ান পেটের ক্ষুধা নিয়ে রান্নাঘরের কর্তা—সুতরাং বুঝতেই পারছ অবস্থাটা।

ডিলহেন কিন্তু জাহাজের কাজ করতে করতেই উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিল, জেনোয়া মাল্টা বেরুট দেখেছিল, পোর্টসৈয়দে এসে আরবদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিল। তারপর আরও কত ঘাট অঘাটের জল খেয়ে, কেপটাউন ডারবান মোমবাসা ঘুরে শেষপর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় এসে মেলবোর্নে নেমে একদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। আর জাহাজে সে ফিরে যায় নি, আর যে যাবে না এমন প্রতিজ্ঞাও সে করে নি।

জন ডিলহেনের ভবঘুরে জীবনের অনেক গল্পই শুনলাম। বিশেষ করে আরও শুনলাম তার পাঁচ বছর অষ্ট্রেলিয়া বাসের কাহিনী। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে মানব বাসোপযোগী হেন জায়গা নেই, যেখানে ডিলহেনের পদধূলি না পড়েছে। ফ্রিম্যাণ্টেলের ডকে কুলীর কাজ করতে করতেই ভিকটোরিয়ার ডেয়ারী ফার্মের ডাক তার কাছে পৌঁছেছিল। একদিন সুপ্রভাতে সেই ডেয়ারী ছেড়ে হাওয়া হয়ে এসে সিডনির হোটেলে সে খানসামার কাজ নিল। তারপর ম্যানেজারের নাকের উপর হঠাৎ ঘুষি মেরে চাকুরি ছেড়ে কুইনসল্যাণ্ডে আখের খামারে গিয়ে হাজির হল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা পনেরো দিন ইক্ষুনাশের পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডিলহেন। সে এক অশেষ কায়িক শ্রমের কাজ—মনে হল, জন কয়েক লোক জোর করে ধরে তাকে যেন বাঁশ-ডলা করে ছেড়েছে। পনের দিনের জমান পয়সা নিয়ে তখন আরম্ভ হল নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা। খাওয়া আর 'পাবে' গিয়ে মদ গেলা। এমনি করেই ডক থেকে ডেয়ারী, খামার

থেকেইখনি, হোটেল থেকে হাসপাতালে কাজ করে আর না করে শেষ পর্যন্ত ডিলহেন এসে ঠেকেছিল মেলবোর্ণে। এবার খুঁজে বেড়াচ্ছে মেলবোর্ণের বাইরের পথ। ওর গল্প শুনে কিন্তু মনে হল, কোন অলক্ষ্য বিধাতা আপন খেয়ালে কবে যেন এক বিশ্বজোড়া পথ তৈরী করে রেখেছেন, আর এই নিদারুণ পথ-ক্ষেপা যুবক তারই প্রান্ত সীমা থেকে সবে যাত্রা শুরু করেছে।

কিন্তু ডিলহেনের পথচলার গল্প ত আর আমার বিষয়বস্তু নয়, আর তা। ঠিক হৃদয় দিয়ে বোঝার মত অভিজ্ঞতাও আমার নেই। তাই ডিলহেনকে বললাম—তোমার পাঁচ বছর অষ্ট্রেলিয়া-বাসের কাহিনীর মধ্যে শোনাবার মত কিছু থাকে ত তাই বল। ডিলহেন শুরু করল একটি মেয়ের গল্প। মেলবোর্ণের মেয়ে, নাম তার এডনা স্কট। ফিল্ডার্স ষ্ট্রীটের মোড়ে একদিন আচমকা ওর আলাপ হল এডনার সঙ্গে। ডিলহেনকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে এডনা তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—আমার বন্ধু ডন ডিলহেন। এডনার বাবা হাত বাড়িয়ে অল্প হেসে বললেন—হা-ডু-ডু। মার্টিনের কথা তার চকিতে মনে এল। তার সঙ্গেও ত এডনা একদিন ভাব করেছিল, এমনি করেই ডেকে এনে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ কোথায় মার্টিন, কোথায় এডনা। তবে মার্টিনের চাইতে ডিলহেনের আলাপের স্নিগ্ধ ভঙ্গীটি, তার আপাত শ্রদ্ধার ভাবটি তাঁকে মুগ্ধ করল। আর মুগ্ধ না করলেই বা কি—কন্যার একুশ বছরের জন্মদিন তখন পার হয়ে গেছে। সাবালকত্বের ছাড়পত্র পাওয়া কন্যার ইচ্ছার উপর জুলুম করা, অথবা তার বয় ফ্রেণ্ডের মুখের উপর দরজা টেনে দেওয়ার অধিকার শুধু এডনার বাবা কেন, অস্ট্রেলিয়ার কোন পিতৃদেবেরই নেই। একটি স্বতন্ত্র কক্ষ দেখিয়ে তিনি ডিলহেনকে বললেন—এটি তোমার থাকার ঘর। অবশ্য আলাপের শুরুতে এডনা তার বাবাকে এই ধারনা দিয়ে রেখেছিল, যে ডিলহেন মেলবোর্ণে নবাগত, এবং এডনার এত বন্ধু থাকতে ডিলহেনের হোটেল-বাস ভাল দেখায় না। মেয়ের রুচি দেখে বুড়ো মনে মনে যে একটু খুশি না হয়েছিলেন তা নয়। পঞ্চদশ রজনীর শেষ মিলনের লগ্নে এডনা কিন্তু ডিলহেনকে জানাতে মোটেই সঙ্কোচ করল না—কাল আমার স্থায়ী বয় ফ্রেণ্ড ব্রিসবেন থেকে ফিরে আসছে। সুতরাং—

আমি ভেবেছিলাম এডনার উপর ক্ষেপে গিয়েই বোধ হয় মেয়ে জাতির উপর ডিলহেনের অত ক্রোধ, অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ওর বিষোদ্গার।

আসলে তা কিন্তু সত্য নয়। এমন মেয়ে ডিলহেনের জীবনে অনেক এসেছে। তাই বহু পরিচয় বহু মিলনের পর নারীর মূল্য সম্বন্ধে ওর মনে বড় শোকাবহ ধারণাই জন্মেছে। অথচ প্রায় আদিম অধিবাসীর দেশ নিউগিনির নারী সমাজের একটি বিশেষ মূল্য আছে বলে ডিলহেন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। নিউগিনির যে বাপের পাঁচ পাঁচটি মেয়ে আছে সে নাকি রাজা লোক। কনে পছন্দের পর বর গিয়ে ভাবী শ্বশুরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব তোলে। শ্বশুর মশাই গোঁফে তা দিয়ে বলেন—আমার এই মেয়ে বিয়ে করতে হলে অত গণ্ডা শূওর চাই। নিউগিনির বড় সম্পদ শূওর। আসলে শূওরের মূল্যে সেখানে স্ত্রীধন কিনতে হয় না, অর্জন করতে হয়। অর্জনের ধন ত আর হাত ফসকাবার উপায় নেই। বিচিত্র সেই নিউগিনিতেও এই ফিনল্যাণ্ডীয় যুবকের সাময়িক সঙ্গিনীর অভাব হয় নি। অষ্ট্রেলীয় সুন্দরীদের প্রায় বিনা নোটিশে বাতিল করে দিয়ে ডিলহেন বিজ্ঞের মত বলল—বিয়ে করে ঘরে রাখতে চাও ত এদেশের নয়, নিউগিনির মেয়ে। আমি বললাম—আমাদের দেশে মেয়েদের কিন্তু ঘরে রাখতে হয় না—তারা স্বেচ্ছায় ঘরে থাকে।

অষ্ট্রেলীয় মেয়ে সম্বন্ধে ডিলহেনের ধারণা কিন্তু অপরিবর্তনীয়—তারা বিলাসিনী, রাঁধতে জানে না, ঘর সংসারের কাজ জানে না। ডিনারের সময় হলে স্বামীকে বলে—চল ডিয়ার, হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি। আর বিয়ের আগে? ডিলহেন ডবল উৎসাহে বলল—রাতদিন বাবুসাজা, সামর্থ্যের বেশী ব্যয় করে, লেটেস্ট মডেলের পোশাক কেনা, প্রতি সন্ধ্যায় পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে বাইরে গিয়ে শুধু এইটে প্রমাণ করা, যে তাকে নিয়ে অভিসারে যাওয়ার মত হৃদয়বান প্রেমিক আছে। একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। বিবাহিতা মেয়েদের বিরুদ্ধেই ডিলহেনের অভিযোগটা একটু বেশী রকমের ঝাঁঝালো।—পুরুষ রোজগার করে, এরা মজাসে খরচ করে। স্বামীর আপিস-সময়ে বারে গিয়ে মদ গেলে, পরপুরুষের সঙ্গ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ওর কিন্তু একটি মহৎ গুণেরও পরিচয় পেলাম—বলতে ভুল করল না, যে অষ্ট্রেলীয় মেয়েরা আর যাই হোক, আদপে হিপোক্রিট নয়। বিবাহোত্তর প্রেমের কথা তারা রঙ বদলিয়ে স্বামীর কানে তুলে প্রেমিককে দোষী এবং নিজেকে সতীলক্ষ্মী কুলবধূটি প্রমাণের চেষ্টা করে না, কথায় কথায় ন্যাকা সাজে না।

ডিলহেনের অভিযোগগুলি অবশ্য সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। নিশ্চয় করে বলা শক্ত, অষ্ট্রেলিয়ার শতকরা কতজন মেয়ে ডিলহেনের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। আরাম আয়েস প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে হিটলারের ব্যাক-টু-কিচেন থিয়োরী যে তারা মানে না সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথা ঠিক, বিয়ের পর অনেকেই বেশ কিছুদিন ছিমছাম থাকতে চায়, সন্তান-ধারণে গড়িমসি করে, আর তার ব্যাঘাত হলেই ক্ষেপে গিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু অভিযোগে বলে—আমি বলেছিলাম এখন সন্তান এনে কাজ নেই। আমাকে ধোকা দিয়ে স্বামী বলেছিল—তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, সব ঝামেলা আমার। এদিকে দু বছরে পর পর দুইটি সন্তানের জন্ম দিয়ে এখন আমাকে সন্তান সংসারের মহা বিপাকে ফেলেছে, বার ক্লাব গল্‌ফে যাওয়া আমার খতম করে দিয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে স্বামীরা অনেকেই কিন্তু আসামীর ভূমিকা অস্বীকার করে ডাইভোর্সের পথ দেখে, আর ডাক্তাররা স্ত্রীর মনোবিকলনের চিকিৎসার কথা ভাবেন।

আমাদের পল্লীবধূদের কথা দুঃখের সঙ্গে মনে না পড়ে যায় না। পর পর গোটা দশেক সন্তান প্রসবের পরও স্বামীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মত উপায় তাদের নেই। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত স্বামী আর সন্তানের গুরুভার আজও তারা নীরবে বহন করে। অনেক সময় মনে হয়, আমাদের সবগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থ শুধু যদি জন্ম নিয়ন্ত্রনে ব্যয় করা হত।

অষ্ট্রেলিয়ান মেয়েদের বিরুদ্ধে ডিলহেনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। দায়িত্বশীল মহলের হিসেব অনুসারে কোর্টশিপকালেই শতকরা পঁচিশটি অষ্ট্রেলিয়ান মেয়ে গর্ভবতী হয়, তারপর বরের সঙ্গে ফরম্যাল বিয়েটা সারে। একাধিক পুরুষের সঙ্গে কোর্টশিপের ফলে শতকরা সাতটি সন্তানই অবৈধ পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য অন্য অনেক দেশেই কিন্তু প্রাকবিবাহ সমাজ চিত্র এর চাইতে তেমন কিছু উন্নত নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ত বার থেকে সতেরো বছর বয়সের প্রতি তিন শ'তে চল্লিশটি কুমারী মেয়ে কম পক্ষে পঞ্চাশবার পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হয়। জন্ম শাসনের পদ্ধতিগুলো তারা নির্ভুলভাবেই জানে। কিন্তু অষ্ট্রেলীয় মেয়েরা আজ তাদেরও বুঝি ছাড়িয়ে গেছে। মৌখিক প্রক্রিয়ায় তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে মুড়ি মুড়কির মত বড়ি খেয়ে। পৃথিবীর সর্বাধিক জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে আজকের অষ্ট্রেলিয়ায়। অর্থাৎ এক কোটি পনেরো লক্ষ

লোকের দেশ এই বড়ি সেবনে সর্বাগ্রগণ্য আমেরিকা এবং সর্বাধিক জনসমৃদ্ধ চীন সহ পৃথিবীর সব কটি দেশকেই পেছনে ফেলেছে!

ভিলহেনের অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করা বৃথা। সে কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী নয় যে পৃথিবীর কোথাও দোষটা শুধু মেয়েদের নয়। অবশ্য সর্বত্রই ভিলহেনেরা একচোখা হরিণ। অবৈধ অপকর্মে পুরুষের ভূমিকা স্বীকার করতে তারা নারাজ। সম্প্রতিকালে ইউরোপাগত আর সব কন্টিনেন্টাল মানুষের মত ভিলহেন এখনও অস্ট্রেলিয়ার অকরুণ সমালোচনা করেই চলেছে। ওকে বললাম—এমন দেশ কি আর কোথাও খুঁজে পাবে? এই যে যখন খুশি চাকুরি ছাড়ছ, তার কারণ কি এই নয়, যে আর একটি চাকুরি অবিলম্বেই পাবে এবং সে সম্বন্ধে মনে মনে তুমি একেবারে নিঃসন্দেহ? যাও ত একবার অন্যদেশে, খেয়াল খুশিমত চাকুরি ছেড়ে বসে থাকার মজাটা একবার বুঝবে। ভিলহেন কিন্তু জবাব দিল না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা যারা জানে না তারা নাকি নির্বোধ। ভিলহেন কিন্তু নকল দাঁতে হাসতে জানে।

ভিলহেন আর এখন ফিনল্যাণ্ডে ফিরে যাবে না; কারণ পিতা তাকে পৈত্রিক কাজের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন সেই তার বড় ভয়। বরং ভিলহেন তাঁকে উল্টে লিখেছে, উত্তর আটলান্টিক ছেড়ে সাউথ প্যাসিফিকে পাড়ি জমাতে। কিন্তু বুড়োর মত সে বিষয়ে একেবারে পরিষ্কার—মাছের জাহাজের মালিক হয়ে সাগরে সাগরে ঘুরে মাছ ধরা এবং দেশে দেশে ফিরে মাছ বেচার মত মহৎ কর্ম দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। ভিলহেন এখন বুড়োর মৃত্যুর দিন গুনছে!

ভিলহেন দেশে যাবে না, ইটালীতে নয়, গ্রীসে স্পেনে ফ্রান্সে নয়—যত সব মরের দেশ ইংলণ্ডেও নয়। জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কোন্ জাহান্নামে যেতে চাও বলত? এবারও ভিলহেন নিরুত্তর। দেশে দেশে ঠাঁই করে দৈহিক ঔদরিক বহু ক্ষুধা, মিটিয়ে ভিলহেন কি সত্যি আবার পথের মাঝেই ফিরে যেতে চাইছে, নাকি মেলবোর্নের কোন প্রিয় সড়কে কান পেতে বসে আছে কারও কাছে শুধু সেই কথাটুকু শোনার জন্য—তুমি আমায় ধন্য করেছ।

কিন্তু ভিলহেনেরা ত চিরকালের তরে কাউকে ধন্য করবার জন্ত নয়। স্থির হয়ে যাবার জন্যও নয়। তারা যায় বার বিবাগী হয়ে বাহামা বার্মুডা

উলাউরার মেষচারণে ভেড়ার দল

ভেড়া থেকে বৈদ্যুতিক কাঁচিতে পশম কাটা হচ্ছে।

বর্মায় ঘুরে বেড়াবে, অষ্ট্রেলিয়ায় আসবে ; ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন পথও তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ডিলহেনরা ত ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ—থামতে জানে না, আপন পুঁজি জমিয়ে রাখতে জানে না। পথের বিধাতা পাগল করে তাদের বিশ্বের পথে ঘোরায়।

সাত

মেলবোর্ণ থেকে এসে এক ছোট্ট স্টেশনে নেমে অবাক হয়ে দেখলাম, একটি বনশ্যাম পল্লীচ্ছায়া সন্ধ্যার ম্লান আকাশে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। আপিস-ফেরা কত লোক গাড়ি থেকে নেমে রেলপথ পেরিয়ে হয়ত বা ইচ্ছে করেই বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে ঘরের দিকে যাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ির তেমন ভিড় নেই, লোকের মধ্যেও ব্যস্ততার কোন লক্ষণ নেই। এরা বড় নগরে গিয়ে কাজ করে, উপনগরে এসে বাস করে। এলথাম মেলবোর্ণের উপনগর। দুইদিকেই তার ক্রম-উচ্চ পাহাড়ের আধিপত্য। মধ্যদেশে মোচার খোলার মত একটি উপত্যকাভূমি ; বনে বনময়। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে আশী হাজার লোকের বাস।

এলথামের বৈশিষ্ট্য তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। পথে ঘাটে গাছে গাছে একটি অ-শহুরে সুর যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। একশ বছর আগে শ্বেতকায় লোকেরা এলথামে যখন বসতি গড়তে শুরু করে তখন বনে বনে যে গাছটি যেমন ছিল, এখনও যেন তেমনি সবুজ আর সজীব হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। জানি না এলথামের মানুষ গাছ না কাটার এবং প্রাকৃতিক পরিবেশবিনাশী কৃত্রিমতা সৃষ্টি না করার সঙ্কল্প একেবারে প্রথম দিন থেকেই গ্রহণ করে বসেছিল কিনা।

মেলবোর্ণ থেকে এলথামের দূরত্ব পনেরো মাইল। শহর জীবনের কোন স্বাচ্ছন্দ্যই সেখানে দুর্লভ নয়। মেলবোর্ণের সঙ্গে তার নিত্যযোগ রুটি আর রুজির জন্য, টিটাগড়ের অনেক লোকের পক্ষেই কলকাতার টানের মত—যদিও টিটাগড়ের মাঠ কাঠা কাঠা জমিতে ভাগ করা হয়েছে, বেশীর ভাগ গাছই কাটা পড়ে গেছে, ইটের ইমারতে ইটাগড় তৈরী হয়েছে। অথচ আজও কিন্তু টিটাগড়ের ইমারতবাসী ছাড়া বাকী লোকেরা পড়ে আছে প্রায় সেই সুদূর যুগে, যখন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পাশের গ্রাম খড়দহে পদধূলি দিয়েছিলেন।

এলথামের কিন্তু অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। মেলবোর্ণের কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের অনেকেই এলথামে এসে কুটির তুলেছেন, সেখানকার বনপ্রকৃতির মধ্যে ডেরা বেঁধে শহরের কোলাহল সহজেই এড়িয়ে গেছেন। ভিন দেশের মানুষ এলে এলথামবাসীরা গর্ব করে বলে—এলথাম হচ্ছে আর্টিস্টের বাসভূমি। তবে গুণীজনের পদরেণুপূত স্থানমাহাত্ম্যের জোরে অকবি অশিল্পীর ভিড় ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। এলথাম যেন আর এলথাম থাকছে না।

গল্পকাররা এলথামে বাস করে গল্প লিখছেন, আর গল্পের প্লটে যত সব নতুন চিন্তা আমদানি করছেন। একালের যুগযন্ত্রণা, তার ক্রুরতা এবং মূঢ়তার শব-ব্যবচ্ছেদের বদলে তাঁরা পাত্রপাত্রী নির্বাচনের জন্য কলোনী যুগ বেছে নিয়েছেন। সেই দুঃস্বপ্নের দিন থেকে মুক্তির সংগ্রাম, বুশ-রেঞ্জারের দুঃসাহসিক কীর্তি আজ তাঁদের ছোট গল্পের পটভূমি। এই সব লেখক নাকি কেতাব লিখে ভালই কামান। অর্থাৎ এঁরা আমাদের মত নন। পুঁথি লিখে প্রয়োজন মত পয়সা পাইনা বলে আমরা চাকুরিও করি, পুঁথিও লিখি—দাসত্ব আর সাহিত্য পাশাপাশি চলে। এলথামবাসী লেখকদের গল্প নাকি পাঠকরা মন দিয়েই পড়েন, প্রকাশকরা ফাঁকি দেন না—আর লেখকরাও আমাদের মত নন, যে অখ্যাত অবস্থায় নিরুপায় নিষ্ফল গর্জন করেন এবং বিখ্যাত হলেই পুস্তক-প্রকাশনী ব্যবসা খুলে বসেন।

সেদিন মনোহরণ পুন্নুস্বামীর বাড়িতে ছিল ডিনার পার্টি। এলথামের দিক প্রান্তে অনুচ্চ এক শৈলশিখরে তাঁর মনোরম ভিলা। রেল স্টেশন থেকে এই দিকে উঠে আসার জন্য শহরের রাস্তাগুলিকে কংক্রিটে গাঁথা হয় নি। ফলে বন্য পরিবেশের গ্রাম্য সুরটিও হারিয়ে যায় নি। অথচ আমাদের গ্রাম্য রাস্তার মতও নয় অস্ট্রেলিয়ার এই বনপথগুলি—চৈতী হাওয়ায় ধূলি ওড়ায় না, বর্ষার দিনে গো-শকটের চক্র-লাঞ্ছিত খদে জলকাদার নরক সৃষ্টি করে না। তখন বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে। আকাশে অল্প মেঘ আছে। একটু করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ইউক্যালিপটাসের অরণ্যের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মনে হল, একটি যেন শ্রাবণ মাসের বাদলা দিনের সন্ধ্যা বেলা। এমন ধূসর ম্লান সন্ধ্যায় বাঙালী মন উদাস না হয়ে যায় না। চারদিকে শুধু গাছ, গাছ, আর গাছ। গাম গাছ। সেই বহুশ্রুত বহুদৃষ্ট ইউক্যালিপটাস। হিসেব মিলিয়ে দেখতে লাগলাম, এলথামের সঙ্গে বাঙলার শ্যামল গ্রামের মিলটি কোথায়। বার বার মনে

হল, যদি এখানে একটি কদম কৃষ্ণচূড়ার সারি থাকত। তেঁতুল হিজল জারুল গাছের বৃষ্টি ধোওয়া মাথাগুলি এখানেও যদি একটু করে দুলত!

পুন্নুস্বামীর ভিলায় পৌঁছাতে সন্ধ্যা বয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমে দুহাতি খালের উপর সরু সাঁকো বেয়ে সামান্য একটু এগিয়ে কোণের দিকে বাংলো ঘরে উঠলাম। ঘর ত নয়, মনে হল একেবারে মূর্তিমান একটি আশ্রয়। সামনে পেছনে উপরে উঠোনে অনেক গাছ। রকম রকম সব গাম গাছ। অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু ভুলেও বলে না ইউক্যালিপটাস। কারণ সেটা অস্ট্রেলীয় রীতি নয়। অস্ট্রেলিয়ান হলেই তাকে গাম গাছ বলতে হবে, আর গাম গাছ থাকলেই অস্ট্রেলিয়া হতে হবে। তিনশতাধিক রকমের ইউক্যালিপটাস আছে অস্ট্রেলিয়াতে, যার পরিচয় নানা সংস্করণের গাম গাছ বলে। এই গাছটি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মাটির সম্পদ, তার ক্যাঙারু কোকোবারো বেল-পাখীর মত। গাম গাছ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ানরা কবিত্ব করে না। তবে গাম-অরণ্যে বাস করেও ঘন পাতার ভাঙা ডাল পত্রদানীতে সাজিয়ে রাখে, পাতা মুড়িয়ে তার উগ্র-ধূপশলার গন্ধ একটু করে শোঁকে। দাবানলের দিনে যখন বাড়িঘর জলে, মানুষ মরে, তখনও গাম গাছকে তারা অভিশাপ দেয় না। গাম পাতা প্রচুর তৈল সমৃদ্ধ বলে গাছে গাছে ঘর্ষণে যে আগুন লাগে, সে রহস্য তারা ভাল করেই জানে, আর জেনেও চুপটি করে থাকে—কারণ অন্য কি গতিই বা আছে।

আমি কিন্তু কেবলই ভাবছিলাম, থাক না গাম গাছ—শুধু যদি একটি করে আম কাঁটাল কলা লিচু এবং বাতাপী লেবুর গাছও থাকত; সিঁড়ির দুপাশে দুটি জড়াজড়ি করা নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো হাসত কটি জোনাকি পোকা ছুটাছুটি করত। হায় রে আমার কল্পনা! তা হলে কি আর এলথাম অস্ট্রেলিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী মেলবোর্নের উপনগর হত? বাঙলা দেশের বাদলদিনের ব্যাঙ-ডাকা সন্ধ্যায় যখন ঝিঙে ফুল ফোটে, শালিখ পাখী পাখনা থেকে জল ঝাড়ে, রজনীগন্ধার ঘনগন্ধ ভিজে হাওয়াকে উতলা করে, পাশের খাল থেকে বৃষ্টির জল তখন তোড়ে গড়িয়ে যায় নিচের দিকে। পুন্নুস্বামীর ভিলার সামনে গাছও আছে, বৃষ্টিজলের ক্ষীণ প্রবাহও দেখলাম। কিন্তু তার দাক্ষিণ্য নেই। কারণ দেশটা অস্ট্রেলিয়া। এখানে আকাশের দেবতা বড় করুণ—কাঙালের মত চেয়ে থাকে, কৃপণের মত বর্ষণ করে। শুকনো মাটি তৃষিতের মত শোষণ করে।

মনোহরণ পুন্নুস্বামী মালয়ের লোক। কর্মসূত্রে অষ্ট্রেলিয়াতে আজ তাঁর পাঁচ বছরের বাস। পিতামহ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। যখন তিনি মালয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর বাবারও জন্ম হয় নি। তবু কিন্তু এল-থামের উপনগরে মনোহরণের পরিচয় ভারতীয় বলে। ভারতবর্ষ দেশটি লোকের মনে এতটা জায়গা জুড়ে আছে, যদি কেহ পাশের দেশের লোকও হয়, তার ভালমন্দ সব কিছুতেই সবাই জড়িত করে ভারতের নাম।

মনোহরণের শ্যালিকা রোজিকে জিজ্ঞেস করলাম—মনোহরকে কেমন লাগে? রোজী বলল—সার্থকনামা পুরুষ বটে। রূপে গুণে সত্যি মন হরণ করে। বড় বড় ভুরুর নিচে দুটি কাজল কালো চোখ, নিবিড় পল্লবছায়ায় করুণ। শ্যামলা গায়ের রঙ। এমন সুন্দর পুরুষ আমার জীবনে আর কোথাও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

রোজীরা যেদিন আবিষ্কার করেছে যে মনোহরণ নামের একটি অর্থ আছে, সেইদিন থেকে ভারতীয় মানুষের সঙ্গে আলাপ হলে তার নামের অর্থটিও জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। মনোহরণের মেয়ে কমলা ও কৃষ্ণা ওদের বড় প্রিয় নাম। আজ অষ্ট্রেলিয়ার অনেকের কাছে আর একটি প্রিয় নাম হচ্ছে ইন্দিরা। ভারত নারী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা।

রোজীর ছোট বোন ক্যাথি বলল—আমাদের ত নাম আছে। কিন্তু সে নামের কোন অর্থ নেই। পিটার ক্যাথারিণ এক একটি শব্দ মাত্র। আমি বললাম —এই শব্দগুলিই ত বিশেষ কানে বিশেষ অর্থ বহন করে, যেমন জন শব্দটি তোমার কানে। জনের দেওয়া হীরের আংটির উপর ক্যাথি সস্নেহে আঙুল বুলিয়ে নিল। ওদের এনগেজমেন্টের আংটি! বিয়ে হবে একবছর পরে হোবার্টে, হানিমুন হাওয়াই দ্বীপে।

কথায় কথায় ক্যাথি বলল—সামনের এপ্রিলে ইউরোপে যাচ্ছি। মা যাবেন জুনে! অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ার বিত্তশালী লোকদের বিশ্বভ্রমণে বের হওয়া আজ আর নতুন কিছু নয়। জোয়ানরা অনেকে যায় এডভ্যাঞ্চারের লোভে, বুড়োরা সময় কাটাতে, নববিবাহিতেরা হানিমুনে। অনেক মা বাবা আজকাল আবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সন্তানকে পাঠান বিদেশে। হয়ত একুশ বছর বয়সের আগে ছেলে বা মেয়েটি সাথী হিসেবে বেছে নিয়েছে এমন কাউকে যে পাত্র বা পাত্রীরূপে মোটে লোভনীয় নয়। এমন বিবাহের একটি শোচনীয় পরিণামের চিত্র খাড়া করেও যখন সন্তানকে তারা বাগ মানাতে অক্ষম হন,

তখন একখানা টিকিট কেটে দিয়ে বলেন—যাও ত বাছাধন, একবার নিজের চোখে দেখে বুঝে এসো বাস্তব জীবনটা দুনিয়াতে কি বস্তু। ক্যাথির একাকিনী ইউরোপ যাত্রার এমন কোন কারণ আছে কিনা না জেনে জিজ্ঞেস করলাম—মা আর মেয়ের একসঙ্গে না যাওয়ার বিশেষ কোন অর্থ আছে কি? ক্যাথি বলল—নিশ্চয়। মা ত ফি বছরই ইউরোপে যান। আমি যাচ্ছি এই প্রথম। মায়ের চোখ দিয়ে না দেখে, তাঁর খবরদারিতে না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই ঠিক নয় কি? আমি বললাম—একশ বার।

সেদিন রোজীদের কথা শুনে মনে হল, বড় বোন ক্লেয়ার প্রেম করে মনোহরণকে বিয়ে করেছে, আর সকলে মিলে তাকে ভালবেসেছে। অথচ ওদেশী জামাইবাবুদের কাছে শ্যালিকা শব্দটি মধুময় নয়, তারা তেমন প্রিয়-পাত্রীও নয়—দেবরের কাছেও নয় বৌদির বোনেরা। কারণ দিদির যখন বিয়ে হয় বোনেরাও তখন বসে নেই। আপন আপন সাথী তারা জুটিয়ে নেয়, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোর্টশিপ করে, এমনকি হয়ত একাধিকবারও হাত বদলিয়ে। তাই শ্যালিকার সময় নেই জামাইবাবুর মন হরণ করবার, দেবরেরও আগ্রহ নেই নিজের গার্ল-ফ্রেণ্ড ছেড়ে বৌদির বোনের দিকে নজর দেবার। হাজার রকম না, না আর নিষেধের দেশে পরের বোনের সঙ্গে মিশবার তেমন সুযোগ নেই বলেই বোধ হয় আমরা বৌদির বোনের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধাটুকুর সদ্ব্যবহার করতে চাই।

এলথামের ক্লেয়ার একজন ভারতীয়কে বিয়ে করে যেন একটি কাজের মত কাজ করেছে। সে যেন আর পাঁচজন প্রতিবেশীর মত শুধু অষ্ট্রেলিয়ান নয়—একজন বিশেষ ধরনের মেয়ে, এক বিশেষ স্নেহের পাত্রী। আশপাশের ঘরে ঘরে শাদা লোকের সমাজে হয়ত উল্টোটা হওয়াও বিচিত্র ছিল না। ক্লেয়ারকে দেখতে দেখতে দেশের দিকে ফিরে তাকিয়ে মনে হল, বাঙলা দেশের ছেলে জার্মান মেয়ে বিয়ে করে বর্ধমানের বাড়িতে উঠলে আজও হয়ত তাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি যে অন্যরকম—আমাদের হচ্ছে ধর্মের প্রশ্ন, জাতের প্রশ্ন। যেখানে বামুনে-কায়েতে বিয়ে হয়না, সেখানে হিন্দু-খেরস্তানে, তাও আবার বর্ধমানে।

পশ্চিমের দেশে দেশে বিয়ের বাজারে এখন অনেক নতুন আইডিয়াও এসেছে। ষোল থেকে বাইশ বছরের একশ্রেণীর মেয়ে আজ বিশেষ রকম পছন্দ করে বেশী বয়সের বর। জানিনা অবিবাহের দীর্ঘ অবকাশে বয়ের

সম্ভাব্য বিপুল সঞ্চয়ই কনের এমন আকর্ষণের কারণ কিনা। কোন কোন মেয়ে নাকি এখন বার বার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারীত্বের শক্তিটাকে পরখ করে দেখছে। বার চারেক ডাইভোর্সের পরও যার অক্লেশে বর জোটে, সে ত আর যে-সে মেয়ে নয়। ডাইভোর্সই যেন বাড়তি একটি গুণ, তার অপরাজেয় নারীগৌরবের জয়তিলক! এ ছাড়া আরও নতুন টেকনিক চলছে। কোন কোন মার্কিন শ্বেতাঙ্গিনীর নাকি আজ নিগ্রো স্বামী গ্রহণের বেজায় ঝোঁক। এ কিন্তু করুণা নয়, কৃষ্ণপ্রেমের সাময়িক উচ্ছ্বাসও নয়—শুধুই নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের বৈবাহিক কৌশল, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাকে বলে সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। নিগ্রো স্বামীর নিকষ কালো হাত ধরে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে শ্বেত-সুন্দরী বুক ফাটা গর্বে মনে মনে বলে—ইস আমি কত সুন্দরী, এই কৃষ্ণকায় পুরুষটির তুলনায় কতই না উঁচু স্তরের জীব! আশ্চর্য, কালোবরণ রাজার গলায় মাল্য দানের যুক্তি, সখীর ওকালতি রঘুবংশের ইন্দুমতী স্বয়ম্বর সভায় একটিবারও কানে তোলে নি, স্বামীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের সুযোগ গ্রহণ করে নি।

সেদিন মনোহরণের খাতিরে এলথামে আমাদেরও সে কি খাতির! পার্টিভোজেও খুব খেলাম। ভাত মাংসের ঝোল, অষ্ট্রেলিয় মটর শুঁটির গোটা গোটা ডাল। বাঙলাদেশ ছাড়া এমন মটর ডাল রান্না করা কি করে সম্ভব ভেবে পেলাম না। এলথামের অতিথিরা দুবার করে ভাত নিয়ে শুধু পেট ভরে খেলেই না, মনে হল খেয়ে যেন সবাই ধন্য হয়েছে।

পার্টি চলছে। কারও পোশাকে টাই কোটের ডাট নেই, ফরম্যালিটির বালাই নেই। কারণ দেশটা অষ্ট্রেলিয়া। ক্লেয়ারের পোশাক-সজ্জায় অবশ্য একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—পরণে না-স্কার্ট না-শাড়ি, এক-লিসে-সেলাই-করা ফরাসী শিফনের ঘাগরা। গায়ে বুটিদার ফুল-হাতা ব্লাউজ। রেকর্ড প্লেয়ারে টুইস্ট নাচের বাজনা বাজছে। এই পোশাক পরেই ক্লেয়ার দিব্যি তার তালে তালে নাচছে, খিলখিলিয়ে হাসছে, হাতে তুড়ি বাজাচ্ছে, আবার ফাঁকে ফাঁকে সবার গেলাস ভরে দিচ্ছে। রোজী তার বড় বোন ক্লেয়ারের মতই নাচিয়ে, ক্লেয়ারের মতই হাসিয়ে মেয়ে। সে আবার শুধু নিজে নাচে না, স্বামী পিটারকেও নাচায়। পিটার মালটার গ্রামে জন্মেছে, ইটালীর কলেজে পড়েছে, মেলবোর্ণের আপিসে চাকুরি পেয়েছে, আর এলথামে বিয়ে করেছে। এখন সে ষোল আনা

অষ্ট্রেলিয়ান। অষ্ট্রেলিয়ানের মতই পিটার বীয়ার খায়, ভারতীয়ের মত থালাভরা ভাত খায়, আর রোজীর কথা উঠলেই বলে—ওকে একবার কারি-ভাতের নেমতন্ন করেই দেখ না, বারোটায় ভোজ হলে সকাল আটটায় গিয়ে তোমার বাড়িতে বসে থাকবে। কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে পিটারকে চিমটি কেটে রোজী বলে—হেই, কি মিথ্যুক!

মনোহরণের পার্টিতে মেয়ে ছিল অনেক। বীয়ার ব্র্যাণ্ডি হুইস্কিও ছিল প্রচুর। পার্টি করতে হলে অঢেল বীয়ারের মতই প্রতি পুরুষের মাথা গুণতি মেয়ে চাই। অষ্ট্রেলীয় বন্ধুদের বললাম—এদেশে ইংরেজী 'জি' অক্ষরটির প্রাধান্য যেন একটু বেশী। অনেকে উৎসুক হয়ে বলল—একটু ব্যাখ্যা কর। আমি বললাম—তোমাদের দেশটা আসলে কান্ট্রি অব গাম টীজ, গ্রগ্‌স এণ্ড গার্লস। মেয়েরা হাসল, রোজী তাদের দিল উস্কানি। পুরুষেরা বীয়ারে চুমুক দিয়ে ঘূর্ণী-নাচের জন্য যার যার সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করল।

সবার হাতেই গেলাস ছিল। অষ্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু গেলাস না বলে বড় সাইজের বীয়ার পাত্রকে কায়দা করে বলে স্কুনার, মাঝারি সাইজকে মিডি। বিশেষ করে সিডনি অঞ্চলের মানুষ। সবাই কথা বলছে, বীয়ার খাচ্ছে। ভাত খাচ্ছে, জলের বদলে চলছে বীয়ার। শুধু নাচতে যাওয়ার আগে গেলাসটি নামিয়ে রাখছে। বারে গেলে বীয়ার খেতে খেতে নাচতে হয় না। ধীরে সুস্থে বসে বসেও কিন্তু দিব্যি খাওয়া চলে। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বারে গিয়ে বড় কেউ বসে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিডি আর স্কুনার থেকে বীয়ার খায়, সিগ্রেট টানে, সাগরেদদের সঙ্গে আলোচনা করে যত সব তুচ্ছ কথা। প্রথম রাউণ্ডের পয়সা হয়ত চুকিয়ে দিল পল। দ্বিতীয় রাউণ্ডে জর্জ যখন শাউট করবে, পল যদি সে বীয়ার না খেয়ে উঠে যায় তা হলে পলের মত অভদ্র অষ্ট্রেলিয়াতে আর কেউ নেই। ইয়ার নিয়ে বীয়ার খাওয়ার এমনি রীতি অষ্ট্রেলিয়ায়। রাউণ্ডে রাউণ্ডে বীয়ার অর্ডার দেওয়ারও কায়দা আছে—অষ্ট্রেলীয় বারের পরিভাষায় তাকে বলে 'শাউট' করা। জর্জ পলের বীয়ার খেয়েছে ত জর্জকেও সুযোগ দিতে হবে 'শাউট' করতে।

এ বাঙলা দেশ নয়, যে বীয়ার না খেলে বিড়ি না টানলে মেয়ে-বন্ধু না থাকলে নিজের মনেও একটু অহঙ্কার থাকবে আর অন্য পাঁচ জনেও

বলবে—বড় ভাল ছেলে। অষ্ট্রেলিয়ানরা বলে, এই তিনের টান থাকলেও ভাল ছেলে হওয়া যায়। পার্টিতে গিয়ে বীয়ারই যদি না খেলে, তা যত ভাল বক্তৃতাই কর, যত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাই বল, ওরা বড় জোর বলবে—লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, তবে একেবারেই মিশুক নয়; অষ্ট্রেলিয়ার অন্তরে প্রবেশ করবার যোগ্যতা অর্জন করে নি। এরই নাম অষ্ট্রেলিয়া—বীয়ার ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া কল্পনা করা যায় না, যেমন কল্পনা করা যায় না গাম গাছ বিকিনী আর ক্যাঙারু ছাড়া।

সেদিন পার্টিতে নামী অনামী অনেক লোকের মধ্যে একজন ছিলেন ইস্কুল মাস্টার। বিদ্বান লোক। দেখতে অনেকটা পণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্দার পানিক্করের মত। অবশ্য পানিক্করের কথায় লোকে বলত লেনিনের মত। আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে মাস্টারমশাই কিন্তু একেবারে নীল ইউফ্রেটিস থেকে মহেঞ্জোদরো হরপ্পা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করলেন। অষ্ট্রেলিয়ার স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে মিশর সভ্যতার বর্ণনা আছে, বোরো-বোদুরের কথা আছে, চীনের প্রাচীন গৌরবের প্রসঙ্গও বাদ নেই। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে আছে শুধু গঙ্গার ঘোলা জলে পুণ্যসঞ্চয়ীদের স্নান করার কথা ও তার কলুষ কঠিন চিত্র, যা ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়। এ বিষয়ে সবিনয়ে শিক্ষক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। একটু অপ্রস্তুত হয়ে এক ঢোক বীয়ার গিলে তিনি বললেন—আমরা শুধু পড়াই, পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দেশ ত ক্যানবেরার। অবশ্য ভদ্রলোকের কিছুমাত্র দোষ নেই। শুধু অষ্ট্রেলিয়া নয়, ইউরোপেও একই কথা; ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়-গুলিকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার কথা। এক কালের ভারত ভাগ্যবিধাতারা গঙ্গার ঘাটের ঘোলাটে কথাই দুনিয়াময় প্রচার করেছে যে!

আর শুধু এদের কথাই বা বলি কেন। খাস ভারতবর্ষের কোন কোন বিদ্যালয়ে সিনিয়র কেমৃব্রিজের পাঠ্য হিসেবে এমন ইতিহাস বই নাকি এখনও পড়ানো হয়, যা রচিত হয়েছিল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এবং একজন ইংরেজ তার গ্রন্থকার। সে ইতিহাসের নতুন সংস্করণেও বর্ণিত আছে শাসক ইংরেজের মনোভাব, মহৎ উদ্দেশ্যে ভারতবিজয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা ইংরেজ শাসনের জয়গান। সিনিয়র কেমৃব্রিজের ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে আজও সে ইতিহাস পড়ে আর যদুনাথ সরকার রমেশ মজুমদারের

ছাত্রদের বলে ফ্যানাটিক। পরম আশ্বাসের কথা, অষ্ট্রেলিয়ার সরল সোজা মানুষরা আমাদের এ সব কথা তত জানে না।

এলথামের শিক্ষক মহোদয় যত সব গুরুগম্ভীর আলোচনা করছিলেন, আর তাঁর তরুণী বৌটি একের পর আর একটি তরুণের সঙ্গে বেদম টুইস্ট নাচ নেচে হয়রাণ হয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক উঠে বৌকে চট করে এক গেলাস ঠাণ্ডা বীয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও ত লাভ।

পার্টি যখন শেষ হল, ক্যালেণ্ডারে তখন তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে। সবার এবার উঠতে হবে। মেলবোর্ণে ফেরার জন্য একটিমাত্র গাড়ি। অথচ মেয়ে পুরুষে মিলে আমরা জন দশেক যাত্রী। পুরুষদের উরুদেশে মেয়েরা বসল অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করে, একেবারে অসঙ্কোচ উল্লাসে—যেন এ তাদের জন্মগত অধিকার। পিটারের মোটরে এমন মধ্য রাতের যাত্রায় আরও দুইজনের স্থান হওয়া সম্ভব ছিল কিনা জানি না। তবে মিসেস টম্পসনের কন্যা হ্যাজেল এবং তাঁর বয়-ফ্রেণ্ড সে-রাত কাটাবার জন্য হোটেলের দিকে রওনা হল। কুমারী কন্যা বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ভাড়া করা হোটেল কক্ষে রাত কাটালে তা নিয়ে নিজের মায়ের মাথা কাটা যায় না, অন্যের বাপের ঘুম কামাই হয় না, সমাজেও ঢি ঢি পড়ে না। কারণ দেশটি অস্ট্রেলিয়া, কালটি বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের কাছাকাছি। আর ঘটনাটি ? —নিত্য নৈমিত্তিক !

—আট—

নভেম্বর মাস। মেলবোর্ণ বন্দর থেকে একটি ভারতীয় মালবাহী জাহাজ ছাড়ছে। মালটানা শ্রমিক, টেলিভিশনের লোক, সাংবাদিকের দল, ফার্মের কৃষক, শহরের দর্শক—এমনি সব বিচিত্র মানুষ মিলে ভিক্টোরিয়া ডক থেকে জাহাজের ডেক পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছি। অথচ তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। খাঁচায় ঢুকিয়ে ক্রেনে উঠিয়ে শুধু এক নতুন রকমের মাল জাহাজে তোলা হচ্ছিল। চৌদ্দটি ষাঁড়, ষোলটি গরু।

মেলবোর্ণের দূর উপকণ্ঠে 'ফর দোজ হু হ্যাভ লেস' নামে একটি জনকল্যাণ সমিতি আছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেণ্ট-সদস্য মিঃ লেন রীড তার সভাপতি। অনগ্রসর ভারতবর্ষকে কোন্ উপায়ে সর্বাপেক্ষা বেশী রকমে সাহায্য করা

যায় তাই নির্দ্ধারন করতে তিনি নিজের খরচে বার তিনেক ভারতে গিয়েছিলেন। পুষ্টিহীন শিশুদের দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে দুধের বড় প্রয়োজন। এককসের আধসের দুধ দেওয়া গরু থেকে সেই ব্যাপক প্রয়োজন যে মিটতে পারে না সেই সোজা কথাটিকে তিনি নির্ভুল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য স্থির করেছিলেন। মিঃ রীড দেশে ফিরলেন। অবিলম্বে তিনি ডেয়ারী মালিকদের কাছে আবেদন করলেন ভারতের হাড় জিরজিরে শিশুদের মুখ চেয়ে একটি করে গরু দান করতে। প্রচুর সাড়া মিলল। দুই শতাধিক গরু এবং ষাঁড় সংগৃহীত হল। তারই তিরিশটি প্রাণী সেদিন মেলবোর্ণের জাহাজ ঘাটে এত লোক সমাগম ঘটিয়েছিল।

যে সব মানবদরদী মানুষ গোদান করেছিলেন জাহাজ ছাড়ার মুহূর্তে তাঁরা সবাই উপস্থিত থেকে প্রাণীগুলিকে বিদায় দিয়েছিলেন। মিঃ রীডের কল্যাণে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। মিঃ গ্যালভিন নামে এক ভদ্রলোক তাজা তরুণ একটি ষাঁড়কে দেখিয়ে বললেন—এইটিকে আমি দিয়েছি। তারপর এলবাম থেকে বের করে ষাঁড়টির ছোট বেলাকার ছবি, এবং তার মা বাবা ঠাকুর্দার ছবি দেখিয়ে মিঃ গ্যালভিন বললেন—বড় দুধাল বংশের বাচ্চা এটি। আশা করি এর দ্বারা তোমাদের সত্যি কল্যাণ হবে। তখনই বাছুরটির নাম দিলাম শম্ভু। কল্যাণময় শিবের নাম শম্ভু—এই কথা শুনে মিঃ গ্যালভিন হাসলেন, শম্ভু ঘাড় নাড়া দিল। একজন উৎসাহী সাংবাদিক এমন অনেক কথা টুকে নিয়ে আমাদের গরু ও তার নামকরণের উপর রবিবাসরীয় পত্রিকায় একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখলেন। তখনও অস্ট্রেলিয়ার কাগজ, রেডিও, টেলিভিসনে ভারতের 'সেক্রেড-কাউ' নিয়ে টিটকারি শুরু হয় নি, কলকাতার সড়কে নিঃশঙ্ক গো-চলনের কথাও অস্ট্রেলিয়ানদের তেমন করে মালুম হয় নি, যেমনটি হয়েছিল ১৯৬৬ সালের দিল্লীতে গো-হত্যা বন্ধের জন্য সাধু বাবাদের আন্দোলনের খবর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল।

আলাপ হল মিঃ সরিগামের সঙ্গে। তিনি একা দান করেছিলেন তিনটি গরু একটি ষাঁড়। গো-দাতাদের মধ্যে সকলের শীর্ষে ছিল তাঁরই নাম। অথচ আত্মপ্রচারের লোভে রিপোর্টারদের কাছে কাছে তাঁকে কখনও ঘুরতে দেখছি বলে মনে পড়ে না। আমার ডেয়ারী ফার্ম দেখার সর্বপ্রথম সুযোগ হল মিঃ সরিগামের আমন্ত্রণে।

সেদিন মেলবোর্ণের ডকে যে প্রাণীগুলি জাহাজে উঠল, তা হচ্ছে ফ্রেসিয়ান জাতীয় গরু; আকারে অন্য গরুর চাইতে অনেক বড়। কৃষ্ণবর্ণ। পাগুলি সাদা। কপালে সাদা রঙের প্রশস্ত তিলক। এক একটি ফ্রেসিয়ান গরু অন্য জাতীয় গরুর চাইতে দুধ দেয় অনেক বেশী—প্রায় পঁচিশ সের থেকে একমণ পর্যন্ত। এদের বাজার দামও অনেক। দুই থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে।

সেদিন এমন একজন ফার্মারের সঙ্গে আলাপ হল, যিনি গোদান না করে জাহাজে গরুগুলির খোরাকীর জন্য দিয়েছিলেন এক হাজার বেল ঘাস, যার তখনকার বাজার দাম পাঁচ হাজার টাকা। ডাক্তারী পরীক্ষার খরচ (সাগর পারে যেতে হলে গরুকেও টীকা নিতে হয়) শুকনো খড়, গম-ভাঙা ভূষি, জল খাওয়াবার বালতি এবং গরুগুলিকে জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছাবার খরচ যোগালেন অন্য অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। জাহাজে গোয়ালঘর নির্মাণের খরচ পড়েছিল হাজার আটেক টাকা। জাহাজ ভাড়া বহন করে-ছিলেন ভারত সরকার। সমস্ত রকম হিসেব মিলিয়ে দেখা গেছে, হরিণ-ঘাটা পর্যন্ত পৌঁছবার পর এক একটি গরুর মূল্যমান দাঁড়িয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা। এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল একটি মানুষের পরিকল্পনা, সেই মিঃ লেপ রীডের মানব কল্যাণ চেষ্টা। নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁকেই যোগাযোগ করতে হয়েছে। তাঁকেই গরু থেকে ঘাস পর্যন্ত সমস্ত কিছু এক জায়গায় এনে জড় করতে হয়েছে, ভারত সাগর পারের বন্দোবস্ত করতে শুনেছিলাম, জাহাজ ছাড়ার দিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ মিঃ রীডের ঘোরাফেরার অন্ত ছিল না, সারাটা দিনে পেটে তাঁর দানাপানিও পড়ে নি। পরের কল্যাণে যাঁরা নিয়োজিত, কত কিছুই না তাঁদের সহ্য করতে হয়। খাওয়ার কথা ভুলে, বিশ্রামের কথা মনে না রেখে শুধু তাঁরা পরের চিন্তায় তন্ময়। তবু যদি মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণ সাধিত হত, অকল্যাণের শনি গ্রহগুলি পথে পথে যদি কাঁটা না ছড়াত।

আরকেডিয়া হচ্ছে ভিক্টোরিয়া রাজ্যের একটি মাঠময় স্থান। অধিবাসী বলতে শুধু কয়েক ঘর কৃষক অর্থাৎ গোচারণ ভূমি এবং গো-ধনে ধনী লাখো-পতি ডেয়ারী মালিক। মেলবোর্ন থেকে আরকেডিয়ার সরিগাম-গৃহে চলেছিলাম মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে। সঙ্গে উদয়ন গোখলে নামে এক মারাঠী যুবক। গাড়ি চালনার ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছিল সরিগাম-পুত্র

ক্র্যাঙ্ক। ক্র্যাঙ্কের নবীন বয়স। সবে ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছে। দানের গরুগুলিকে জাহাজে গোপালকের ভূমিকায় দেখাশুনা করবে কে? ক্র্যাঙ্কই এগিয়ে এসেছিল। সেই সূত্রেই তার ভারত দর্শন। হরিণঘাটা দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ এবং ব্যাঙ্গালোর ঘুরে ভারতের গো-জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেশে ফিরলে অষ্ট্রেলিয়ার রেডিও টেলিভিশন থেকে ওর কাছে আহ্বান এসেছিল ভারতের কথা বলতে। আর কেডিয়ার দিকে তীর বেগে মোটর চালিয়ে ক্র্যাঙ্ক ধীরে ধীরে কলকাতা দিল্লীর অনেক কথাই বলল যা আমাদের কাছে রীতিমত খবর, অথচ কলকাতা দিল্লীওয়ালাদের কাছে তা বলার জন্য নাকি মুখ খুলতে পারে নি। অপ্রিয় ভাষণ সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ অষ্ট্রেলিয়ার ক্র্যাঙ্কদেরও জানা আছে।

আরকেডিয়ার বাড়িতে গাড়ি থেকে নামতেই পোষা কুকুর জিমি আর মিনি আনন্দের আতিশয্যে পঙ্কিল পদে গা বেয়ে উঠে অকৃত্রিম অভ্যর্থনা জানালো। মিঃ ও মিসেস সরিগাম করমর্দন করে বললেন—আমরা ত তোমাদের দেরী দেখে দেখে ভাবছিলাম ডিনারটি বুঝি নষ্টই হল। যাহোক, হট প্রেসে রেখে দিয়েছি, সোজা খাওয়ার টেবিলে চল। যেন কতদিনের পরিচয়।

আরকেডিয়ার গ্রামে ডেয়ারী ফার্মের মাঝখানে সরিগামদের বাংলো। চারদিকে তার দিগন্তময় মাঠ। শুধু বাড়ির কাছে ডান দিকের জমিতে এপ্রিকট ফলের বড় একটি বাগিচা। নিষ্পত্র গাছগুলি শীতের মধ্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের মাঠের শেষে ইউক্যালিপটাস অরণ্যের ফাঁক দিয়ে গোলবার্ন নদী বয়ে চলেছে। বসত বাড়িটিকে কেন্দ্র করে চারশত একর গোচারণ ভূমি। এক একটি চার পাঁচ একরের টুকরায় সমস্তটা জমি ভাগ করা এবং কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দেওয়া। প্রতি টুকরা জমিতে দশ থেকে পচিশটি পর্যন্ত গরু চরে, কচি কচি ঘাস খায় আর মাখন বহুল মিষ্টি দুধ দেয়। জুন মাসের শীতের সকালে মিসেসকে না জাগিয়ে মিঃ সরিগাম নিজ হাতে চা করে খেলেন তারপর গাম বুট, ওভার-অল পরে গরু-দোহনের কাজে গেলেন। সঙ্গে জিমি আর মিনি। তখনও ভোরের আলো ফোটে নি। অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েরা আমাদের অতি পরিচিত ভঙ্গীতে মাটিতে বসে হাঁটুতে দোনা ঠেকিয়ে তৈল প্রলিপ্ত আঙুলে গরুর বাঁট থেকে দুধ দোহন করে না। সুতরাং তারা দুহিতা হবার যোগ্য নয়। ওদিকে শুধু চা করার

প্রয়োজনে পুরুষের আগে উঠে সারাদিনের মত এলোপাথারি কাজ শুরু করে না।

বসত বাড়ি থেকে দুইশ গজ দূরে দুধ দোহনের কারখানা। তার প্রথম কক্ষে মিটার বসানো দুধাল রঙের ট্যাঙ্ক। দোহন কক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত পাইপে দুধ এসে এইখানে জমা হয়। কক্ষের মাঝখানে আবার অতি সরু পথ। দুদিকে তার বারো-বাই-পাঁচ ফুটের উঁচু দুটি চত্বর। একেক দিকে আটটি গরুর কোণাকুণি দাঁড়াবার জায়গা। লোহার রেলে পৃথক করা। এর নাম হেরিং-বোন-শেড। এখানে গরুগুলিকে পাশাপাশি দাঁড়াতে না দিয়ে কোনাকুণি আগে-পিছে একটার সমান্তরালে আর একটা গরুকে দাঁড় করান হয়। অতি অপরিসর জায়গা বলে তাদের আর নড়ন চড়নের উপায় নেই। সুতরাং এক সঙ্গে ষোলটি গরু দোহনের সময় কোনই বেসামাল অবস্থা সৃষ্টি হয় না!

কলের ব্যবস্থায় দুধ-দোহন-করা এইসব ফার্মে দোহনের সময় কিন্তু বাছুর কাছে থাকে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের কোল থেকে সরিয়ে পৃথক পৃথক মাঠে তাদের রেখে দেওয়া হয়। বেড়া-দেওয়া সব ছোট ছোট মাঠ। এক মাঠে মাত্র একটি করে বাছুর। বাছুরগুলি আপন আপন মাঠে ঘুরে ঘুরে ঘাস খায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়ত হাম্বা হাম্বা ডাকে। পাঁচশত গরুর মধ্যে বিয়ানো গরু ছিল তখন আশীটি। আর ছিল নানা বয়সের শতাধিক বাছুর। বাকীগুলি ষাঁড়। ষাঁড়গুলির চরে বেড়াবার স্থান একটু দূরের মাঠে। পাশে পাশেই তার বকনা গরুর মাঠ। সেই সব মাঠে আমার তখনও যাওয়া ঘটে নি। গোখলেকে জিজ্ঞেস করলাম—ষাঁড়গুলিকে কেমন দেখলে? রসিক যুবক ফ্র্যাঙ্কের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হেসে বলল—ও ইয়েস, দে আর হ্যাভিং গুড টাইম!

দুধ দোহন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বাছুরগুলিকে খাওয়াবার পালা। ড্রাম ভরা গুঁড়ো দুধ গরম জলে গুলে সম পরিমাণ টাটকা দুধের সঙ্গে মেশানো হল। তারপর এক একটি বালতির মধ্যে তিন চার সের পরিমাণ দুধ ঢেলে দুই হাতে দুই বালতি নিয়ে মিঃ সরিগাম বললেন—চল, মজা দেখবে।

তখন চার দিকে হাম্বা হাম্বা রব উঠেছে। বাছুরের মাঠে গিয়ে কাঠের বেড়ার ফাঁকে একটি বালতি ধরতেই বাছুরটি বেসামাল হয়ে ছুটে এসে

গোগ্রাসে গিলতে লাগল। অর্দ্ধেকটা শেষ হতে বালতি সরিয়ে এনে বাকী অর্ধেক দেওয়া হল পাশের মাঠের বাছুরটাকে। মায়ের বাঁটে মুখ দিয়ে পরমানন্দে লেজ নেড়ে মাথা গুঁতিয়ে দুধ খাওয়ার সৌভাগ্য এদের নেই। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিটা ত আছে। তাই বালতি থেকে সাগর-শোষা চুমুকে দুধ খাওয়ার সময়ে বাছুরগুলি মাঝে মাঝেই বালতির মধ্যে গুঁতো মারে।

ডানদিকের পাশাপাশি মাঠে ছিল দুইটি বাছুর। একটি ফ্রেসিয়ান, অপরটি যাকে বলে দিশী। দেখতে কালো বিদঘুটে। সবাই ওকে আদর করে বলে নিগার অর্থাৎ নিগ্রো। নিগারের যেমন ক্ষুধা তেমন খোরাক। মিঃ সরিগামের কথামত নিগারের মুখে আঙ্গুল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন করে চুষতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল ছাড়ানো দায়। দুইদিনে অনেকগুলি বাছুর এমনি করে আঙ্গুল চুষে লাল করে ফেলেছিল। নতুন আগন্তুক এলে ওরা এমনি করেই বোধ হয় মায়ের বাঁটের স্বাদ পায়।

দুধ দোহন শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু জিমি মিনি ঘরের সামনে বসে ছিল। ওদেরও মিলল আধসের করে। ইঁদুর মারা চারটি পোষা বেড়াল নিত্যকার অভ্যাসমত এসে তাদের বখরাও বুঝে নিল! কয়েকটি বড় বাছুরকে দেওয়া হল দুধের সঙ্গে গমের পালো গুলে; একেবারে বালতি ভরে ভরে। খুব বেশী করে করে খাইয়ে তাদের প্রদর্শনীতে পাঠাবার জন্য মোটা তাজা করা হচ্ছিল। বাছুরগুলির বয়স আর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখেই খাদ্যের ক্যালোরি-ভিটামিন হিসেব করা। যাদের যে উদ্দেশ্যে বড় করা হয় তাদের খাদ্য দেওয়া হয় সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে। যে বাছুরগুলি মাংসের প্রয়োজন মেটাবে তাদের জন্য মাংসবর্ধক খাদ্য, যেগুলি চর্বির প্রয়োজন মেটাবে তাদের চর্বিবর্ধক খাদ্য। আর যেগুলি গাট্টাগোট্টা ষাঁড় অথবা গাই গরু হিসেবে বিদেশে চালান হবে তাদের জন্যও ঠিক করা আছে তেমনি বিশেষ খাবার।

দুধ দোহনের কাজে কিন্তু জিমি মিনিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। দুধ তারা বৃথাই খায় না। গরুগুলি তা মাঠে মাঠে ছড়িয়ে থাকে। দূর দূরান্তের মাঠ থেকে শ'খানেক গরুকে এক জায়গায় এনে দোহনের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষত গরুর মত নির্বোধ প্রাণী নিয়ে যখন কারবার। কুকুর দুটি মাঠে মাঠে যায়, ঘেউ ঘেউ শব্দ করে, কামড়াবার

ভয় দেখায়। আর সে নির্বোধের দল দোহন কক্ষের সংলগ্ন উঠোনের দিকে ছুটতে থাকে। ঠিক পথে তাড়িয়ে আনার কৌশল জিমি মিনির নির্ভুলভাবেই জানা। কোন্ মাঠে যে কটা গরু আছে কুয়াশাঘন সকালে তা ঠিক করা এক বিষম দায়। মিঃ সরিগাম এগিয়ে যান। তারপর একপাল গরুর দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন—হি-বয় জিম, কাম অন। জিম তখন মহানন্দে গরু তাড়ায়। দোহন কক্ষের কাছাকাছি এসে কোন গরু যদি গাফিলতি করে মিঃ সরিগাম তাকে মৃদু তাড়া দিয়ে বলেন—কাম অন লেডি, গেট ইন!

সরিগামরা পেশায় ফার্মার। জমি তদারক করা, ঘাসের চাষ করা, গোপালন করা, দুধ-বিক্রী করা এদের কাজ। এরা কিন্তু গরু ভক্তি নিয়ে কপটাচরণ করে না, আবার বাছুর হত্যা করে তার চামড়ায় খড় ভরে গোমাতাকে ভুলিয়ে দুধ দোহনেরও চেষ্টা করে না। গোচারণে প্রতিটি গরু থাকা খাওয়ায় যে আরাম, যে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, আমাদের নকল গো-ভক্তির দেশে তা ভাবাও যায় না। গো-পূজকদের দিল্লী মিছিলের কথা শুনে অষ্ট্রেলিয়ানরা যে কেন হাসি চাপতে পারে না, হয়ত তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশে মানুষের বেঁচে থাকার অবস্থা ত সহজেই অনুমান করা যায়। অনুমান করা যায় মানুষের প্রতি সবার ভালবাসা আর কর্তব্যবোধ। এই কর্তব্যবোধটুকু আছে বলেই এরা পরিবারের পরিধিকে সীমিত রাখে। গণ্ডায় গণ্ডায় পুত্রকন্যার জন্ম দিয়ে মহা দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে না, দুইজনের উপযুক্ত অন্ন দশ জনে ভাগ করে ভিখারীর মত খায় না। এর প্রমাণ মেলে দুই সন্তানের লাখোপতি সরিগামদের সংসার থেকে দিন মজুরের ঘরেও। অষ্ট্রেলিয়ার একজন কৃষককে জিজ্ঞেস করুন—বাচ্চা কটি? সে বলবে—বিয়ের পর ত সবে বাড়ি করলাম। এরপর গাড়ি হবে; তারপর ত বাচ্চা। আমাদের দেশে সামান্য দুইশ টাকা বেতনের বি-এ পাশ লোককে জিজ্ঞেস করুন একই প্রশ্ন। উত্তর আসবে—সাতটি!

আরকেডিয়ার চারদিকে গোচারণভূমি আর ফলের চাষ। আট মাইল দূরে ছোট শহর শেপারটন। সরিগাম ভবনে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আলাপ করছিলাম। সে কি খাওয়া, যত্নে ও পরিবেশনে সে কি আন্তরিকতা! বিরল বসতি আরকেডিয়ার দূর গাঁয়ে থাকার ব্যবস্থা আর কাজকর্মের সুবিধা

বড় শহরের মতই। মেলবোর্ণ বা সিডনির মতই এখানে কোন আছে, হিটার কুকার টোস্টার আছে। টেলিভিশন আছে। এরাও কমোড পায়খানা ব্যবহার করে। বাথরুমে গরম জলে স্নান করে, কার্পেট পাতা ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমায়। আর এরা যা খায়, শহরের লোক পয়সা দিয়েও খাওয়ার সে আরাম, সে প্রাচুর্য কল্পনা করতে পারে না। দুধ ফল ডিম মাংস আনাজপাতি সবই হচ্ছে বাড়ির জিনিস। বিকেলে দোয়ানো দুধ থেকে পাঁচ সাত সের আলাদা করে রেফ্রিজারেটরে রেখে পরদিনের সকাল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। বলক দেওয়ার বালাই নেই। দুপুর ও সন্ধ্যায় খাওয়ার শেষে ননীঘন দুধের আইসক্রীম। সঙ্গে দুধের সরে ঘন-প্রলিপ্ত ফ্রুট স্যালাড। এই সরকে বলে ক্রীম।—আচ্ছা-করে-ফেটানো পাতলা ক্ষীরের মত। অষ্ট্রেলিয়ানরা রসগোল্লা সন্দেশ তৈরী করে না, ছানা কাটে না, পায়স তক্তী রসমালাই কিছুই করতে জানে না। গেলাস গেলাস কাঁচা দুধ জলের মত খায়। দুধের আর কোন পদ নিয়ে কারও ঝগড়া নেই, শুধু ক্রীম নামক পদার্থটি নিয়ে যত কাড়াকাড়ি।

ব্রেকফাস্টের পর মিঃ সরিগাম ঘরের পাশের উঠোন থেকে মিঠকুমড়ো তুলে আনলেন। গোটা পনেরো ত বটেই। আমাদের দেশের মিঠকুমড়োর মত সুডৌল নয়। কেমন যেন এবড়ো থেবড়ো চ্যাপটা মত। ঘন গজানো ঘাসের মধ্যে নিস্তেজ লতানো গাছের পাতাও টসটসে নয়। অবাক হয়ে দেখলাম, বাড়ির সীমানার বেড়া ঘেঁষে থোকা থোকা আঙুর পেকে গাছে গাছে ঝুলছে। মনে হল. কতদিন যেন এদিকে কেউ চোখ তুলে তাকায় নি। পাখী ঠোকরানো কত আঙুর গাছ তলায় পড়ে আছে। মিঃ সরিগাম বললেন—এ সব কে আর কত খাবে বল। যার যত খুশি তুলে দু একটি মুখে দেয়। কখনও শুকিয়ে কিসমিস করা হয়। বেশীর ভাগ যায় টার্কী-মুর্গীর পেটে।

থোকা থোকা আঙুর তুলে আমরা তখন খুব খাচ্ছিলাম। গোখলে মুর্গীগুলোর দিকে এন্তার আঙুর ছড়িয়ে দিচ্ছিল, আর বিস্ময়কর সুরে মুর্গী-ডাক ডেকে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলছিল। গাছের যত সব পাকা আঙুর সেদিন সবাই মিলে তুললাম। আর লাঞ্চের সময় জলের বদলে গেলাস গেলাস ভরা আঙুর রস। সরিগামদের বাড়িতে যে কটি গাছ আছে তাতে আপেল আঙুর পীচ পেয়ার্সের সম্বৎসরের প্রয়োজন মিটেও অনেক উদ্বৃত্ত হয়। অথচ

দোহন করার আগে গরু এনে লনে জড়ো করা হয়েছে।

বালতি ভরা দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে বাছুর এসে মায়ের বাঁট
মনে করে হাত চাটছে।

গাম ট্রি সেট্‌লমেণ্ট—এডিলেডের এইখানে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যটির পত্তন হয়েছিল।
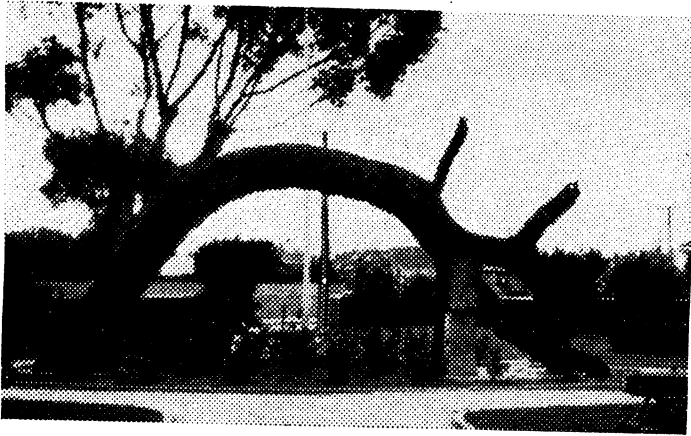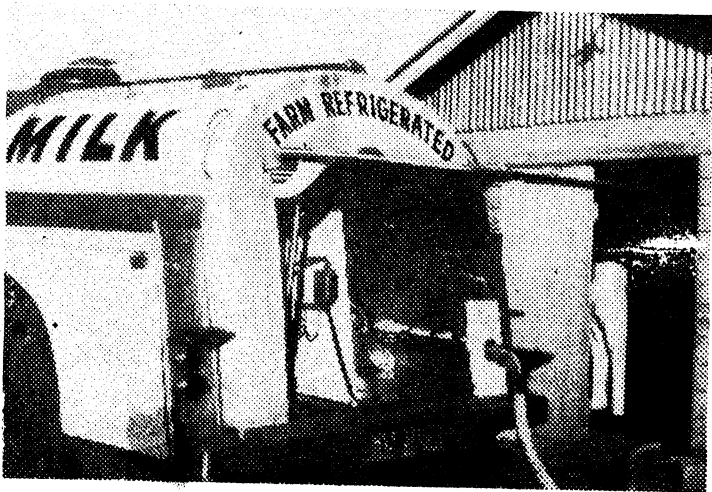
দুধের গাড়ি

খুচরো বিক্রীর উপায় নেই। আরকেডিয়ার সব বাড়িতেই আছে ফলের গাছ। ফল কিনবার লোক কোথায়? ফল বেচে পয়সা করতে হলে এলাহি চাষের ব্যবস্থা চাই। আর শুধু তখনই ফ্যাক্টরির লোকজন বা বড় মহাজন এসে লরী-লরী ফল কেনে। পাশের বাগানের এপ্রিকট থেকে অবশ্য প্রতি বছরে হাজার পাঁচেক টাকা সরিগামদের ঘরে আসে!

আরকেডিয়ার ডেয়ারীতে দুধ-দোয়া কলের এবং ঘরে ব্যবহারের বিদ্যুৎ আসে শেপারটন থেকে, তামার তারে। মাঠে মাঠে ঘাস চাষের জল আসে গোলবার্ণ নদী থেকে, পাম্প করা পাইপে। অষ্ট্রেলিয়ায় জলের বড় দাম। গ্যালন গ্যালন জল তোলা তোলা সোনার মতই মূল্যবান। ওদেশে যেমন নদীর সংখ্যা কম, প্রতি নদীতে জলের পরিমাণও খুব বেশী নয়। অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে দুই হাজার ফুট গভীরেও জল মেলা ভার। অন্তর্দেশীয় অঞ্চলগুলিতে নদী-নালা নেই, খাল বিল পুকুর নেই—তাই ডেয়ারীর সংখ্যাও কম। সেখানে সবাই আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, আর আকাশের দেবতা মুখ তুলে না চাইলে সবার দুর্গতির সীমা থাকে না। তাই মারে গোলবার্ণ ডারলিং নদীর ধারে ফল গম ঘাস চাষের মানুষরা জলের মূল্য বোঝে, জলের মূল্যেই সম্পদ সৃষ্টি করে। অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর শুষ্কতম মহাদেশ। তিরিশ লক্ষ বর্গমাইলের এক চতুর্থাংশেরও কম জমি সেখানে খাদ্য আর ঘাস বুনানির জল পায়। এমন শুকনো করুণ দেশেও ভেড়া আছে ষোল কোটি, গরু আছে দুইকোটি।

হাজার হাজার বিঘা জমিতে ঘাসের চাষ করা আছে, তাতে গরু ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে।—ঘাসের জন্য জমির চাষ? আমাদের কাছে যেন কি বিস্ময়ের ব্যাপার। জমির যদি চাষই হল, তবে কোন্ বুদ্ধিমান ফসলের বদলে ঘাস বুনবে? বিঘা প্রতি কত মণ ধান কত মণ আলু ফলে তার হিসেবেই আমরা জমির মূল্য মানটা বিচার করি। অষ্ট্রেলিয়ানরা হিসেব করে বিঘা প্রতি ঘাসের জমিতে কটা গরু ভেড়া ঘাস খেতে পারে এবং তাই থেকে কত আয় হয়।

পশ্চিম বাঙলার মাঠে মাঠেও গরু চরে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একের গরু, অপরের জমিতে। মাঠে মাঠে যখন ধানের শীষ বের হয়, মটরের ফুল ফোটে, মসুরী খেসারী ছোলা কলাই দামাল হয়ে ওঠে, তখন আর কৃষকের আনন্দ ধরে না। ঠিক তখনই দিনের আলোয় অথবা রাতের আঁধারে

সেই সোনা ফলা মাঠ গরু ঘোষ দিয়ে খাইয়ে উজার করে দেয় এক বিশেষ শ্রেণীর লোক। কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসে। এই দলবদ্ধ গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে সে অসহায়। আইন অপ্রযোজ্য। যুদ্ধের দিনে জরুরী অবস্থা আয়ত্তে আনার কায়দায় এই অনাচার, শস্যহানিকর এই উৎপাত নিশ্চয়ই বন্ধ করবার দরকার আছে!

সরিগামদের বাড়ির কাছেই নদী। কিন্তু ইচ্ছামত জল ব্যবহারের উপায় নেই। গোলবার্ণের জল নিয়ন্ত্রণ করছে শেপারটনের ওয়াটার কমিশন। মারে লডন ডার্লিং নদীর জল সরবরাহের ক্ষমতা ন্যস্ত আছে এমনি কতগুলি কমিশনের হাতে। প্রতি একর-ফুট অর্থাৎ এক একর জমিতে এক ফুট গভীর হয়ে যতটা জল দাঁড়াতে পারে তার দক্ষিণা কম পক্ষে চার টাকা। বৃষ্টির অভাবে নদীর জল কমে গেলে এই জল সরবরাহের পরিমাণেও তারতম্য ঘটে।

নদী থেকে পাম্প করা জল প্রথমে এসে জমা হয় কমিশনের রিজার্ভিয়রে —সেখান থেকে পাইপ যোগে জমিতে, দুধের কারখানায়, কৃষকের বাড়িতে। বাড়ি ঘরে এই জলের কিন্তু বারমিশালী ব্যবহার। কলকাতায় ছাদের ট্যাঙ্কে গঙ্গা জলের মত; ঘরমোছায় আর পায়খানাতেই তার বেশী প্রয়োজন। ডেয়ারীতে প্রতি টুকরা জমির মধ্যে থাকে একটি করে কাটা ডোবা। গরুর দল চরে চরে ঘাস খায় এবং তৃষ্ণার সময় সেই ডোবাতেই জল খায়। ডেয়ারী কৃষককে সতর্ক থাকতে হয় যাতে অনবধানে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী জল এসে জমিতে জমা না হয়। তা হলে কমিশন শাস্তি দেবে, হয়ত জল সরবরাহ বন্ধ করেই দেবে। ঘাসের চাষও হয় জমির বর্ডারে বর্ডারে কাটা নালায় সঞ্চিত জল পাম্পে টেনে ধারাযন্ত্র যোগে ছিটিয়ে ছড়িয়ে। সুতরাং ডেয়ারী ফার্মে পাঁচশ' গরুকে ঘাস বিচুলি কেটে জাবনা তৈরী করে খাওয়াতে হয় না। কৃষককেও গোপালনের কাজে বৌ ছেলেকে জড়িত করে হিমসিম খেতে হয় না।

অস্ট্রেলিয়ায় অল্প জলের নদী থেকে গ্যালনের হিসেবে জল নিয়ে জমি-চাষের ব্যবস্থা শুধু আজ থেকে নয়, বহু যুগ আগে থেকেই চলে আসছে। নদী থেকে, খাল বিল থেকে পাম্প করে জল নিয়ে এমনি করে জল সেচের ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও হয় নি। অবশ্য বড় ড্যাম আমাদের পশ্চিম বাঙলাতেও অনেক হয়েছে। কিন্তু তার জলে যে কোথায় জমি চাষ হয় সে খবর

অনেকেরই জানা নেই। সেখানে মাছের চাষও নাকি হয়, রিস্টয়াটু নৌকো-বাইচও খেলে, আর পয়সা খুব বেশী লাগে বলে ড্যামের জল কিনে বড় কেউ চাষের কাজে লাগায় না। প্রলয়ঙ্কর বন্যার দিনে বাঁধ-ভাঙা জল এসে আমাদের ফসল-ফলা জমি ডোবায়—তারপর যখন ঘরে এসে ওঠে, সবাই মিলে ভাগ্যের উপর দোষ চাপিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাই। আমাদের এমন অবস্থার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ানদের পরিচয় নেই। হয়ত তাই অনেকে অদ্ভুত সব প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন—হিমালয় পর্বতে এত বরফ পড়ে; সেই বরফ-গলা জল বাঁধে সঞ্চয় করে তাই দিয়ে জমি চাষ করে তোমরা ফসল বাড়াতে পার না! তাঁরা যদি একবার জানতেন, বাঙলা নদীনালার মুল্লুক, আর আমরা গর্ব করে বলি নদীমাতৃক দেশ! অবশ্য এখন নদী বৈমাত্রিক।

আরকেডিয়ার আকাশে তখন মধ্যদিনের সূর্য সোনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। নির্জন প্রান্তরে, আকাশে, বনে, সমস্ত বিশ্বচরাচরে একটি অটুট শান্তি মসৃণ আলোকরেখায় বিভাসিত হয়ে আছে। ঝকঝকে পরিষ্কার দিন। মিষ্টি মিষ্টি শীত। অবশ্য প্রচণ্ড শীত আছে অস্ট্রেলিয়ার আল্পসে, টাসমেনিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে বরফও পড়ে। তবে বরফপড়া দিনে সারাটি দেশ উত্তর ইউরোপের মত আলোহীন নয়, বৃষ্টিঝরা কালো কুয়াসা-ঢাকা বৃটেনের শীতের দুপুরের মত অন্ধকারময় নয়। অস্ট্রেলিয়ার কনকনে শীতের মধ্যে সূর্যালোকের দাক্ষিণ্য সত্যি অনুপম।

লাঞ্চের শেষে স্তব্ধ মধুর দুপুরে রোদ-পিঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে গল্প করছিলাম। জিমি কুকুরটা হঠাৎ কোথা থেকে কেঁই কেঁই শব্দে ছুটে এসে মিসেস সরিগামের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। যেন কি একটা বলতে চায়। কানের কাছ দিয়ে রক্ত পড়ছে। জিমির ছেলে মিনিটা ওকে কামড়ে দিয়েছে। মিসেস সরিগাম মায়ের স্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—পুওর জিম, ওল্ড বয়! যাট, ভয় নেই। ইয়ু উইল বি অলরাইট। একটু পরে হেসে বললেন—ছেলেকে বোধ হয় ঠিকমত মানুষ করনি, তাই বুড়ো বয়সে এমন কামড় খেতে হল! আমরা হেসে উঠলাম। মনে হল, সেই উচ্চহাসির অর্থ যেন আহত কুকুরটি বুঝে ফেলেছে। আত্মসম্মানের আঘাতে একটু গোঁ গোঁ শব্দ করে জিমি আমাদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানাল। মিসেস সরিগাম তখন বললেন—জিমকে

একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আর ত ফ্র্যাঙ্ক। একথা কি করে বুঝতে পারল জানি না, লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে সকলের আগে জিম বসে পড়ল।

অবশ্য কামড় খাওয়া বেদনা ভুলবার অছিলায় ভরদুপুরে গাড়িচড়বার সুযোগ না পেলেও জিমরা রোজ বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়ে। বেলা পড়ে এলেই যেন জল ফেলে জল আনার ডাক কানে কানে বাজতে থাকে, আর ঠিক সময়মত ওরা গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ে। ফ্র্যাঙ্ক ওদের নিয়ে গোলবার্ণের উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে হাওয়া খায়, গাম গাছের বনে বনে ক্যাঙারু তাড়ায়, তারপর সান্ধ্য পৃথিবীর রঙবদল দেখে ঘরে ফিরে আসে।

আমরাও সেদিন গোলবার্ণের উপত্যকায় হন্যে হয়ে ঘুরলাম। গভীর বনের মধ্যে মধ্যে এলোপাথারি ঘুরে গোলবার্ণ নদীর ধারে এসে মনে হল, গাম গাছের একটি আরণ্য টান আছে। তার স্পর্দ্ধিত সৈনিকের মত উচ্চ শির, অগণ্য গাছের ঘন ঘন সারি, সবুজ সতেজ পত্রপল্লব—তার পাতায় পাতায় গাছে গাছে বনে বনে ইউক্যালিপ তেলের মন-উদাস-করা গন্ধ আর-কেডিয়ার জনবিরল প্রান্তরটিতে মানুষকে যেন একেবারে হাতছানি দিয়ে ডাকে। গোলবার্ণ নদীর দুইতীরে যে দূর-বিস্তারী গাম অরণ্য দেখলাম, এলথাম বাদে অষ্ট্রেলিয়ার আর কোন জায়গায় তেমনটি আর দেখিনি। মাঝে মাঝেই গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বনে বনে ঘুরছিলাম। গভীর মনোযোগে গাম গাছগুলিকে দেখছিলাম, আর কেমন যেন মনটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠছিল। থেকে থেকে কেবলই একটি আফসোস মাথা চাড়া দিচ্ছিল, যে এত বড় বনের মধ্যে অন্য কোন গাছ, বিশেষ করে আমার দেশের সবার চেনা একটি গাছও নেই!

পশম মাংস গম যবের মত গাম গাছ কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার তেমন কিছু লাভের সম্পদ নয়, গাম গাছের নতুন বন-সৃষ্টির দিকেও দেশবাসীদের বিশেষ কোন ঝোঁক নেই। যদিও বহিঃপৃথিবীর লোকের এই গাছ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অনেক। হরেক রকম থাম-খুঁটি, রেলের স্লিপার, আর জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করেও অষ্ট্রেলিয়ানরা যখন বন সাবাড় করতে পারছিল না, অন্য একটি ছোট্ট দেশ তখন গাম গাছ নিয়ে অশেষ লাভবান হয়েছিল। সে দেশ নবজাত ইসরাইল। রোমকদের হাতে জেরুসালেমের পতনে জাতীয় সত্তা বিলোপের পর দুই হাজার বছর পর্যন্ত ইহুদীরা কত উৎপীড়ন সহ্য করল। তারপর একদিন তারা পেল বহুবাঞ্ছিত হোমল্যাণ্ড—'আপন' বলার

মত এক টুকরা ভূমি। কিন্তু সে আর কতটুকু? আরব দেশগুলির আক্রোশ এবং ঘৃণ্য বৃটিশ চক্রান্তের মধ্যে ১৯৪৮ সালে যে ইসরাইলের জন্ম হল, সে হচ্ছে এক দৈন্য দীর্ণ শূন্যভূমি; ইহুদী জাতির দুই হাজার বছরের স্বপ্নরাজ্যের ঝিলিক মাত্র। তাই আপন রাজ্য পাওয়া মাত্র আরাম আয়েস ভুলে ইহুদীরা কাজে লেগে গেল। দেশের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং নিত্য নতুন জনপদ স্থাপনের তাগিদে নতুন ভূমিসংযোজনের চেষ্টা চলল। সাগরের মুখে মুখে সিক্ত নিম্ন জলাভূমিতে, মরুভূমির কোলে কিনারে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা গাম গাছের চারা পুঁতে দেওয়া হল। নতুন নতুন গাম অরণ্যের ছায়ায় জেগে উঠল নতুন নতুন ভূমি।

শোনা যায়, স্বাধীনতার পর আমাদের লোকেরাও গাম গাছের চারার বদলে অষ্ট্রেলিয়া থেকে তার মড়া কাঠ জাহাজ ভরে ভরে এন্তার আমদানি করেছে। বেশ কিছুদিন পর নাকি তাদের মালুম হয়েছিল যে ভারতে রেলের স্লিপার ছাড়া অন্য কাজের অযোগ্য অমন কাঠ আর না আনাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আরকেডিয়ার গোলবার্ণ ছোট নদী। অপরিসর। খাড়া তীর। কঙ্করগর্ভ। কচুরিপানা-পচা গুলের মত আবিল জল। জুন মাসের শীতে শীর্ণ হয়ে আছে। এঁকে বেঁকে চলতে গিয়ে স্রোতবতী হয়েছে উপলবিষম বাঁকে বাঁকে। অজস্র বাঁকের বঙ্কিম ভঙ্গী নিয়ে গোলবার্ণ গিয়ে মিশেছে মারে নদীতে। মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ বসতিস্থাপনের প্রাককালে খুঁজে ফিরেছে স্বপেয় জল, শস্য ফলানো মাঠ। অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশের প্রথম অভিযাত্রীরা তাই খুঁজে বেড়ালেও গরু ভেড়া চরবার যোগ্য বড় বড় মাঠের দিকেই তাঁদের নজর ছিল। সে মাঠের সন্ধান একদিন মিলেছে গোলবার্ণের ধারে, মারে এবং মারিমবিজির পারে। লিভারপুল প্লেন্‌স ডারলিং ডাউন্‌স তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছে। সরিগামের মত ফার্মাররা অষ্ট্রেলিয়াতে দুধ মাখন মাংস পশমের কারবার করে তাই পয়সা করেছেন।

আরকেডিয়া-শেপারটনের নদী জলের অঞ্চলে এককালে ছিল আদিম অধিবাসীদের বাস। কত যুগ আগে গোলবার্ণ ছেড়ে যে তারা কোথায় চলে গেছে সে খবর আর কেউ রাখেনি। পৃথিবীতে মানব সভ্যতা বিকাশের পর কত হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই সভ্যতাবিকাশের দিনে

অনাবিষ্কৃত অষ্ট্রেলিয়া অনুর্বর নিষ্ফলা ভূমি আর পাহাড় পর্বত নিয়ে একা একা ঘুমিয়ে ছিল। আর অল্প কিছু আদিম অধিবাসী সেখানে অতি আদিম অবস্থায় যাযাবরের বর্বরোচিত জীবন যাপন করছিল। অথচ সে আদিম অধিবাসীরাও নাকি অষ্ট্রেলিয়ার মাটির মানুষ নয়। সেই অতি অতীতকালে এই মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এশিয়ার কিছু ভূভাগ এবং সেই সংযোগ বিন্দু দিয়েই নাকি এশিয়া থেকে এই কৃষ্ণকায় মানবদের অষ্ট্রেলিয়াতে আগমন ঘটে। অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়ী শাখার লোকেরাই নাকি সাগর পাড়ি দিয়ে এশিয়া-অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ বিন্দু দিয়ে এদেশে এসেছিল। তারাই অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী—কয়েক সহস্র বছর পরে এই মহাদেশে আগমনকারী শ্বেতকায় মানুষদের ভাষায় ব্ল্যাক্‌স। পৃথিবীর এককালের গুহা মানবরা গৃহবাসী হয়েছে, অরণ্যচারীরা নগরপত্তন করেছে, নীল সিন্ধু গঙ্গা ইউফ্রেটিসের তীরে তীরে মানবসভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের জীবনের ধারায় কোন পরিবর্তন আসে নি।

এবার সরিগামদের ইতিকথায় ফিরে আসা যাক। ১৮৩৫ সালে মিঃ সরিগামের ঠাকুর্দা আয়র্ল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। তখনও খুব বেশী আইরিশ লোকের এদেশে আগমন হয় নি, যেমন হয়েছিল ১৮৫৩ সালের আয়র্ল্যাণ্ডে আলুর দুর্ভিক্ষের বছরে। আয়র্ল্যাণ্ডের শহর গাঁ ঝেঁটিয়ে সেদিন আইরিশরা অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছিল শুধু দুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে সেই আশায়। ইংরেজরা তখন আইরিশদের মুরুব্বি। ১৯৪৩ সালের ভাতের দুর্ভিক্ষের বছরে কোন বাঙালী কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় আসার সুযোগ চায় নি, পায়ও নি। অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ আর জি কেসি বৃটিশ প্রতিনিধি হিসেবে তখন কলকাতার লাটপ্রাসাদ থেকে বাঙলা শাসন করছেন।

সরিগামের ঠাকুর্দা এসে মেলবোর্ন শহরের উত্তরে একটি ডেয়ারী খুলেছিলেন। একশ আট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে সেই ডেয়ারীর মালিক হলেন মিঃ সরিগামের পিতা। তখন তাঁর সাত ছেলে চার মেয়ের অভাবী সংসার। ছেলেগুলি একটু বড় হয়েই যে যার মত ছড়িয়ে পড়ল আপন আপন দুর্ভাগ্য নিয়ে। উঠতি যুবক ফ্রান্সিস ড্যানিয়েল সরিগাম শুরু করলেন দিন মজুরের কাজ। তারপর মেলবোর্নে এসে কাগজের হকারি থেকে হারে

দ্বারে দুধের বোতল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করলেন। মিসেস সরিগাম তখন মেলবোর্ণের এক আপিসে মহিলা কেরাণী।

চৌদ্দ বছর বিবাহিত জীবনের শেষে সরিগামরা দেড় লাখ টাকায় একটি ডেয়ারী ফার্ম কিনলেন উডস্টকে, মেলবোর্ণের উনিশ মাইল উত্তরে। শুরু হল ফার্মারের জীবন। পাথুরে জমি, তাতে আবার আরকেডিয়ার মত জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, জলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। তবু উডস্টকের ফার্মে মাঠ ভরা গরু ট্যাঙ্কভরা দুধ এবং ঘর ভরা সম্পদের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে। পনেরো বছর উডস্টক বাসের পর আরকেডিয়ায় এসেছেন আজ চার বছর। গোলবার্ণ নদীর জলসেচপুষ্ট ফার্ম কিনেছেন চারলাখ টাকায়। আজ আরকেডিয়ার ফার্মে যে গো-সম্পদ আছে শুধু তারই দাম দশ লক্ষ টাকা।

আজ আর মাঠে মাঠে গরু তাড়িয়ে ঘাস গজিয়ে ফার্ম গড়ে তোলার জন্য কায়িক শ্রমের বালাই নেই। আরও বেশী ধনী হওয়ার বাসনা নেই। নামজাদা ফার্মার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন মিঃ সরিগামের জীবনে সফল হয়েছে। আরকেডিয়ার দুধের কারখানায় সকাল বেলার কাজের শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ সরিগাম আমাকে শোনাচ্ছিলেন তাঁর জীবনের ইতিহাস। তখন শেপারটনের দুধ কেনা কোম্পানী থেকে একটি সাদা রঙের গাড়ি এসে ট্যাঙ্ক থেকে দুধ টেনে নিচ্ছে, পাইপ দিয়ে মোটর গাড়িতে পেট্রোল নেওয়ার মত। সেদিকে সরিগামের দৃষ্টি ছিল না। গাড়িখানা চলে যেতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—শেপারটনের গাড়ি কতটা দুধ নিয়ে গেল দেখলেন না ত? একটা চিরকুট এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—দেখা-দেখির দরকার নেই। কতটা দুধ নিয়েছে ড্রাইভারই ত মিটার দেখে লিখে দিয়ে গেল।

মিসেস সরিগাম সদাতৃপ্ত মহিলা। জগৎ সংসারে কোন কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগই নেই। মেলবোর্ণের শহরবাসের তুলনায় এই প্রায় নির্জন গ্রামে কৃষক বধূর জীবন তাঁর কেমন লাগে জিজ্ঞেস করলাম। মিসেস সরিগাম বললেন—স্বামী আর দুটি ছেলে নিয়ে আমার বড় সুখের সংসার। ওরা সিগারেট খায় না, মদ ছোঁয় না। একেবারে হিরের টুকরো ছেলে। আই অ্যাম রিয়ালি থ্যাঙ্কফুল।

অস্ট্রেলীয় নারী জাতির বিরুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডীয় যুবক ডিলহেনের শত অভিযোগ শুনে, এলথামের বীয়ার-খাওয়া মানুষ দেখে আরকেডিয়ায় এসে মনে হল—এ কোন্ দেশ, কোন্ যুগের বা অস্ট্রেলিয়া।

—দশ—

আরকেডিয়ার গোচারণভূমিতে গোলবার্ণ নদীর জলপুষ্ট ঘাস খেয়ে গরুর দল যখন পরমানন্দে বিচরণ করছিল, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স রাজ্যের দূর অন্তবর্তী অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য তখন হাহাকার চলছে। বিগত একশ দুই বছর এমন অনাবৃষ্টি নাকি অস্ট্রেলিয়াতে আর হয় নি। বৃষ্টি নেই, জল নেই, ঘাস নেই। শীত শেষ হয়ে আসছে। গম বোনার মরসুম চলে যাওয়ার পথে। তবু কৃষকেরা বৃষ্টি জলের অভাবে গম বুনানির কাজ শুরু করতে পারছে না। দূর দূরান্ত থেকে খবর আসছে কত সহস্র ভেড়া মরছে, কত গরু বাছুর দ্রুত নিঃশেষিত ঘরে-তোলা-খাবার না খেয়ে মৃত্যুর পথে রোজ এগিয়ে চলছে। সবার মুখেই এক কথা : খাদ্য নেই, জল নেই।—মানুষের নয়, পশুর জন্য খাদ্য জল।

এই বৃষ্টিহীন অঞ্চলগুলিতে নদী নেই, নদী থেকে নালা কেটে জল নিয়ে বাঁধে সঞ্চয় করে রাখার উপায় নেই। তাই বৃষ্টির উপর ভরসা। বৃষ্টির জন্য গীর্জায় ঈশ্বর ভক্ত পাদরী এবং মানব প্রেমিক মানুষেরা সকাতর প্রার্থনা করছে—হে ঈশ্বর বৃষ্টি দাও, জল দাও। জানি না ভগবানের রাজ্য শাসন দপ্তরে বারিবর্ষণ নদীপোষণ ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি বিভাগ আছে কিনা, আর ফিতা বন্ধন সেখানেও তেমনি জোরদার কিনা। তবু একদিন আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকার হল, ঝর ঝর করে বৃষ্টি এলো জুন মাসের এক শীতের দুপুরে। আর এমনই অবাক ব্যাপার, কৃষি অঞ্চলে বৃষ্টি না হয়ে বৃষ্টি হল সিডনি শহরে। যেখানে গরু চরে না, মেষ চরে না—কেউই ঘাস খায় না।

তিনদিনব্যাপী রাতদিন বৃষ্টির মধ্যে সিডনিতে বসে ভাবতে লাগলাম সেই একই সময়ে বাঙলাদেশের অনাবৃষ্টির কথা। দেশ থেকে চিঠির পর চিঠি আসছিল মোটামুটি একই রকমের খবর বহন করে—বৃষ্টি নেই, খাদ্য নেই, বুনানি বন্ধ। অবশ্য সেখানে পশুর নয়, মানুষের খাদ্য। সেখানেও

সবাই জুন মাসের গরমে সেদ্ধ হয়ে গুমোটে ঝলসে গরীবের ভগবানকে ডাকছে—বৃষ্টি দাও, জল দাও। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স রাজ্যের গরু ভেড়ার খাদ্যাভাবের কথা পত্রিকায় পড়ে রেডিওতে শুনে টেলিভিশনে জল-তৃষিত ফাটা মাঠ দেখে সারা দেশের মানুষের হৃদয় গলছে। প্রতিবেশী রাজ্য ভিক্‌টোরিয়া, দুই হাজার মাইল দূরের পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, সমুদ্রের ওপারের টাসমেনিয়া সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। মাত্র চার লক্ষ অধিবাসীর টাসমেনিয়া রাজ্যের কৃষকেরা দশ হাজার টন ঘাস পাঠিয়েছে, যার তখনকার বাজার দর পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কৃষকেরা যাতে খুব বেশী করে ঘাস পাঠাতে পারে, সে জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে যাতে বিনা ভাড়ায় ঘাস খড় উপদ্রুত অঞ্চল পর্যন্ত বহন করা যায়। হাজার হাজার গরু ভিক্‌টোরিয়া রাজ্যের কৃষকদের তৃণবহুল চারণভূমিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর আমাদের দেশে মানুষের দুঃখে মানুষের মন উতলা হয় নি, ভগবানের সিংহাসন টলে নি—কে বা কারা নাকি তখনও মানুষের খাদ্য কালো বাজারে চালান করার ফিকির খুঁজেছে। এই হচ্ছে একই বছরে দুই দেশের জুন মাস। উত্তর গোলার্দ্ধের দেশে প্রচণ্ড গরম আর অনাবৃষ্টি, দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দেশে দারুণ শীত আর অনাবৃষ্টি। দুই দেশেই খাদ্যাভাব—এক দেশে মানুষের, আর এক দেশে পশুর খাদ্য।

দেশ বিদেশের এই সব বিচিত্র অবস্থার কথা বসে বসে ভাবছিলাম। এমন সময় কালো পোশাক আর সাদা কলার পরা এক পাদরী পুরুষ দেখা করতে এলেন। স্বভাবতই বৃষ্টি রহস্য থেকে আলাপের সূত্রপাত হল, আর ঈশ্বরের সৃষ্টি রহস্যে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠেকল। সংসারে উদাসীন নির্লিপ্ত পাদরী। জীবন উৎসর্গ করেছেন ক্যাথলিক জনহিতায়, জগদ্ধিতায় নয়। পাদরী শুধালেন—ভগবান মানো? অনাবৃষ্টির প্রখর গরম দিনে বাঙলার লোক যখন অভাবে দিশেহারা, সিডনির প্রাচুর্যের মধ্যে বসে তখন আমাকে বলতে হবে ভগবান মানি কিনা! তবু কিন্তু খৃষ্টানের গড, মুসলমানের আল্লা, হিন্দুর ভগবান নিয়ে অল্প আলোচনা হল, আর বিস্তর মতভেদ ঘটল। তারপর নিমেষের মধ্যে সব মতভেদ ভুলে উভয়ে রওনা হলাম ক্যামডেনের পথে।

ক্যামডেন পার্ক এস্টেট একটি তালুকের নাম। সিডনি শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। এখানেও সেই দুধের কারবার, সেই ডেয়ারী ফার্মের যান্ত্রিক ব্যাপার। তবে এই ফার্মের গরুরা মাঠে মাঠে চরে বেড়ায়

-না। হাতে তোলা ঘাস খড় খায়। আর রোজ আহমণ করে দুধ দেয়। ফার্মের সব কাজই চলছে কলে। প্রতি ঘণ্টায় তিরিশটি গরুর দুধ দোহন করা যায়। এই দুধ-দোয়া খাবার-দেওয়া যান্ত্রিক ব্যবস্থার নাম রোটোলেক্‌টর (ROTOLACTOR)। সারা পৃথিবীতে এমন যন্ত্র মাত্র দুইটি আছে—একটি আমেরিকার নিউ জার্সিতে, অপরটি অষ্ট্রেলিয়ার ক্যামডেনে।

একটি চক্রাকার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তার উপর পঞ্চাশটি গরু কলের কায়দায় এসে পর পর দাঁড়ায় কেন্দ্রের দিকে মুখ করে। দশ মিনিটে একবার ঘোরা শেষ হলে পঞ্চাশটি গরুর দুধ দোয়া শেষ হয়। তখন আবার গরুগুলিকে মঞ্চতলের পথে নিষ্ক্রান্ত করিয়ে আপন আপন শেডে পৌঁছে দেওয়া হয়। গরুর মুখের কাছে ছোট ছোট পাত্র বসান থাকে। দোহনের সময় সেই পাত্রে ভিটামিন ক্যালোরির হিসেব মেলানো খাবার এসে পড়তে থাকে পাইপের পথে, স্বয়ংচালিত হয়ে। দুধের মাত্রা এবং গুণ অনুসারে যার যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমন খাদ্যই পড়ে। দুধ দিতে দিতে গরুর দল খাবার খায়।

গরুর বাঁটের সঙ্গে সংযুক্ত নলের দুধ এসে জমা হয় অপর প্রান্তে একটি স্টেনলেস স্টীলের পাত্রে। পর পর এমনি সব পাত্র বসান আছে। মঞ্চঘূর্ণনে পাত্রগুলি ব্যবস্থামত একটি ভ্যাটের মুখোমুখি হতেই আপনা থেকে ঢাকনা খুলে সমস্ত দুধ ভ্যাটের মধ্যে পড়ে—সেইখান থেকে চালান দেওয়া হয় হিমায়ন কক্ষে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দুধ হিমশীতল অবস্থায় রেল-গাড়িতে উঠে। গাড়ি চলে সিডনির দিকে। এখানে বলা প্রয়োজন, দোহনের আগে প্রত্যেক গরুর বাঁট থেকে একটু করে দুধ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় রাতারাতির অসুখে কোন গরুর দুধে বৈগুণ্য ঘটেছে কিনা। দুধ দোহনের শেষে সমস্ত রোটোলেক্‌টর, পাইপ, দুধের পাত্র, ভ্যাট গরম জলের যন্ত্রচালিত ধারায় পরিষ্কার করে ধোওয়া হয়। এই জল এবং দোহনমঞ্চে গরু দাঁড়াবার পেছনে লৌহ জালির ঢাকনার নীচে ড্রেনে সঞ্চিত গোবর চোনা একাকার হয়ে পাতালের পথে এসে জমা হয় দূরের এক ভূগর্ভখাতে। সেখান থেকে তরলিত সার হিসেবে ঘাসের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় পাম্পের সাহায্যে। রোটোলেক্‌টরের দুশ গজ দূরের নেপীন নদী থেকে জল পাম্পের সাহায্যে টেনে এনে কারখানা চলে, আর মেনাঙ্গল

গ্রামের প্রয়োজন মেটে। ক্যামডেনের যে অংশে রোটোলেকৃটর স্থাপিত হয়েছে তার নাম মেনাঙ্গল।

রোটোলেকৃটরে দুধ দোহনের কাজে নিযুক্ত আছে আটজন লোক। তিনশ' একর জমিতে যে ঘাস খড় উৎপন্ন হয় তা কেটে বেল করা গুদাম জাত করা খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত আছে তিনজন লোক—ট্রাকটর, মোটর, লরী ইত্যাদি নিয়ে। রোজ হাজার পাঁচেক টাকার দুধ বিক্রী হচ্ছে মেনাঙ্গলের এই ফার্ম থেকে। এই দুধের সের প্রতি বিক্রয় মূল্য ছ' আনার মত। আরকেডিয়ার সরিগামদের ফার্মে আরও কম। প্রায় চার আনা সের। জাপানের রাস্তায় রাস্তায় যেমন মদ খাওয়ার বার আছে, অস্ট্রেলিয়াতে তেমনি আছে মিল্ক বার। দূর দূরান্তর থেকে দুধ এনে বোতলভরা হয় শহরে। তাতে জল দিয়ে ভেজালের কারবার নেই। মাখন তোলা দুধ, টোন্‌ড্‌-মিল্কের কারসাজি নেই। সবই খাঁটি দুধ। শহরে ক্রেতাদের সের প্রতি দাম পড়ে আনা আটেক। আমি ক্যামডেনে হঠাৎ একটু বেকাদায় পড়েছিলাম—আমাকে বাঙলাদেশে দুধের দাম এবং দুধ সরবরাহের অবস্থার কথা একজন সব-জান্তা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন। তারপর উপদেশের সুরে বলেছিলেন—কতগুলি ডেয়ারী ফার্মের ব্যবস্থা করলেই ত দেশে দুধের পরিমাণ বাড়ত।—এজন্য ছানা-কাটা বন্ধ করবার প্রয়োজন ছিল কি?

রোটোলেকৃটর ফার্মের মালিক হচ্ছে ক্যামডেন পার্ক এস্টেট। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই ফার্মের গো-মাতারা ইনজেকশনের কৃত্রিম উপায়ে গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা দেয়। সুতরাং অযথা ষাঁড় পালন করে খরচ বাড়াবার দরকার নেই। ক্যামডেন পার্ক এস্টেটের আরও পাঁচটি ফার্ম আছে। সে সব ফার্মের গরু চরে মাঠে মাঠে। অস্ট্রেলিয়ার গরুর কোন শিঙ নেই। মাঠে মাঠে ঘাস খাওয়ার বদলে গরুরা যাতে গুঁতোগুঁতি করে না মরে সে জন্য বড় হওয়ার আগেই বৈদ্যুতিক করাতে কেটে শিঙগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়।

নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের অন্য সব অন্তর্বর্তী অঞ্চলে যখন দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির ফলে গরু ভেড়া মানুষের দল ত্রাহি ত্রাহি করছিল, তখন ক্যামডেন পার্কের ফার্মে তাজা ঘাস শুকনো খড়ের অভাব হয় নি। ম্যানেজার মিঃ ভার্লী অদূরবর্তী নেপীন নদীর দিকে হস্ত নির্দেশ করে বললেন—ঐ নদীটি হচ্ছে আমাদের সমস্ত সম্পদের উৎস। ১৯৬৪ সালের জুন মাসের চার তারিখে

এই অঞ্চলে একদিনে ষোল ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়ে নেপীন নদীতে বান ডেকেছিল। সেটা কি সুদিন! সেই বন্যার জল বাঁধে বাঁধে সঞ্চয় করা ছিল। সেই ৪ঠা জুনের পর ১৯৬৫ সালের জুন পর্যন্ত সারা বার মাসে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র সাত ইঞ্চি অর্থাৎ আগের একদিনে যতটা বৃষ্টিপাত হয়েছিল, পরের সারা বছরে হয়েছিল তার চাইতে নয় ইঞ্চি কম। তবু ত আমাদের এক রকম করে কেটে যাচ্ছে। নেপীনে এখনও যে জলটুকু আছে, তাই দিয়ে এবারের অনাবৃষ্টির অভিশাপ এক রকম কাটিয়ে উঠতে পারব।

এই সব কথা শোনার পর নেপীন নদীটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম। অতি অপ্রশস্ত ক্ষীণতনু নদী। একটি কাটা খালের মত। চাঁই চাঁই পাথর নদীগর্ভে পড়ে আছে। ক্ষীণ স্রোতের অল্প জল কোথাও হাঁটুভোর, কোথাও এক কোমর। এইখান থেকে এবং বৃষ্টির জল সঞ্চয় করা বাঁধ থেকে গ্যালনের হিসেবে টেনে নিয়ে এরা জমি চাষ করে, কারখানা চালায়। গরু ভেড়া চরতে চরতে জল খায়।

আগে নদীকে ঠিক নদী ছাড়া আর কিছুই ভাবি নি। পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী, গঙ্গা চূর্নী বা ময়ূরাক্ষীর জল কখনও ঘোলা, কখনও বা নির্মল নীল।—কোন কোনটিতে হয়ত এখনও আছে রুই ইলিশ কাজুলী মাছের খনি। বর্ষার প্রমত্ততায় তার পাড় ভাঙে, মানুষের ঘর ভাঙে। শরতের সন্ধ্যায় পশ্চিম তীরে সূর্য অস্ত যায় কত রঙের খেলা দেখিয়ে। এই হচ্ছে আমাদের নদীর ধ্যান রূপ। আর ছোট ছোট খাল বিল—সে সব কি আর গ্রাহ্য করেছি? অস্ট্রেলিয়ায় দেখলাম নদীর এক নতুন শক্তি। যেখানেই খালের মত একটি নদী আছে, সেইখানে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ; আর গড়ে উঠেছে গোচারণের এলাহি কারবার। প্রথম যুগের অভিযাত্রীরা অস্ট্রেলিয়ায় এসে এত বড় দেশ দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তারপর নদী নালা খাল বিল না দেখে দারুণ ভাবিত হয়ে মিষ্টি জলের উৎস সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। আমরা বাঙলা দেশে মাটি খুঁড়ে মাত্র বিশ ফুট নিচেই সুপেয় জল পেয়ে থাকি। তাই হয়ত জলের মূল্য আমরা তেমন করে বুঝি না। অস্ট্রেলিয়ার অনেক জায়গায় চার হাজার ফুট খনন করে আর্টেজীয় কূপ থেকে কখনও লোনা এবং প্রায়শ দুশ ডিগ্রী তাপ মাত্রার গরম জল মেলে।—কেটলিতে ভরে উত্তাপ আরও অনেক কমিয়ে

সেই জলে দিব্যি চা করে খাওয়া চলে। তবু এত গভীরের জল তুলে বাঁধে সঞ্চয় করে দূর দূরান্তের লোকেরা রেশনের মালের মত যত্ন করে চাষের কাজে লাগায়। সুতরাং নেপীনের মত নদীর আশীর্বাদ যেখানে আছে তা কি হেলায় পায়ে ঠেলা যায়?

নেপীন নদীকে ক্ষণেকের জন্য ভুলে নিত্য দেখা গঙ্গা চূর্নীর দুই তীরে মনে মনে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম কেমন নদী ভরা মিষ্টি মিষ্টি জল। তীরে তীরে হাওড়া হুগলী নদীয়া মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমানের জমিগুলি বৈশাখ জৈষ্ঠ্যের খরায় কাঠ-ফাটা হয়ে পড়ে আছে। পাম্প করে টেনে নিয়ে সেই জলে কেউ-ই আলু পটল ধান পাটের চাষ করছে না। গরিব চাষীদের সে সামর্থ্য নেই। তারা দৈবের উপর নির্ভর করে বরুণ দেবের কৃপাভিক্ষু হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যাদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, তারা অনেকেই পাম্প-করা জলে জমি চাষের কথা শোনে নি। চিরাচরিত দোকানদারি, পাটের ব্যবসা, এবং গম-ভাঙা কলের কারবারে টাকা খাটানোই তারা হয়ত নিরাপদ মনে করে। আর যাঁরা মাঠে গোঠে বাড়ির আনাচ-কানাচে অধিক ফসল ফলাবার উপদেশ দেন, কখনও চাষ-কাসের ধারে কাছে না গিয়েও নাকি তাঁরা রেডি-মেড মুলো বেগুনের ছবি ছাপিয়ে সবাইকে দেখান! লাখ লাখ বিঘা জমির জন্য জলসেচ এবং কলের লাঙলের ব্যবস্থা কেউ-ই করতে চান না!—আমাদের ক্ষুধাও কোনদিন মেটে না। ওদিকে অন্য এক শ্রেণীর লোক নদীর জল ঘাটের পানি পাটের চাষ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এবং কেনাবেচার সনাতন পথে না গিয়েও নাকি বিস্তর পয়সা করেন। অনেকেই তাঁদের দেখে না, এমন কি এক সঙ্গে ফিরলেও লোকে তেমন করে তাঁদের চেনে না। কেউ কেউ বলে তাঁরা নাকি অমিতবিক্রম কৃষ্ণ বণিক।

অস্ট্রেলিয়ায় মিষ্টি জল কাজে লাগাবার পরিকল্পনার অন্ত নেই। বহু ব্যাপক স্নোয়ী মাউন্টেন স্কীম আজ একটি নিখুঁত জনকল্যানী পরিকল্পনাই বটে। নিউ সাউথ ওয়েলসের শীতের পাহাড়ে বরফ পড়ে। গ্রীষ্মের গরমে সেই বরফ গলে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে মিশে যায়। জলহীন দেশে বরফ গলা জলের এত অপচয় কি সহ্য করা যায়? তাই চৌদ্দ মাইল লম্বা পর্বত-ভেদী টানেল তৈরী হয়েছে। যে জল একদিন পূবের সাগরে গিয়ে পড়ত, এবার টানেলের ভিতর দিয়ে পশ্চিমের

দিকে এসে নানা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই জল জমি চাষের কাজে লাগছে। পরোক্ষ লাভ হিসেবে নৌকো-বাইচ, মাছ ধরা, স্কী-করা ইত্যাদি আমোদ প্রমোদের লীলাভূমি হয়েছে এক বিরাট অঞ্চল। টুরিস্ট ব্যবসারের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। পাঁচশ' কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে ১৯৭৫ সালে। তবে একথা নিশ্চিত, পরিকল্পনা রূপায়নের শেষে লোকে অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে না যে সব টাকাই জলে গেছে।

ক্যামডেন পার্ক এস্টেটের পশ্চাতের কথা একটু বলার দরকার আছে। সে হচ্ছে আসলে ক্যাপ্টেন ম্যাক আর্থারের কথা। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম যুগের উপনিবেশে পথ প্রদর্শক মানুষদের তালিকায় ম্যাক আর্থার একটি স্মরণীয় নাম। তিনি দেশে ছিলেন আইনের ছাত্র। আইন পড়ার আগে ইংলণ্ডের কর্ণওয়ালে কিছুদিন ফার্মারের কাজও তিনি করেন। ওকালতি না করে শেষ পর্যন্ত সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়ে নিউ সাউথ ওয়েলস কোরের লেফ-টেনাণ্ট হিসেবে অষ্ট্রেলিয়াতে এলেন। সঙ্গে এলেন স্ত্রী এলিজাবেথ ভেল। সে হচ্ছে ১৭৮৯ সাল। ম্যাক আর্থারের বয়স তখন বাইশ বছর। অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশের বয়স এক বছর। সে উপনিবেশে খাদ্য শস্য জন্মে না, জল নেই, ফল নেই, গরু ভেড়া ঘোড়া নেই। সভ্য মানুষ নেই। এমন স্বজন বান্ধবহীন অসুন্দর দেশে চাকুরি সম্বল করে চলে আসাটা সামান্য মনোবলের পরিচয় নয়। সেদিনের পৌনে দুইশ বছর পরে আজও কি বাঙলা দেশে আমাদের মনটা খুব ঘর ছাড়া দেশ-ঘোরা ভান পিটে রকমের? কলকাতা ছেড়ে আন্দামানে গিয়ে চাকুরি করতে কয়জন প্রস্তুত আছি আমরা? নদীর মাছ নেই, আলু কপি নেই, বাঙালী কম, চারদিকে কয়েদীদের লোকাল-বর্ণ মানুষ—এমন পাণ্ডব বর্জিত সাতশ মাইল দূরের দেশে কি কোন ভদ্রলোক যায়?

কিন্তু ম্যাক আর্থার এসেছিলেন ষোল হাজার মাইল দূরে। অল্প কিছু দিন পর তাঁর মত অনেকেই অবশ্য দেশ ছেড়ে এসেছিলেন।—অকয়েদী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ভাগ্যান্বেষীর দল। ম্যাক আর্থার পেশায় ছিলেন সৈনিক। কিন্তু পশম শিল্পের দিকেই তাঁর আসল ঝোঁক। সরকারের কাছে আবেদন করলেন কয়েক সহস্র একর জমির জন্য। সিডনির উত্তরে প্যারামাট্টায় দুইশ' একর জমি তাঁর আগেই ছিল। আরও একটি কাজ তিনি এগিয়ে রেখেছিলেন।—১৭৯৪ সালে বাঙলা দেশ থেকে বাটটি উৎকৃষ্ট

ভেড়াভেড়ি কিনে এনেছিলেন। আইরিশ ভেড়ার সঙ্গে এইগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি এক নতুন ধরণের ভেড়ার পাল সৃষ্টি করলেন। এইসব ভেড়া-দলের পশম থেকে যে পশম হল তার উৎকর্ষ দেখেই অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম শ্রেণীর পশম শিল্পের দেশে পরিণত করার সাধ হল।

ম্যাক আর্থার সৈনিকের কাজ ছেড়ে মেনাজলের আশে পাশে পাঁচ হাজার একর জমি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। তারই নাম আজ ক্যামডেন পার্ক এস্টেট। এই ক্যামডেনে মেষপালন দিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। আজ দুধের ডেয়ারীতে এসে ঠেকেছে। তবু কিছু কিছু মেষ পালন এখনও হয়। আঙুর আপেল চাষের কাজও কিছু চলে। সেখানে আজ বিশেষ রকমের আটশত ভেড়া আছে।—তাদের ধমনীতে বইছে বঙ্গ-আইরিশ আর মেরিনো মেষের রক্ত।

১৮৭৭ সালে ম্যাক আর্থারের পৌত্রী তাঁর সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে বিলেতে গিয়েছিলেন। সেই সময় দক্ষিণ ইংলণ্ড এবং ইটালীতে তিনি গোটা কয়েক ডেয়ারী দেখেন। তখনই ক্যামডেনের ডেয়ারীর কথা তাঁর মাথায় খেলে। দেশে ফিরে তিনি কাজ শুরু করলেন। তারপর আশী বছর চলে গেল। সেই ডেয়ারী ক্রমে শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হল। তারপর লোকের মনে এই চিন্তা দানা বাঁধতে লাগল, যে এত ব্যাপক জায়গা জুড়ে মাঠে মাঠে গরু না চরিয়ে কত অল্প জায়গায় কত বেশী গোপালন করা যায়। সেইখানে এলো বিজ্ঞান। মাঠের ঘাস, গোয়ালের গরু এবং গরুর রাখালকে এক বিন্দুতে এনে চক্রাকারে ঘুরিয়ে দৈনিক ষোল হাজার গরুর দুধ দোহনের ব্যবস্থা হল। বিজ্ঞানের নতুন অবদান রোটোলেকটর ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যামডেনে আত্মপ্রকাশ করল! অস্ট্রেলিয়ার গোপালনে দুধের ব্যবসায়ে বিপ্লব ঘটে গেল।

একজন কল্যাণময়ী নারী যখন ক্যামডেনের ডেয়ারীতে যুগ প্রবর্তন করলেন, তখন আমাদের দেশেও জমি ছিল, জমিদার ছিল। অথচ ডেয়ারীর কথা কেউ ভাবে নি। নেপীনের মত ছোট নদী থেকে জল নিয়ে ঘাসের চাষের কথাও চিন্তা করে নি। আমাদের অজস্র নদী খাল জমি থাকতেও মহেশের মত আদরের গরুরা এক মুঠি ঘাসের অভাবে শুকিয়ে মরে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ডেয়ারীর মানুষকে যথাযথ ডেয়ারী-সচেতন করবার জন্য, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই। এই উদ্দেশ্যে ডেয়ারী

বিষয়ক অনেক পত্র পত্রিকা নানা অঞ্চলে চালু করা হয়েছে। কোন্ ফার্মে কে কি করে উন্নতি করল, কে কি ধরণের অসুবিধা ভোগ করে কি করেই বা উদ্ধার পেল, ক্যানাডা হল্যাণ্ড নিউজিল্যাণ্ডের ডেয়ারী আজ কোন্ পথে—এমনি সব খবরাখবর হরদম প্রকাশিত হচ্ছে। একটি প্রবন্ধ পড়ে একদিন অবাক হয়ে জানলাম, এক রকমের ঘাসের সঙ্গে অন্য ঘাসের বর্ণ সঙ্কর ঘটিয়ে এখন এক নতুন ঘাস উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ফলন খাদ্য প্রাণ পুষ্টি ক্ষমতা অনেক বেশী। কত দিনের পুরানো ঘাস কেমন করে কাটলে, কেমন করেই বা বেল করলে তার প্রোটিন নষ্ট না হয়, ডেয়ারী পত্রিকা পড়ে সে কথা জেনে সবাই উপকৃত হচ্ছে।

নিউ সাউথ ওয়েলসের অনাবৃষ্টিতে ডেয়ারী আর মেষ পালনে যখন ক্ষতি হল, নবজাত মেষ শাবক হাজারে হাজারে মরতে লাগল, তখন রেডিও টেলিভিশনে সে কি ঘোষণা, কাগজে কাগজে সে কি উত্তেজনা।—যেন যুদ্ধের মত জাতীয় সঙ্কট শুরু হয়েছে। যখন দূরাঞ্চলের মাঠে সামান্য বৃষ্টি হল, তখন সে কথা মুহূর্মুহূ প্রচারিত হল। কোন্ অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ কত, গম বুনানির কাজে তা কতটা লেগেছে, আর্ত অঞ্চল থেকে যত্নে সংগৃহীত সে খবর নিষ্ঠায় প্রচারিত হল। নিউ সাউথ ওয়েলসের অনাবৃষ্টির সুযোগে ভিক্টোরিয়ার কৃষকরা নাকি চড়া দামে শুকনো খড় বিক্রী করার ফিকিরে ছিল। কৃষক সমিতি রেডিওতে আবেদন জানালেন, খুচরো ব্যবসায়ীর কাছে খড় না কিনে সবাই যেন সমবায় সমিতির মাধ্যমে কেনে। কৃষিমন্ত্রীও ক্যানবেরা থেকে হুঁসিয়ারী করলেন। কালো বাজার ত বন্ধ হলই, বহু সহস্র টনের ঘাস খড়ের সাহায্য আসতে লাগল কত জায়গা থেকে। বিজ্ঞানের গবেষণাগারে, পত্র পত্রিকায়, রেডিও টেলিভিশনে জাতীয় সম্পদ ও সঙ্কটের এমনি ব্যাপক স্থান।

অষ্ট্রেলিয়ার দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কথা লোকে এখন ভুলেই গেছে। কারণ এর জন্য কোন মানুষেরই তেমন কিছু কষ্ট হয় নি; কেউই ভুখো মরে নি। ওদিকে আমাদের একটির পর আর একটি অনাবৃষ্টির খবর যখন অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছে এবং গমের সাহায্য পাঠাবার প্রশ্ন উঠেছে, তখন অনেকেই পত্র পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন—এখানেও ত কত অনাবৃষ্টি গেল। কিন্তু কৈ, ভারতের মত দুর্ভিক্ষ ত হল না? সাহায্যের প্রশ্নে মুখ ফুটে সবাই যেন বলতে চাইল· 'নিত্য মড়া পোড়ে কে, রোজ হা-ভাতেকে খাওয়ায় কে!

মেলবোর্ণের উপকণ্ঠে ওয়েরেবি ডেয়ারী বিদ্যালয়ের ডিরেকটারের সঙ্গে কোন কারণে আমাকে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। নিউজিল্যাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুদিন আগে তিনি একটি বিশেষ সম্মানলাভ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার। সুদূর নিউজিল্যাণ্ডে ডেয়ারী শিক্ষার পুরস্কার।

এগার

মারে নদীর উপত্যকায় ঘুরে ফিরছিলাম। সঙ্গে জোসিফি পিতানি। ইটালীর লোক। খাস ইটালী হলে লোকে বলত জোসেফি পাতোনি। অষ্ট্রেলিয়ায় ওর নামোচ্চারণের ব্যাকরণসম্মত কায়দার ধার কেউ ধারে না। সংক্ষেপে সবাই বলে জো।

ভেবেছিলাম মারে না জানি কত বড় নদী। দেখে কিন্তু মন খারাপ হল। পাশে বড় কম। মনে হল, না যেতে পেয়ে যেন শুকিয়ে কমজোরি হয়ে পড়েছে। আসলে মারের মহিমা কিন্তু দৈর্ঘ্যে। আমাদের যেখানে মারে-দর্শন ঘটল সে হচ্ছে ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলসের সীমারেখা, মাঝখানে মারে নদী পশ্চিম বাহিনী হয়ে এগিয়ে চলেছে। নদীতীরে নিউ-সাউথ ওয়েলসের ছোট শহর তোকুমওয়াল। এইখান থেকে শ'পাঁচেক মাইল পশ্চিমে ডার্লিং নদী উত্তর থেকে এসে মারের সঙ্গে মিশেছে। তারপর উভয়ের মিলিত ধারা আরও সরে ক্রমে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এডিলেডের পূবে। মারে ডার্লিংএর মিলনরেখার কিছু আগে মিলজুরা শহর। তোকুমওয়াল থেকে মিলজুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপত্যকায় যত সব ডেয়ারী পশম এবং ফলের কারবার। অষ্ট্রেলিয়ায় মিলজুরা এক রোমান্টিক নাম। মধুচন্দ্র যাপনের একটি বড় কেন্দ্র মিলজুরা। সাত দিনের ভাড়ায় জাহাজে উঠে নবদম্পতীরা এইখানে রাজার হালে মারের জলে ভাসে, মাছ ধরে, আর আঙুর ফলের রস খায়।

শুকনো ও টীনজাত ফল এবং চিনি উৎপাদক চারটি বড় দেশের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া অন্যতম। মাংস গম দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিকারক

দেশগুলির মধ্যেও অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ স্থান। মাত্র এক কোটি পনেরো লক্ষ লোকের বাস হলেও অস্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ। অথচ লোকসংখ্যায় মাত্র টোকিও শহরের সমান। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সারাটি অঞ্চল জুড়ে কত বড় বড় শহর। শহরে শহরে সব বড় রাস্তা, বড় দোকান। দোকানে দোকানে মোটর গাড়ি, টেলিভিশন, ক্যামেরা, পোশাক এবং শৌখিন দ্রব্যাদির পশরা। এইসব দেখে দেখে খটকা লাগে। মাত্র এক কোটি পনেরো লক্ষ লোকের জন্যও কি দেশজোড়া এমন রাজসূয় আয়োজনের দরকার হয়!

সত্যি দরকার হয়। এক একটি লোক নিয়েই ত গোটা সমাজ। তার যেমন বাড়ি গাড়ির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মাংস ফল ডিম মাখন দুধ মাছের। আবার ক্যামেরা টেলিভিশন ধোলাই কলেরও। জীবনের মান উন্নত বলে সবাই সব জিনিস কেনে। তাই এত গাড়ি, এত ঘড়ি এবং এত ডিম মাংস দুধ ফল বিক্রী হচ্ছে। কোন দোকানের কোন জিনিসই অ-বিক্রীত পড়ে থাকছে না। যেদেশে একজনের সামান্য আয়ে পাঁচজনের পেট চলে, সেখানে আকাশ-ছোঁয়া দামে চাল কিনতেই পয়সা ফুরোয়—মাছ মাংস ডিম কেনার পয়সা আর থাকে না। সুতরাং ক্যামেরা কেনার প্রশ্নও সেখানে নেই। দুধ মাখন ফলের দোকানে ভিড় হওয়ার কথাও সেখানে নয়। নূন আনতে পান্তা ফুরোবার অবস্থার সঙ্গেই যে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের শতাব্দীর পরিচয়।

কোন অস্ট্রেলিয়াবাসী লোক গিজ-গিজ করা শান্তিপুরের পবিত্র মাটিতে পদার্পণ করলে ক্যামেরার স্টোর, মোটর গাড়ির দোকান, আপেল আঙ্গুরের আড়ৎ না দেখে হয়ত অবাক হবে। কিন্তু শান্তিপুরবাসীদের পয়সা ত মোটর গাড়ির জন্য নয়। তাদের চাল কিনতে হবে। সেই চাল কেনার পয়সা যাদের নেই তারা দুর্ভাগা। আবার যাদের সে পয়সা আছেও তারা হতভাগা—কারণ পয়সা দিয়েও অনেক সময় চাল মেলে না।

মারে উপত্যকায় একটি বিশেষ জনপদ দেখেছিলাম। নমুরকা সোলজার্স সেটলমেন্ট। বিগত বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে সব সৈনিক কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করতে চাইল, তাদের এনে এইখানে বসান হল। জীবিকার্জনের জন্য জমি দেওয়া হল। মারে নদীর জলসিঞ্চনপুষ্ট তেষট্টি হাজার একর জমিতে বিগত দিনের সৈনিকেরা শুরু করল কৃষিকর্ম। শক্তিশালী পাম্পিং স্টেশন বসান

হল জল সেচের জন্য। পাঁচশ ছাব্বিশটি পরিবার দুধ ও ফলের ব্যবসা করে বছরে সত্তর লক্ষ টাকা রোজগারের সুযোগ পেল। এক একটি ফার্মের মূল্য দাঁড়াল আড়াই লাখ টাকা। বিশ বছর আগে এই জমিগুলি ছিল শূন্য মাঠ। সুবিস্তীর্ণ এই এলাকা তখন মারের বন্যায় ভেসে যেত। এখন বন্যা-নিয়ন্ত্রণ হয়েছে, সে অঞ্চল ধানের চাষে ধন্য হয়েছে। তোকুমওয়ালের কাছে এসে জো বলল—এই দিকটাতে আমরা ধানের চাষ করি। ঐ দেখ ধানক্ষেত।

অষ্ট্রেলিয়ার বড় ক্যানারি, জামের কারখানা, কিসমিসের কারবার—সবই গড়ে উঠেছে মারে উপত্যকায়, টাসমেনিয়ার আপেল ব্যবসায়ের মত। মারে নদীর জলে আছে ফলের রসের যোগান এবং দ্রাক্ষারসের মাদকতা, যদিও হামানদিস্তায় টুং টাং করে পিষে সেখানে কবরেজীমতে দ্রাক্ষারিষ্ট তৈরী হয় না। আর ধান? ধান দিয়ে কি করে এই সব পাউরুটিভোজী অষ্ট্রেলিয়ার লোক?

ধানের উৎপাদন বেড়েই চলেছে অষ্ট্রেলিয়াতে এবং তা নিয়ে সরকারী বিভাগে মাথাব্যথার অন্ত নেই। প্রচার ক্রমশ জোরদার করে বলা হচ্ছে—এমন অন্নের অনাদর কি তোমরা করবে, যা অর্দ্ধেক দুনিয়ার আসল খাদ্য? দোকানে দোকানে সুদৃশ্য স্বচ্ছ থলেতে চাল বিক্রীর ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং ওদেশী লোকদের থলে-হাতে লাইনে দাঁড়াতে হয় না, দোকানদারের সঙ্গে বচসা করতে হয় না, কাঁকড় পাথর পচলাগন্ধ নিয়েও মহাসমস্যায় পড়তে হয় না।

অষ্ট্রেলিয়া থেকে স্বল্প-ছাঁটা পীতাভ চাল চালান হচ্ছে বিদেশের বাজারে। অন্নভোজী অঞ্চলে এমন চালেরই কদর বেশী—অনেকটা আমাদের ঢেঁকি-ছাঁটা চালের মত। বেশী-ছাঁটা প্যাকেট করা শুভ্র চালের আদর শুধু আপন দেশে। ক্যালোরি ভিটামিনের চুলচেরা হিসেবের ধার সেখানে কেউ ধারে না। সে অভাব পুষিয়ে নেবার জন্য এন্তার দুধ ডিম মাংস ফল আছে। তবে ভরসার কথা, কলেই সম্প্রতি নতুন কায়দায় শাদা চাল তৈরী হচ্ছে। তার খাদ্য গুণে নাকি কমতি নেই, আর রান্নাতেও লাগে সময় কম। অষ্ট্রেলিয়ানদের হিসেবমত আধসের চালের ক্যালোরি মূল্য তিনপোয়া পাউরুটি, একসের মাংস, দেড়সের মটরশুঁটি অথবা আড়াই সের আলুর ক্যালোরি মূল্যের সমান। অষ্ট্রেলিয়ান ডাক্তাররা আজ অনেক ক্ষেত্রে শিশু

ও রোগীর জন্য চাউলজাত খাদ্যের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। এ দিকে গবেষণাগারেও সার্বজনিক রুচি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। সবাই এখন আশা করছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় ভাতের ব্যবহার আরও বাড়বে।

অত্যন্ত অভাবনীয় রকমে অষ্ট্রেলিয়ায় কিন্তু একদিন ধান চাষ শুরু হয়েছিল। নিউ সাউথ ওয়েলসের ফল ব্যবসায়ী জন ব্রেডি ফল ক্যানিংর কাজে ক্যালিফোর্ণিয়ায় গিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার যে মাটি এবং যে জলহাওয়ায় ধান জন্মে তার সঙ্গে, মারিমচিজির জলপুষ্ট এলাকার তিনি মিল দেখতে পেয়েছিলেন। কিছু ধান বীজ নিয়ে জন ব্রেডি দেশে ফিরলেন। শুরু করলেন ধানের চাষ। সরকারী কৃষিবিভাগ থেকেও অনেক সাহায্য পেলেন। ক্রমে মারে উপত্যকার রিভারিনা পর্যন্ত ধানের চাষ প্রসারলাভ করল। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের ক'টি রাবার চারা সিঙ্গাপুরের বোটানি বাগানে বংশবৃদ্ধি করে যেমন সারা মালয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, উত্তর আমেরিকার ধানবীজ তেমনি অষ্ট্রেলিয়াতে ধানচাষের যুগপ্রবর্তন করল। একটি আশ্চর্যের ব্যাপার, ধান চাষের প্রাককালে অষ্ট্রেলিয়ার ডেয়ারী ব্যবসায়ে চলছিল দারুণ মন্দা। আয়ের একটি বিকল্প ব্যবস্থা ডেয়ারীর লোকদের না দেখলেই নয়। ঠিক তখনই শুরু হল ধানের আবাদ।

শ দুয়েক মাইল ঘুরে ধানের ক্ষেত, ফলের চাষ, জলের বাঁধ এবং আদিম অধিবাসীদের ভাষায় নাম দেওয়া কতগুলি জনপদ দেখে জোসেফির বাড়িতে ফিরে এলাম। জো রসিক লোক। বাড়িতে ফিরেই হাঁক দিল—বৌ! কেউ কিন্তু এগিয়ে এলো না। তখন জো কৃত্রিম উদ্বেগ আর আশঙ্কার ভাষায় বলতে লাগল—সর্বনাশ হয়েছে, আমার বৌ হারিয়ে গেছে! মিসেস পিতানি তখন প্রায় সামনে। হাতে একটি লাল গোলাপ, স্ত্রীর কাছে মাঠ ফেরা জোসেফির নিত্য পাওনা ফুলটি। জো কিছুমাত্র না দেখার ভান করে বলতে লাগল—কি হবে আমার! মিসেস পিতানি ফুলটি হাতে দিয়ে হেসে বলল—বৌ হারিয়ে তুমি এমন কিছু হারাওনি (ইয়ু ডিড নট লুজ মাচ্)।

চল্লিশ বছর আগে মধ্য ইটালীর আব্রুচি থেকে জোসেফি অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিল। জন্ম তার আব্রুচির কৃষক পরিবারে। ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক। দেশে থাকতে সবার মত জোসেফিও হামেশা শুনত যে অষ্ট্রেলিয়ায় জমির অভাব নেই, কাজ জোটাবার কষ্ট নেই। তাই আর দেরী না করে সেই প্রথম উদ্গত যৌবনে জোসেফি পিতানি অষ্ট্রেলিয়ায় এলো। বিদ্যা অর্থ

সম্বলহীন। শুরু করল কুলীর কাজ। তারপর মিলডুরায় পরের বাগিচায় ফলতোলা মজুরের কাজ। কিছু টাকা জমতেই পথ খরচের পয়সা পাঠিয়ে দেশ থেকে ভাইকে আনিয়ে নিল। তারপর দুই ভাই মিলে শেপারটনের কাছে কিছু জমি ইজারা নিয়ে টম্যাটোর চাষ করল। আরও কিছু টাকা হল। বৌ-ছেলে নিয়ে আরও তিন ভাই এলো। শেষ পর্যন্ত বেকার স্বামী নিয়ে এসে গেল বড় বোন। জো একা সবার ভার আর ভাড়া বহন করল। খরচের চাপ বেড়ে চলতেই আয়ের নতুন পথ দেখতে হল। জোসেফি তখন প্রতিবেশী ইহুদী জোতদারের পড়ো জমি কিনে নিল দেড় লাখ টাকায় —আর সে নগদ টাকায় নয়, শ্রমের বিনিময়ে।

জোসেফির আঙুর ক্ষেত, এপ্রিকট বাগান, পীচ গাছের বাগিচা বসতবাড়ি থেকে দূরে দূরে। ঘরের পাশের উঠোনে ফুলকপি বাঁধাকপি লেটুস পেঁয়াজ পালং শাক আছে। আর আছে লঙ্কা গাছ। খুব বড় সাইজের লঙ্কার গাছগুলি ভরা। দুটি লাল এবং একটি কাঁচা লঙ্কা তুলে হাতের মুঠোয় রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, দেশে গিয়ে এমন লঙ্কার দু-চারটি করে বীজ একে ওকে দিলে মন্দ হয় না। জোসেফিকে বললাম—তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অবশ্য তেমন কিছু গভীর নয় যে তিন তিনটি লঙ্কার লোকসান ঘটাবার কথা বলতে পারি। তবে যদি লঙ্কা তিনটে—শুনে মিসেস পিতানি হাসতে হাসতে বলল—বেশত। তবে তোমাদের মত করে রান্নায় লঙ্কার ব্যবহার শিখিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম—নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের মত করে খাওয়াটা শেখাই ত আসল কথা। তারপর লঙ্কার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বললাম। পদ্মার হে-পার, মাদ্রাজ এবং সিংহলে বেদম ঝাল খাওয়ার কথাও বাদ গেল না। শুধু কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলার দিনে শুকনো লঙ্কার মালাদানের বিশেষ রেওয়াজের ইতিহাসটা চেপে গেলাম। বিদেশ বটে ত!

জোসেফি পিতানি আমোদী লোক। স্ত্রীকে হাড়-কেপ্পণ স্কট বলে ঠাট্টা করল, আর আমাকে একেবারে তিন তিনটে লঙ্কা দান করায় বিস্ময় প্রকাশ করল। স্কট থেকে এলো ইহুদী-প্রসঙ্গ। ইহুদী জোতদারটির অনেক জমিই পড়েছিল। শ্রমের বিনিময়ে জমি নিয়ে জোসেফি ফলের চাষ করল। তিন বছরের ফসল থেকেই সত্তর হাজার টাকা শোধ হল। আরও বছর দুই লেগে গেল বাকী টাকা শোধ করতে। তারপর ইহুদীর

সেই জমির মালিক হল জো। এই কথাটি বোঝাবার জন্য জো হাতে তুড়ি মেরে মুখে একটি বিশেষ ভঙ্গী করে বলল —এ্যাণ্ড দি যু ওয়াজ আ-উ-ট। যেন জোসেফির আজন্মের অধিকার থেকে ইহুদীটি এতদিন তাকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। পতিত জমি থেকে ইহুদীর লাভ হল নগদ দেড় লাখ টাকা, আর স্বয়ং জোসেফির একটি ফার্ম—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছিল। জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব নিয়ে ইহুদীর কাছে গেলে সে বলেছিল—তোমাকে জমি দেব কোন্ ভরসায়? দেড়লাখ টাকার ফসল ফলিয়ে টাকা শোধ করতে পারবে? জো তার লৌহ শক্ত হাত দুটি উপরে তুলে বলেছিল—আমার এই বাহুবলের ভরসায়। পরিশ্রমী যুবকের আত্মবিশ্বাস ইহুদীকে মুগ্ধ করেছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিক যুগে জমি দখলের পশ্চাতে অনেক কাহিনীই আছে। প্রথমে সিডনি থেকে উত্তর দক্ষিণ এবং পূবের দিকে উপকূলীয় অঞ্চলে জনপদের প্রসার হল। পশ্চিমে যাওয়ার উপায় নেই—সামনে ব্লু মাউণ্টেনের বাধার পাহাড়। সে পাহাড় অতিক্রমের চেষ্টা চলল। গভর্ণর ম্যাকরি উৎসাহ দিলেন, অর্থসাহায্যও করলেন। বহু সাধ্যসাধনার পর অভিযাত্রীরা ওপারে গিয়ে দেখতে পেলেন দূর-বিস্তীর্ণ সমভূমি। আবিষ্কার করলেন ল্যাচল্যান মারিমচিজি ম্যাকরি নদী। নদী তখন জলপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবিষ্কারের পর তাদের নামকরণ হল। নদী উপত্যকাগুলি দেখে নবাগত মানুষরা নবীন আশায় বুক বাঁধলেন। তারপর গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে ডারলিং ডার্ডন্‌স লিভারপুল প্লেনসের মত সমভূমির যেদিন আবিষ্কার হল, সেইদিনই আজকের শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়ার ভিত্তিস্থাপন হল। ভিত্তিস্থাপন হল ডেয়ারী যুগের।

ইটালী থেকে আজ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় যত লোক এসেছে তাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ফার্মিং—নিদেন পক্ষে দোকানদারি। তবে এখন পর্যন্ত বেশীর ভাগই কিন্তু মৎস্যজীবী। ইংলণ্ড থেকে সদ্য আগত ইংরেজরা গ্রীস ইটালীর লোকদের একটু বাঁকা চোখে দেখে, অন্তরের আক্রোশে বলে—যত সব ডার্ক পিপ্‌ল! এই ডার্ক লোকেরা কিন্তু মনে মনে হাসে, জান প্রাণ দিয়ে খেটে খুব করে টাকা কামায়, আর দেশে পাঠিয়ে সেই টাকায় জমি কেনে। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ার টাকা এমনি করে বিদেশে চালান হয় বলে অনেকেই মনে মনে গ্রীক ইটালীয়দের উপর বেশ একটু চটা। তবে ইংরেজদের রাগটাই

যেন বেশী। সম্প্রতিকালে ইটালীয়রা এসে বহু টাকার মালিক হয়ে সুখে সম্পদে আছে। গাড়ি হাঁকিয়ে চলছে। সুযোগ পেলেই ইংরেজরা টিপ্পনী কাটছে—যতসব উজবুক। গাড়ি চালাবার কানুন জানে না। ভুল করলে ন্যাকা সেজে বলে—মি নো আন্দারস্ত্যান্দ, ইংলিশ! দক্ষিণ ইটালীর লোকের উপরই যেন রাগটা একটু বেশী। কারণ তারা একটু বেশী ডার্ক অর্থাৎ চামড়া তাদের যথোচিত লাল নয়। যদিও আমাদের মতে গৌরবর্ণ। কিন্তু ইটালীয়রা এতে পরোয়া করে না। ইংরেজদের দেখিয়ে চোখ টিপে হেসে ফিস ফিস করে বলে—পৃথিবীর কাকে ইংরেজ কখন বিনা স্বার্থে ভাল বলেছে, অথবা ভাল চোখে দেখেছে?—স্বার্থ ব্যাঘাতে নিন্দা না করেছে দুনিয়ার কাকে!

ওদিকে নবাগত ইংরেজ সম্বন্ধেও কিন্তু খাস অষ্ট্রেলিয়ানরা বিদ্রূপ করে বলে—অষ্ট্রেলিয়ায় আসবে ঘর বাঁধতে—অথচ ভাবখানা·এমন, ওদের জন্য সবাই আগে থেকে যেন চাকুরি, বাড়ি এবং একটি করে গাড়ি একেবারে ঠিক ঠাক করে রেখে দেয়।

সে যাক। যে ইটালীয়রা একদিন রোম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তারা কোন ইটালীর লোক—উত্তর, দক্ষিণ, কিংবা মধ্য ইটালীর জোসেফি পাতোনির জন্মভূমি আব্রুচির আশেপাশের লোক? যে রোমানরা কার্থেজের গৌরব ধূলিসাৎ করল, স্পেন, গল ব্রিটেন জয় করল, কনস্টাণ্টানোপোল পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করল, তাদের কথা অষ্ট্রেলিয়ার ভূমিসেবী মৎস্যজীবী এবং দোকানদার ইটালীয়ানদের অনেকেই জানে না।—তারা জানে না সে রোমকরা কোন্ সে রোমের লোক। ক্লিয়োপেট্রার জন্য অষ্ট্রেলীয় ইটালীয়ানদের রোমাঞ্চ নেই, সিজারকে ছুরিকাহত করবার জন্যও লজ্জা নেই। গ্যারিবাল্ডি ম্যাৎসিনিই তাদের হিরো। মুসোলিনি অকাট্য ভুঁই-ফোঁড়।

ফলের চাষ দুধের ডেয়ারীর দুর্গপ্রাকার ডিঙিয়ে গৌরবোজ্জ্বল রোমান ইতিহাস জোসেফি আর তার স্কটিশ স্ত্রীর কাছেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না। সুযোগ পেলেই মিসেস পিতানি স্বামীকে বলে—তোমার চামড়া ত ডার্ক। পাল্টা জবাবে জো বলে—হাড়কেপ্পন স্কটের মেয়ে, তোমার চামড়াও ত লাল নয়। এই হচ্ছে নিঃসন্তান স্বামী স্ত্রীর সুখের সংসারে মধুর কলহ।

সেদিন জোসেফি একটি গল্প বলল। একটি রোগীর গল্প। হাসপাতালে আছে। রক্তের প্রয়োজন। বহু অর্থের বিনিময়ে একজন স্কটিশ লোক রক্ত দিতে রাজী হল। প্রথম বোতল রক্তের দাম রোগী বিনা দ্বিধায় চুকিয়ে দিল। কিন্তু দ্বিতীয় বোতলের দাম দিল অর্দ্ধেক। শত বচসায় বাকী পয়সাটা কিছুতেই সে দেবে না। জোসেফি আমাকে প্রশ্ন করল—বলত কেন? আমি বললাম—হয়ত রোগীর ট্যাকে টাকা ছিল না। জো প্রতিবাদ করে বলল—ব্যাপারটা আসলে অন্য রকম। প্রথম বোতল স্কটিশ রক্ত রোগীর রক্তে মিশে যেতেই তার ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। স্কটজনোচিত কেপটামিও রোগীর রক্তের কণায় কণায় মিশে গিয়েছিল। তাইত দ্বিতীয় বোতলের টাকা বের করতে এত কেপ্পনী। মিসেস পিতানি তখন কৃত্রিম রোষে তার নিজের হাতের গোলাপ ফুলটি দিয়ে স্বামীর গায়ে আঘাত করে বলল—ইয়ু নটি বয়!

—বার—

কুইন্‌সল্যাণ্ড রাজ্যের রাজধানী ব্রিসবেন। ব্রিসবেন নদীর সর্পকুঞ্চিত পঞ্চবক্র ধারা ব্রিসবেন শহরকে ধৌত করে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। সামনে তার বদ্বীপ। এই অঞ্চলটির নাম মোরটন-বে। ক্যাপটেন কুক ১৭৭০ সালে এই পর্যন্ত এসেছিলেন। জলের নিস্তেজ ছন্দ নিষ্প্রভ রঙ দেখে অনুমান করেছিলেন, হয়ত এটি কোন নদীর মোহনা। ব্রিসবেন নদী তিনি দেখেন নি।

মেলবোর্ণের লোকেরা কিছুটা অন্যায় রকমে বুক ফুলিয়ে বলে—আমরা কনভিক্টের বংশধর নই। ব্রিসবেনের সৎনাগরিকদের তেমন কথা বলার সাহস হয়ত হবে না। স্যার টমাস ব্রিসবেন অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশের গভর্ণর হয়ে এসে সিডনি থেকে কিছু কিছু মারাত্মক প্রকৃতির কনভিক্টদের সরিয়ে এনে মোরটন বেতে বসিয়ে দিলেন। সেই দুর্গম স্থান থেকে পালাবার উপায় তাদের ছিল না।

প্রথম যুগের কনভিক্টদের কি ভীষণ দিনই গেছে। হাতে পায়ে শেকল বেঁধে বেত মেরে তাদের দিয়ে কাজ করান হত। সেই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তির জন্য রাতদিন তারা মৃত্যু কামনা করত। কেউ বা সুযোগমত

সহবন্দীকে হত্যা করত— বিচারে প্রাণদণ্ড লাভ করতে পারবে সেই আশায়। এই কনভিক্টরাই ব্রিসবেনের প্রথম নাগরিক।

কনভিক্টের আগে ব্রিসবেনে পাঠান হয়েছিল নিউ সাউথ ওয়েলসের সার্ভেয়ার জেনারেল অক্সলিকে, কনভিক্ট-উপনিবেশের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে। অক্সলির দল জনমানবহীন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়েছিলেন একটি নদীর জলধারা। সেই নদীটিই আজ ব্রিসবেন নদী নামে পরিচিত। ব্রিসবেন নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরতে ঘুরতে ভিক্টোরিয়া পুলের অতি নিকটে দেখতে পেলাম একটি স্মৃতিফলক, আর তাতে লেখা আছে এই কটি কথা—'এইখানে জলের সন্ধানে এসে জন অক্সলি এই শহর পত্তনের স্থানটি আবিষ্কার করেন। ২৮-৯-১৮২৪'।

ব্রিসবেন নদীর যেখানটিতে স্মৃতিফলক দেখলাম তা বিশ্বের যে কোন শহরেব নদী তীরবর্তী সুন্দরতম অংশগুলির অন্যতম। উইলো ইউক্যালি-পটাসের ঘন ছায়ায় সমাচ্ছন্ন তীর। শান বাঁধান। অল্প দূরে দূরে পাষাণে নির্মিত আসন। আপিসের লোক কারখানার কর্মীরা এসে বেঞ্চে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। প্রণয়ীযুগলেরা জড়াজড়ি করে বসে আছে। পায়ের নিচে ব্রিসবেন নদীর ধারা গম্ভীর হয়ে বয়ে চলেছে, মোহনার কাছে স্কটল্যাণ্ডের ডী-নদীর মত। একটু দূরে পুলের কাছে ব্রিসবেন নদীর কঠিন প্রস্তরময় খাড়া তীর উদ্ধত হয়ে আছে। তার অন্তত তিশ হাত নিচে জল।

ব্রিসবেন সুন্দর শহর। রাস্তাগুলি চওড়া আর অসম্ভব রকমের পরিষ্কার। ঘরবাড়িগুলি সব ছবির মত। কোন কোন রাস্তা উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে এসে একেবারে ডুব-সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার পূব উপকুলের কুইন্‌সল্যাণ্ডকে বলা হয় সান সাইন স্টেট বা সূর্যালোকের রাজ্য। তার ফলের ফুলের হাওয়ার ট্রপিক্যাল বৈশিষ্ট্য এই ব্রিসবেন থেকেই শুরু হয়েছে। গম পশম দুধ মাংসের সাহেব-বেপারীদের মাঝখানে ব্রিসবেন যেন বিলেতে শিক্ষিত কোটপাতলুনপরা বাঙালী, যার ধুতিতে অরুচি ধরে নি, খিচুড়ি চচ্চড়ীতে চিরদিনের পক্ষপাতও কমে যায় নি। ব্রিসবেন আসলে সাহেব আর বাবুর মাঝামাঝি ভদ্ররকমের স্থান। এখানে কলকাতার মত দাদাগিরি নেই, বাঙলার মত দারোগাগিরি নেই, লণ্ডন মেলবোর্ণের মত স্নবারি নেই।

ব্রিসবেন থেকে রওনা হয়েছিলাম একশ' মাইল দূরে টু-উম্বার পথে, জগদবিখ্যাত ডারলিং ডাউন্‌স দেখব বলে। টুরিষ্ট ব্যুরোর সামনে গাড়িতে উঠবার আগে রাস্তার ওপাশে দেখলাম একটি মেয়েকে। নিউজিল্যাণ্ডের মেয়ে। আলুথালু কেশ, সামনে দৃষ্টি—মনটি যে কোথায় পড়ে আছে তার যেন কোন হদিস নেই। একটি জোয়ান ছোকরা হঠাৎ এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল অত্যন্ত অসঙ্কোচে, তার বাঁহাতখানি মেয়েটির বুকে আড়াআড়িভাবে লেপটিয়ে। আরও পঞ্চাশ বছর পরে কলকাতায় এমন দৃশ্য দেখা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। ঠিক গাড়িছাড়ার আগে মেয়েটি দৌড়ে এসে জানালার ধারে বসে পড়ল। বন্ধুটি তার পড়ে রইল পথে।

ব্রিসবেনের দূরান্ত থেকে মনে হল, কাচের দেয়ালের মধ্য দিয়ে যেন আলো-ঝলসিত সবুজ গাছের ছায়া-ঘেরা দুর্গসৌধ দেখছি। মাঠের পর মাঠ, লোকবিরল বসতি, অতি শীর্ণ ঝর্ণা, কচুরিপানা ভরা ডোবা, ফণীমনসা গাছ—এইসব দেখে দেখে এগিয়ে চলেছিলাম। অনেক বাড়ির পেছনে একটি দুটি আম গাছ। ফলে ফলে ভরে আছে। একটি গাছেও অসংবৃত বন্যতা নেই। ছাঁটা-কাটা ঘষা-মাজা নিটোল বৃক্ষমূর্তি, দাঁড়ি-গোঁফ-কামানো রাশভারী লোকের মত গম্ভীর ভাব। মনে হল, কাছে এগিয়ে গেলেও বলবে না—হ্যালো আমের দেশের লোক, কি খবর!

আরও এগিয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় বিরাট বিস্তীর্ণ জমিতে কত ভুট্টা বার্লি মিঠকুমড়ো শশা এবং তরমুজের চাষ দেখলাম। বহু দূরে দূরে অল্প অল্প জনবসতি।—রাস্তার মোড়ে মোড়ে দোকানের সামনে ঢাউস ঢাউস তরমুজ আর গোল-চ্যাপ্টা মিঠ কুমড়োর পাহাড় জমে আছে। মাটবার্গ রেঞ্জ পার হয়ে দেখলাম কমলালেবুর বন এবং মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা।

আশ্চর্য দেশ অষ্ট্রেলিয়া। জমি আছে, মানুষ নেই। ওদিকে যব গম দুধ ফল মাংস পশম এত বেশী উৎপন্ন হচ্ছে, তামা সীসা লোহা দস্তা খনিতে এত বেশী জমে আছে, যে দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েও মানুষের চাহিদা মিটছে না। তাই ইউরোপ থেকে নিত্য নতুন লোক আমদানি হচ্ছে জমির দখল নিয়ে আবাদ বাড়াবার জন্য, কারখানায় খনিতে কাজ করবার জন্য। যত সব সাদা লোক। কালো মানুষের বসতি স্থাপনের পাইকারি অধিকার অষ্ট্রেলিয়ার মানব-সংহিতায় নেই।

গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের একটি বাহুর উপর উদ্যান-শহর টু-উম্বাতে পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস। টু-উম্বা শব্দটি হচ্ছে আদিম অধিবাসীদের নিকট থেকে ধার করা টায়াম্পা শব্দের ধ্বনিবিকৃত রূপ, যার অর্থ হল জলসিক্ত নিম্নভূমি। আম কলা আনারসের রাজত্ব গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের ওপারে, ব্রিসবেনের দিকে। এপারের ফলে ফুলে হাওয়ায় আছে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য।

টু-উম্বার শৈল শহরের প্রান্ত থেকে সামনের দিকে তাকালে দেখা যায় খাড়া পাহাড়ের পায়ের তলা থেকে শুরু হয়েছে বিরাট সমভূমির রাজ্য। ভাঁজে ভাঁজে তার সমতলের উচ্ছ্বাস—ডারলিং ডাউন্‌স; কালো কাদাটে মাটির দূর বিস্তৃত মাঠে পৃথিবীর এক বহু উর্বর ভূমি।

আবিষ্কারের প্রথম যুগে শুধু উপকূলের কাছে কাছেই জনবসতি গড়ে উঠেছিল। স্যার টমাস ব্রিসবেন গভর্ণর হয়ে এসে অন্তর্বর্তী দূর এলাকায় বসতি স্থাপনের উপযোগী স্থান খুঁজে বের করতে উৎসাহিত হলেন। দলে দলে কর্মীরা সরকারী পোষকতায় বেরিয়ে পড়ল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এলান কনিংহাম গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের ওপারে আবিষ্কার করলেন পঁয়ত্রিশ লক্ষ একর চাষযোগ্য জমি, ১৮২৭ সালে। তখন ব্রিসবেন বিলেতে ফিরে গেছেন। নতুন গভর্ণর স্যার রালফ ডারলিংর নামে নবভূমির নামকরণ হল। হাজার হাজার একর জমি চিহ্নিত হল মেষপালন এবং গোপালনের জন্য। শত শত ডেয়ারী ফার্ম গজিয়ে উঠল। আজ সমগ্র কুইন্‌সল্যাণ্ডের বিশ হাজার ডেয়ারী ফার্মের এক তৃতীয়াংশ ছড়িয়ে আছে ডারলিং ডাউন্‌সকে ঘিরে। জগদবিখ্যাত মেরিনো পশমের এলাহি কারবারও ডারলিং ডাউন্‌সে শুরু হয়েছিল ডেয়ারী যুগের সঙ্গে সঙ্গে।

আজ ডারলিং ডাউন্‌সের গম কুইন্‌সল্যাণ্ডের চাহিদা মিটিয়ে লক্ষ লক্ষ টন বিদেশে চালান হচ্ছে, এখানকার বার্লি ভুট্টাও কতদেশে যাচ্ছে—ডাউন্‌সের তিসির তেলে পৃথিবীর দেশে দেশে হাজার হাজার টন রঙ তৈরী হচ্ছে। ডারলিং ডাউন্‌সের ভেড়া গরু শূওরের মাংস কত দেশের বাজার ছেয়ে ফেলেছে, তার গম পশম পনিরের মতই। এখানকার গমের উৎকর্ষতা নাকি পৃথিবীর যে কোন দেশের গমেই দুর্লভ। অষ্ট্রেলিয়ার অন্য প্রদেশের গমের ময়দার সঙ্গে ডারলিং ডাউনসের ময়দা মিশিয়ে উৎকর্ষতা বাড়ান হচ্ছে।

টু-উম্বা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ মাইল পর্যন্ত গিয়ে দেখে চলেছিলাম ডারলিং ডাউনসের কালো মাটির সোনা ফলানো শক্তি। দেখেছিলাম মেষের দল, গরুর পাল, ডেয়ারী ফার্ম। দুধ মাখন পনিরের কারখানা। আর দূরে দূরে এক একটি করে কৃষকের বাড়ি—তাতে টেলিভিশন মোটরগাড়ি কলের লাঙল সবই আছে।

আশ্চর্য ডারলিং ডাউন্‌সের কালো মাটির কাদাটে গুণ। যত সামান্য বৃষ্টিপাতই হোক, তার জল শুকিয়ে যায় না—এই কালো কালো উর্বর মাটির কণা সেই জল অনেকদিন পর্যন্ত ধরে রাখে। তাই সময়মত বৃষ্টি না হলেও কৃষক মাথায় হাত দিয়ে বসে না। সোনার ফসল ঘরে তার ঠিকই ওঠে।

ডারলিং ডাউন্‌সের গা ঘেঁষে সভ্য মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, কলকব্জা যান্ত্রিকতা উল্লাস উচ্ছৃঙ্খলতা এসে ভিড় করেছে। টু-উম্বার শৈল শহরের উচ্চ কেন্দ্র থেকে ডারলিং ডাউন্‌সের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, মাঠের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে একজন চিরকেলে মেহের আলী যেন সেই অনন্ত কালের বাণী বহন করে চলেছে—তফাৎ যাও। আমরা পঁচিশ মাইল পর্যন্ত তফাতে গিয়ে দেখলাম সেই অবনত ভূমি। আমাদের গাইডও যাত্রীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর বহুবার দেখা দৃশ্যটি আবার দেখছিলেন, টীকা-টিপ্পনীসহ কিছু কিছু ইতিহাস আওড়াচ্ছিলেন, আর উপস্থিত বুদ্ধিমত কৌতুকের সৃষ্টি করে সবাইকে হাসিয়ে তুলছিলেন। রাস্তার ধারে গুটি কয়েক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়ে দেখে গাইড মুচকি হেসে বললেন—আ মরি, কেমন টাটকা তাজা যুবক যুবতীর দল। সাবধান, ওদিকে কেউ তাকাবে না! কার চোখ যে তখন কোন্ সুদূরে তন্ময় ছিল তার ঠিক নেই—হয়ত এমন সাবধান বাণী না শুনলে অনেকেই ওদিকে ফিরে চাইত কি না সন্দেহ! কিন্তু গাইডের কথা কানে যেতেই সবাই একটু প্রথম হাসল, তারপর হাঁ করে দেখতে লাগল পথ পাশের সেই নির্জলা যৌবন। মাংস মাখন দুধ খাওয়া এমনি সব অস্ট্রেলীয় মানুষ। সবার সেরা ডারলিং ডাউন্‌সের মানুষ।

গাড়ি থামিয়ে মাঠের মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই নিউজিল্যাণ্ডবাসিনী—আমার দিকে ক্যামেরা উঁচিয়ে ধরেছে। এগিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিয়ে বলল—আমার নাম মার্গারেট।

আলাপ হল মার্গারেটের সঙ্গে। ক্যাপটেন কুক, ডারলিং ডাউন্‌স, গ্যাণ্ডী, নেরু, সাপ, কলা, আম, শাড়ি, সিন্দুর—কত কথাই উঠল। প্রশান্ত

মহাসাগরের সজল মৌসুমী বায়ু যে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জে প্রতিহত হয়ে এগিয়ে চলে ওপারের ডারলিং ডাউনসের উপর দিয়ে, অনেকটা আমাদের উত্তর-পূর্ব মৌসুমী প্রবাহের মত—সে কথাও বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই মার্গারেট বলল। নিউজিল্যাণ্ডের কোন এক মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষিকা মার্গারেটের বাড়ি পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ শহরে। আমি কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কে বলবে এমন মোটা মেয়েটি ঘণ্টা কয়েক আগে ব্রিসবেনের প্রকাশ্য রাস্তায় একজন জোয়ান পুরুষের গাত্রলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছিল। ভেবে পেলাম না, শিক্ষক-জাতীয়া এই জ্ঞানময়ী নারীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা কি করে সম্ভব—বিশেষত রাস্তার মাঝে।

মার্গারেটের অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণের সঙ্গিনী হয়ে এসেছিল তার বোন লিলি। লিলি মোটা নয়, পাটকাঠির মত পাতলাও নয়। আবার যাকে বলে স্লিম, ঠিক তাও নয়—তবে বোনের পাশে দাঁড়ালে মনে হয় যেন রেশনের চাল কম খেয়ে খেয়ে দুর্বলা হয়েছে। আর সে কম খাওয়ার কারণ হচ্ছে ভগ্নী মার্গারেট। মার্গারেটই যেন তার ন্যায্য খাবারটা মেরে নিজে খেয়ে মোটা হয়েছে।

কোন কোন বিদেশী মানুষের কাছে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের খাদ্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ শোনা যায়। এই খাদ্য বড় ভারী, দুদিন খেলেই মোটা হতে হয়। অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডে দুধ খাঁটি, মাখনে চটকানো কলা নেই, তেলে শেয়ালকাঁটার রস নেই, ময়দায় তেঁতুল বীজের নস্যি নেই। হরেক রকম চর্বির সঙ্গে এক ফোঁটা ঘিয়ের এসেন্স মিশিয়ে খাঁটি ঘি বলেও বাজারে বিক্রী হয় না। এর উপর আবার টাটকা টাটকা ফল মাছ মাংস। সবাই প্রাণভরে খায়, আর নিতান্ত ডায়েটিং-সচেতন মানুষও দুদিনে মোটা হয়। আর কেভিয়ায় সরিগাম-গৃহে খেতে বসে শুনেছিলাম, তাঁরা বাড়ির গরুর দুধ থেকে মাখন তৈরী না করে নাকি বাজার থেকে কিনে খান। কারণ সে মাখন দামে সস্তা, তার খাঁটিত্ব সম্বন্ধেও মনে কোন খটকা নেই। বাড়িতে তৈরী করার ঝামেলা ত নেই-ই। সত্যি, অষ্ট্রেলিয়ার কোন মাখনের দোকানেই কিন্তু সাইনবোর্ড দেখিনি—এখানে খাঁটি মাখন পাওয়া যায়। ভেজাল প্রমাণে হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা ত শুধু অ-খাঁটি তেল ঘিয়ের দেশেই সম্ভব।

লিলি মেয়েটি কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী। দিদির দেহের বিপুল আয়তন থেকে

সে বিস্তর শিক্ষা লাভ করেছে। তাই স্বেচ্ছায় আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যে সে অশেষ সংযম পালন করে চলেছে, বিগত দিনের হিন্দু বিধবাদের হবিষ্যান্ন খাওয়ার মত। মার্গারেটের মতে মাত্রাধিক খাদ্য সংযমই নাকি লিলির দৈহিক দৈন্যের কারণ। জানি না আসল সংযমের জোর তার কতটা।

রাণী এলিজাবেথ এবং তাঁর সহোদরা মার্গারেটের নামে এই দুই নিউজিল্যাণ্ডবাসিনীর পর পর নাম দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। অবশ্য লিলি সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়েছিল যে রাজকীয় নামায়নের ধারা অনুসরণ করে তাদের নামকরণ হয় নি। লিলিবেট বিলেতের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ডাক নাম। পঞ্চম জর্জ পত্নী রাণী মেরী নাতনীকে ঐ নামেই ডাকতেন।

আলাপ হল ক্যাথির সঙ্গে। মিস ক্যাথারিন উড। সিডনির মেয়ে। ডারলিং ডাউন্‌সের ডাক তার কাছেও পৌঁছেছিল অনেকদিন আগে, বোধহয় লাল ঝাণ্ডার ডাকের মত। একবার কানে গেলে সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কি উপায় আছে ?

ক্যাথি তন্বী শ্যামা শিখরদশনা, প্রায় কালিদাসের কবিতার বাণীরূপ। তবে পোশাকটি ছিল তার এই যুগের অষ্ট্রেলিয়ার। অধোদেশে চোঙা-মার্কা পাতলুন। গায়ে হাল্কা নাইলনের জ্যাকেট। খালি পা। পাতলুনের ঝুলকে অনাবশ্যকবোধে গোড়ালির বিঘতখানেক উপরেই ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। মনে হল, মেড-টু-অর্ডার পাতলুনটি তৈরী হয়েছে একটু বিশেষ কায়দায়—যেন দুফালি কাপড় পায়ে কোমরে জড়িয়ে অত্যন্ত আঁট করে গায়ের উপরই সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। নাম মাত্র গ্রীষ্মের অছিলা পেলেই অষ্ট্রেলিয়ার লোকে খালি পায়ে চলে। ক্যাথির শুভ্রচরণের অনাবৃত সুষমা, জ্যাকেট থেকে উছলে পড়া অসংবৃতি, তার সারা দেহের প্রায়-নগ্নতা দেখে আমার কিন্তু মনে পড়েছিল চার্চিল সাহেবের কথা, যিনি মহাত্মা গান্ধীকে অর্ধনগ্ন ফকির বলে উপহাস করেছিলেন ! জানি না বয়সের গুরুভারে শুয়ে থেকে থেকে এই যুগের অর্ধনগ্না শ্বেত সুন্দরীদের দেখবার তেমন সুযোগ তাঁর হয়েছিল কি না, অভিনেত্রী-কন্যা সারা চার্চিলের নিগ্রো স্বামী গ্রহণের প্রস্তাব কালো মানুষদের প্রতি ঘৃণা তাঁর কমেছিল কিনা। তবে আমাদের অর্ধনগ্ন ফকিরটি আপনদেহে ধারণ করেছিলেন বৃটিশ শাসিত ভারতবাসীর দৈন্যের দশা। আর ক্যাথিদের দেখে মনে হয় তাদের সর্বাঙ্গে যেন সাঁটা আছে দেহবিলাসের অট্টহাস।

শ্রীমতী ক্যাথি শুধালো—কি করা হয় ? বললাম—অনুমান কর দেখি। অনুমান করতে গিয়ে শ্রীমতী এমন সব সাংঘাতিক কথা বলল, যাতে আমার নাম খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় রোজ থাকাও অসম্ভব নয়। ক্যাথির ধারণা সংশোধন করে বললাম—তুমি বুঝি কলেজে-পড়া-মেয়ে ? এক ঝলক হাসিতে ক্যাথির মুখখানা ঝলসিয়ে উঠল। মনোমোহন ভঙ্গীতে সে বলল—অনুমান কর ত কিসের ছাত্রী ? কেন জানি না, ফস করে বলেছিলাম—আর্টফার্টের হবে আর কি। ক্যাথি আমার দিকে ঘুরে বসল। ওর বোধহয় ধারণা হয়েছিল, ভারতীয়রা সবাই জ্যোতিষ চর্চা করে, হয়ত হাত গুণতেও জানে। আশঙ্কা করলাম, শেষ পর্যন্ত ভাগ্য গণনা করতে না বলে। কিন্তু ক্যাথি ত্রস্তভাবে শুধালো—কি করে বুঝলে যে আমি আর্টের ছাত্রী ? আমি কি আর জানি, শ্রীমতী সত্যি সত্যি সিডনির আর্ট কলেজে স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পকলা শিখছে ? ওর সারাটা দেহ আর একবার সার্ভে করে বললাম—তোমার চেহারাতেই যে রয়েছে আর্ট-আর্ট ভাব। ক্যাথি এবার ঘনিষ্ট হয়ে বসল। অনেক আলাপ করল। সিডনির একটি ভারতীয় দোকান থেকে যে শাড়ি কিনেছে তাও বলল। শাড়ি পরে সিডনিতে আমার সঙ্গে দেখা করবে সে প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর একেবারে আন্তরিক হাসি হেসে বলল আই লাভ শাড়িস। আই লাভ ইণ্ডিয়া।

বলা বাহুল্য, ব্রিসবেন ফেরার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীমতী ক্যাথারিন উড আর আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নি।

—তের—

এডিলেডে একজন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে আলাপ হল। ঠাকুর্দা ছিলেন তাঁর জাত-তুর্কী, মা জার্মাণীর মহিলা। নিজে খাঁটি অষ্ট্রেলিয়ান। অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়াতে ভূমিষ্ঠ আর সব মানব সন্তানের মতই সগর্বে তিনি বলেন—আই য়্যাম ম্যান অষ্ট্রেলিয়ান। আমি জানতে চেয়েছিলাম তাঁর পূর্বপুরুষ কোন দেশ থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। ব্যস, এত অল্পেই ভদ্রলোক ক্ষেপে গিয়েছিলেন, মুখিয়ে উঠে বলেছিলেন—তুমি বুঝি মনে করেছ আমার পূর্বপুরুষ ছিল কনভিকট ? তা নয় হে বাপু! আর শুধু আমার কেন, এই সুন্দর এডিলেড শহরে একটি লোকও খুঁজে পাবে না যার পূর্বপুরুষ

লোহার গোলা আর শেকল-বাঁধা হয়ে এইখানে এসেছিল। এখানে সব স্বাধীন মানুষের কারবার—বুঝলে মেট? আমি বিলক্ষণ বোঝার ভান করলাম।

কবে, কোথায় এবং কেন কার পূর্বপুরুষ অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিল সে কথা জানার কৌতূহল ছিল আমার দুর্নিবার। কিন্তু ওখানে অল্প লোকেই সে কথা জানে, অনেকে কনভিক্‌ট রক্তের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে—যদিও কিছু লোকের পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানার জন্য এখন গবেষণার অন্ত নেই। তাদের সাহায্য করতেই সম্প্রতি সিডনিতে একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। শ'খানেক টাকা চাঁদা দিলে সমিতির আপিসে বসে নথীপত্র ঘেঁটে সে ইতিহাস কিছু সংগ্রহ করাও যায়। বংশের আদি পুরুষটি গরু চুরি, রুমাল চুরি বা সামান্য পয়সা চুরির অপরাধে সুদূর ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল, এমন খবর পেলে নবীনদের কেউ কেউ রোমাঞ্চিত হয়; গর্বের সঙ্গে বলে—বেশ ত একটি মজার ব্যাপার। আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কনভিক্‌ট ছিল—সে বেচারা সিডনির পথে বসে বসে পাথর ভাঙত। আর সেই পথে আমরা এখন মোটর হাঁকাই!

আমার তুর্কো-জার্মান রক্তবাহী বন্ধুর কাছে লজ্জিত হয়ে মাফি মাঙলাম। ভদ্রলোক কিন্তু কোন কিছুতেই আর কান না দিয়ে কথার মাঝে ছেদ টেনে বললেন—একটু দাঁড়াও দিকিনি, এখনি আসছি। আশ্চর্যের কথা, অল্প পরেই তিনি ফিরলেন। সঙ্গে এক কাড়ি পীচ আপেল কমলালেবু। ফলগুলি আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে হেসে বললেন—এই দিয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিচিত্র মানুষ!

এডিলেড সুন্দর শহর। সুন্দর বলতে যেমনটি শোনায় তার চেয়ে আরও সুন্দর। সামনে সাগর। পেছনে পাহাড়। মধ্যখণ্ডের ভূমিতে মূল শহরের বিস্তার। চারদিকে প্রায় সমান দূরত্বে তার সম্প্রসারণ। ওপাশে ভাঁজের পর ভাঁজে উপত্যকাভূমিতে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। অদূরে এক ছোট্ট নদী। হেথা হোথায় আপেল বন আঙুরের চাষ মটরের ক্ষেত। এডিলেডের প্রান্তসীমা দিয়ে ওয়ালাঙ্গায় যেতে যেতে এই সব দেখছিলাম। আর অবাক হয়ে দেখছিলাম চাষ না করা সর্ষে গাছ; রাস্তার দুইপাশে এলোমেলোভাব ভুঁই ফুঁড়ে উঠে মাঠকে মাঠ হলুদ ফুলে রাঙিয়া রেখেছে। এই স্বয়ম্ভু সর্ষে ক্ষেতের বাহার অষ্ট্রেলিয়ায় অনেক দেখা যায়। সর্ষেকে এরা

রাই। অষ্ট্রেলিয়ানরা কপির ষন্ট খায় না, মটর শুঁটির কচুরি করে না, মটরের শাক কাকে বলে তাও জানে না। আমার সঙ্গী মিঃ ম্যাক-কিনলে মটর শাকের গল্প শুনে আমেরিকান খাদ্যের মুণ্ডপাত করে বললেন—ইয়াঙ্কি লোকগুলোর কিন্তু ফল সবজী তরিতরকারী টাটকা অবস্থায় খাওয়া ঘটে না। সব কিছুই তাদের পেটে যায় ঠাণ্ডা ঘর ঘুরে। এডিলেডের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছ? টাটকা ফল, টাটকা সবজী, আর সবুজ-ঘাস-খাওয়া জ্যান্ত ভেড়ার টাটকা মাংস খেয়ে খেয়েই এডিলেডবাসীরা এমনি তাগড়া।—এই সব মাঠ হচ্ছে সেই তাজা তেজের উৎস। ম্যাক কিনলে সাহেবকে বললাম—আমাদের মাঠে মাঠে কিন্তু আর একটি বাড়তি আকর্ষণ আছে। রাখালী গান। সেখানে চলার পথে গান-গাওয়া রাখালের পা জড়িয়ে ধরে মটর শুঁটি একটুখানি খেলা করার অনুরোধ করে।—এমন কল্পনা তোমরা করতে পার কি? এ হচ্ছে মটরের ঐশ্বর্য।

বারান্তরে বলা হয়েছে, সিডনির উপনিবেশ থেকে ছড়িয়ে পড়বার প্রয়োজন দেখা দিলে দলে দলে অভিযাত্রীরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন জমি আর জলের সন্ধানে। ক্যাপটেন চার্লস স্টার্ট মারে নদী বেয়ে মোহনার কাছাকাছি এসে অতি উৎকৃষ্ট জমি দেখে ভারী খুশি হলেন। ইংলণ্ডের কর্তাদের কাছে চিঠি লিখলেন এবং তাতে এই দিকটাতে জনবসতি স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দেখালেন। তখন 'সাউথ অষ্ট্রেলিয়া কোম্পানী' নামে একটি সংস্থা গঠিত হল ইংলণ্ডে। কোম্পানীর লোকেরা এখানে এসে পতিত জমির উন্নতি করে বিক্রী শুরু করলেন। এঙ্গাস নামে এক ভদ্রলোক তিন লক্ষ টাকায় একাই আটাশ হাজার একর জমি কিনলেন। তাঁর নামে বারোসার কাছে আজ একটি ছোট শহর আছে। এঙ্গাস্টন।

তখন জার্মাণীতে ধর্মের নামে স্বৈরাচার চলছে। প্রাশিয়ার রাজা লুথার-পন্থীদের উপর জুলুম করছেন। ঠিক তখনই ইংলণ্ড থেকে কয়েকজন মিশনারী জার্মাণীতে গিয়ে নির্যাতিত মানুষদের কাছে প্রস্তাব করলেন, জার্মাণী ত্যাগ করে নিরাপদ কোন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিতে। এরই অল্প দিন পরে একশ পঁয়ষট্টিটি পরিবার দেশ ছেড়ে চলে এলো অষ্ট্রেলিয়াতে। অনেক ইংরেজও এলো। এমনি করে সব স্বাধীন মানুষ নিয়ে বর্তমান দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যটির পত্তন হল। রাজধানী স্থাপিত হল এডিলেডে। চল্লিশ মাইল উত্তরে বারোসা উপত্যকাটি জার্মাণীর সেই প্রাশিয়া

সাইলেশিয়ার অধিবাসীদের নিয়ে একটি ছোটখাটো জার্মানী হয়ে দাঁড়ান।

অনেক ইউরোপীয় মানুষের মত এডিলেডবাসী বুইগিরিসের কথাও বিশেষ করে মনে পড়ার মত। বুইগিরিস গ্রীস দেশের লোক। অস্ট্রেলিয়া এমন একটি দেশ যেখানে গ্রীক ইটালীয় ইংরেজ স্কটদের চেনা যায় এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে—বাঙালীকে চেনা যায় যেমন বাঙলার বাইরে।

গ্রেগরিয়াস বুইগিরিস যুবা পুরুষ। দেখতেও একেবারে প্রেমিকের মত—টিকালো নাক, চওড়া ভুরুর নিচে ভাবালু দুটি চোখ, প্রশস্ত ললাট। সমস্ত মুখমণ্ডলে গ্রীক ভাস্কর্যের ঐশ্বর্য। ওর জন্মভূমি ম্যাসেডোনিয়া ছিল তুরস্কের অন্তর্গত। ১৯২১ সালে গ্রীসে-তুরস্কে লোক বিনিময় হল, আর সেই সঙ্গে যেন একটি যুগবদল ঘটে গেল। গ্রীকরা চলে গেল গ্রীসে, তুর্কীদের যেতে হল তুরস্কের গ্রামগুলোয়। ফেলে-আসা গ্রামগুলোর কথা গ্রেগরিয়াসরা আজও কিন্তু ভোলেনি। পদ্মার ওপার থেকে এপারে আসা মানুষদের সঙ্গে এদের এইখানে বেশ মিল আছে। গ্রামগুলোর ক্যাস্টোরিয়া গ্রামে গ্রেগরিয়াসের জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে স্যালোনিকা মাত্র দুইশ মাইল। স্যালোনিকা গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের জন্মস্থান।

সারা অস্ট্রেলিয়ার দুই লক্ষাধিক গ্রীস দেশীয় মানুষের মধ্যে বেশীর ভাগই বাস করে মেলবোর্ণে। সিডনিতেও পঞ্চাশ হাজার গ্রীকের বাস। তিরিশ হাজার গ্রীক লোক নিয়ে এডিলেডের স্থান তৃতীয়। বাদবাকী ছড়িয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া টাসমেনিয়ার শহরে শহরে। অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীকরা বেশীর ভাগ ফলের দোকান করে, রেস্টুরেন্ট চালায়, নয়ত ফিশ এণ্ড চিপসের দোকান। গ্রেগরিয়াস বুইগিরিস তার পেশীবহুল হাত নেড়ে একটি পরম তৃপ্তির আবেগে বলল—গ্রীকরা মশাই খেতে জানে। আর তাই অন্যকে খাওয়ার স্বাদ বিতরণের জন্য এত খাবারের দোকান খুলে বসে আছে। অর্থাৎ গ্রেগরিয়ান বলতে চায়, গ্রীক খাবার দোকানের মালিকদের পয়সাটাই আসল লক্ষ্য নয়।

খাদ্যাখাদ্যের আলোচনা নিয়েই বুইগিরিসের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত হল। কথায় কথায় উঠল বৃটিশ প্রসঙ্গ। বৃটিশদের খাবার? আরে দুত্তোর, ওরা আবার খেতে জানে? ওদের রান্নার পদ্ধতিটা ত সেই এক এবং অদ্বিতীয়—সেই সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার। এমন খাদ্য তৈরী করতে না লাগে বুদ্ধি,

না কোন কৌশল। তাই ত সব মিগ্রান্টের গ্রীক দোকানে ঢুকতে হয় মশলাপাচ্য খাবার চাখতে। বক্তৃতা আর না বাড়িয়ে বুইগিরিস হঠাৎ থামল, হয়ত এরই মধ্যে ভেবে নিয়েছিল, কথার বাড়াবাড়িটা বড্ড বেশী হচ্ছে। তবে বুইগিরিস কিন্তু মিথ্যা বলে নি। গ্রীকরা সত্যি খেতে জানে। অবশ্য রেস্তোরাঁর কেবিন ছাড়া বাড়িতে ডেকে কাউকে খাওয়াতে জানে কিনা সে খবর আমার জানা নেই। বাড়িতে ওরা নাকি হামেশা খায় পোলাউ। মুর্গী সহযোগে রান্না করা। জলপাইয়ের তেলে পক্ক। ওরা বলে পিলাফি।

বুইগিরিসের অষ্ট্রেলিয়া বাস আজ দশ বছরের। এডিলেডে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে আর এডিলেড শহরের এক প্রান্তে সে বাস করে। দেশে ওর পিতার অল্প জমি আর অনেক শরিক ছিল। চিলতে চিলতে ভাগ হওয়ার পর সেই জমিতে নির্ভর করার মত উপায় আর গ্রেগরিয়াসের ছিল না। তাই ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি জমিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ায়। ইউরোপের শাদা চামড়ার লোক হলে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বার বুইগিরিসদের জন্য চিরদিনই খোলা। শুধু সামান্য একটু অসুবিধা, ইংরেজ স্কটগুলো ওদের সঙ্গে তেমন মেশে না, মিশলেও প্রাণ খুলে কথা বলে না, এবং আড়ালে আড়ালে 'ডার্ক' বলে উপহাস করে। কিন্তু বুইগিরিস এডিলেডে নিজেকে নিয়েই বেশ আছে। বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। টেলিভিশন ধোলাই কল রেফ্রিজারেটরও কিনেছে। কিছুদিন আগে গ্রীসে গিয়ে ক্লিয়োপেট্রার মত সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। অষ্ট্রেলিয়ার খাবার, অষ্ট্রেলীয় শহর, অষ্ট্রেলিয়ার মেয়ে মানুষ ওর মোটে পছন্দ নয়। কথায় কথায় বলল—অষ্ট্রেলিয়ায়? কি আছে এখানে? শনি রবিবারের শহরগুলি দেখেছ? মৃতের শহর। ভাল বার নেই, নাইট ক্লাব নেই, আমোদ আহ্লাদ নেই। পিলাফিও নেই। আছে শুধু কাড়ি কাড়ি টাকা।

অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে সব বিদেশী মানুষেরই মোটামুটি এই মত। অবশ্য ছুটির দিনে অথবা সন্ধ্যার শেষে অষ্ট্রেলিয়ার সারাটি দেশই বড় নির্জন, চিরদিনের একা মানুষের মত নিঃসঙ্গ। সন্ধ্যারাতের জনপদগুলিতে একটি শুধু করুণ শূন্যতা খাঁ খাঁ করে। ছোট শহরের পাড়ায় পাড়ায় রাস্তাঘাটে লোকজন ত চোখেই পড়ে না—দেখলে কিন্তু মনে হয়, মহা ঐশ্বর্যময় স্থান-গুলি এই মাত্র ত্যাগ করে সবাই যেন কি দুজ্ঞেয় কারণে সরে পড়েছে।

এসব সত্ত্বেও আমার কিন্তু একবার স্মরণ করিয়ে দিতে সাধ হল, ভূমিহীন গৃহহীন অর্থহীন বুইগিরিসের আপন মুলুকে বার নাইট ক্লাবে যাওয়ার মত অবস্থা ত আর তার ছিল না ; এসব বাবুবিলাসের তেমন স্বাদও সে গ্রীসে পায় নি। বুইগিরিসের দমে যাওয়া মুখটি কল্পনা করে বাক্ সংযম করতে হল। হাওড়া স্টেশনে নেমে ব্রীজ পার হয়ে কলকাতায় এসে অনেক লোকই রুটি ছেড়ে ভাত ধরে, মাছ খায়, রোজগারের পয়সা পাঠায় দেশে। আর ঘরে ফিরেই মাছ খেকো ভেতো বাঙালীর মুণ্ডপাত করে। অবস্থাটা প্রায় একই রকমের।

তবে বেশ একটু পার্থক্যও আছে। কথাটি মনে হল এডিলেডে চাকুরি করা ভারতীয় এক ভদ্রমহিলাকে দেখে। অবাঙালী। কিন্তু কলকাতায় ছোটবেলাকার ইস্কুলে পড়েছেন, কলেজের ডিগ্রী নিয়েছেন। কলকাতার আপিসে চাকুরিও করেছেন। তারপর এসেছেন এডিলেডে। এখন ভারতের ভিন প্রদেশী পাঁচজন লোকের সঙ্গে এডিলেডে তাঁর আলাপ হলেই বলেন—'কলকাতার নিন্দা শুনলে আমি তার পক্ষ নেই না। কলকাতার মত খারাপ স্থান পৃথিবীতে আর নেই।' দীর্ঘদিনের স্বার্থ সম্পর্ক সত্ত্বেও হতভাগ্য কলকাতার প্রতি তাঁর একটু মমত্ব, একটু ভালবাসাও জন্মে নি। অবশ্য শুধু প্রবাসের এডিলেড লণ্ডন ফিলাডেলফিয়াতেই নয়, ভারতের যে কোন জায়গায় পাঁচজন অবাঙালী মিলিত হলে নিতান্ত নিরীহতম লোকটিও বলেন—'আমার মনে হয় না কেউ কলকাতা পছন্দ করে।' আলাপের আর কোন বিষয় বস্তু না থাকলে সবাই মিলে বাঙলা এবং বাঙালীর আদ্যশ্রাদ্ধ করে। সস্তায় আসর জমাবার মত এমন প্রসঙ্গ বর্তমান ভারতে কমই আছে। বাঙলাদেশ আর কলকাতা যেন অভারতীয়। বিদেশে এসে গ্রীসের কোন বিশেষ প্রদেশের নিন্দা করার অভ্যাসটি কিন্তু বুইগিরিসের নয়, ইটালী জার্মানী ফ্রান্সের কোন লোকেরই নয়—ইংরেজের ত নয়ই।

তুর্কী ভাষায় বুইগিরি শব্দের অর্থ হচ্ছে গোঁফ। গ্রেগরিয়াসের বাবার ইয়াবড় গোঁফ ছিল। সেই সূত্রে তুর্কীরা তাকে বলত বুইগিরিস। শেষ পর্যন্ত তাই হল পদবী, বোম্বাইয়ের পার্শী লোকদের মিস্ত্রী, ইঞ্জিনীয়ার, দারুওয়ালা ইত্যাদি পেশাগত পদবীগুলির মত। গ্রেগরিয়াসের কিন্তু গোঁফ নেই। গোঁফওয়ালা দরিদ্র পিতার পুত্র সে—এই তার পিতৃপরিচয়ের সামান্য গৌরব। গ্রেগরিয়াস স্বনামে পুরুষো ধন্য।

অস্ট্রেলিয়াবাসী গ্রীকরা আজও ম্যারাথনের গৌরবে শিহরিত হয়, থারমোপাইলীর কাহিনীতে রোমাঞ্চিত হয়। স্যালামিসের নৌযুদ্ধও তাদের উজ্জীবিত করে। পারস্য থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রার পূর্ণ বিবরণ তাদের অস্ট্রেলিয়া-জাত সন্তানরা ইস্কুলে কণ্ঠস্থ করে না। গ্রীক বীরদের মোকাবেলা করার প্রতীক্ষায় পাটলীপুত্রে দিন-গোণা হিন্দুস্থান সৈন্যের ভয়ে আলেকজাণ্ডারের পেছু হটার কাহিনী হয়ত তারা কোনদিনই শোনে না।

গ্রেগরিয়াসের সঙ্গে কত আলাপ হল, সুদূর রোম গ্রীস থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত কত আলোচনা হল। অথচ গ্রেগরিয়াস বুইগিরিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না। ইটালীয় গ্রীক জার্মান ইংরেজ কারও শুধু ভারতবর্ষ কেন, অন্য কোন দেশ সম্বন্ধেই যেন কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। —অস্ট্রেলিয়ার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করে যে যার মত ব্যস্ত। ভারত সম্বন্ধে যদি বা কারও কোন কৌতূহল দেখি, প্রশ্নগুলি কিন্তু সেই মামুলী ধরনের—তোমাদের দেশে কি এখনও দুর্ভিক্ষ চলছে? ভারতে বড্ড লোক বৃদ্ধি হয়, তাই না? অথবা কেউ কেউ বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করে—বেশ ত ছিল গোটা দেশটা। তাকে কেটে ভাগ করলে কেন? মজার কথা, খাস ইংলণ্ডেও কিন্তু এটি সবার প্রশ্ন!

গ্রেগরিয়াসের নিকট থেকে ছুটি নিয়ে মিসেস এডিথ রীডের সঙ্গে দেখা করতে হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, মিসেস রীডের সঙ্গে আলোচনা হল শুধুই ধর্মকথা। বাহাই ধর্মের আলোচনা। প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমার ধর্ম কি? হোঁচট খেয়ে ভাবতে লাগলাম—তাই ত, আমার আবার ধর্ম কি?—না কি এডিথ রীড জানতে চান, আমার ধর্মমত কি, অথবা জাত গোত্রটিই বা কি? হাজার হোক, মেয়ে বিয়ের সম্বন্ধ ত আর তিনি করছেন না! ভেবে দেখলাম, ধর্মাচরণের কোন নির্দেশ কেউ কোনদিন আমাদের দেয় নি, কেউ আমাদের শেখায় নি মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করতে। হিন্দুধর্মসম্মত সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মাচারটা কি, তার কোন স্পষ্ট ধারণা কি আমাদের আছে? বাইবেল কোরাণের মত হিন্দুধর্মের সারকথা পুস্তকাকারে হিন্দুমন্দিরে রাখা হয় না, কাউকে শিক্ষাও দেওয়া হয় না। গীতার মাহাত্ম্য লেখা আছে পুঁথির পাতায়। বহু গভীর জ্ঞান ব্যূহ ভেদ করে তার অর্থ সর্বসাধারণের পক্ষে উৎকলন

কথা সম্ভব নয়। বাড়িতে পুরুত এসে মাটির মূর্তিতে ফুল ছিটিয়ে যায়, আর সবাই কিন্তু গর্বভরে ভাবি—আমরা ভারী হিন্দু।

আমার জবাব দিতে দেরী দেখে ধর্মপ্রাণা মহিলাটি বললেন—ব্যাপারখানা কি বলত? তোমার ধর্মমত কি আধুনিক জাপানীদের মত এখনও ঠিক হয় নি? অবশ্য ভদ্রমহিলার অসহিষ্ণু হতে দোষ নেই। এমন সোজা প্রশ্নের জবাব দিতে দেরী হওয়া ত কাজের কথা নয়। ইউরোপীয়দের অভিযোগ, বয়সের প্রশ্ন করলেও ভারতীয়রা অনেকে আমারই মত হাঁ করে থাকে, অনেক সময় অনুমানে বলে—কুড়ি পঁচিশ হবে আর কি! অজস্র ছেলেমেয়ের সংসারে সন্তানের জন্মতারিখটি পর্যন্ত বাবা মায়ের টুকে রাখার অবকাশ নেই। তার কোন হিসেবও নেই, গুরুত্বও নেই—যেমন নেই তাদের বিয়ে-বার্ষিকীর উৎসব।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম নামে যে বস্তুটি ছিল, হাজার বছর আগেই তা বাসি-মড়া হয়ে পড়ে আছে। উপযুক্ত সৎকারের অভাবে তার প্রেতাত্মা এখনও সবার ভয়ের বস্তু। এই মতটির প্রতিধ্বনি অষ্ট্রেলিয়াতেও শোনা যায়। নবাগত ভারতীয় পেলে অষ্ট্রেলিয়ানদের অনেকে জানতে চায়, হিন্দু কিনা; হিন্দু হলে আবার প্রশ্ন ব্রাহ্মণ কিনা। এসব হচ্ছে আসলে ইয়াঙ্কি ঢং। আজ আমেরিকার পত্রপত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ—এই দুটি শব্দের প্রয়োগ প্রায়শ থাকে। এই নিয়ে ভারতকে একটু চিমটি কাটা আর কি! মিসেস এডিথ রীড কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রশ্নের জবাব আদায় করতে ভোলেন নি। বিদায় নেওয়ার আগে যথোচিত নম্রভাবে বললাম—আমি যিশুখৃষ্টকে ভক্তি করি, মহম্মদের কাছে শির নত করি, বুদ্ধদেবকে পূজো করি। এই কথা শুনে এডিথ রীড চোখ তুলে আমার দিকে এমন করে চাইলেন যার অর্থ—ঢাকতে পার, লুকোতে পার না!

মিসেস এডিথ রীডের আচরিত বাহাই ধর্ম সম্বন্ধে সামান্য একটু বলবার আছে। বাহাই ধর্মগুরুর নাম বাহাউল্লা। পারস্যের লোক। ১৮৬৩ সালে নিজেকে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা করেন। সারা পৃথিবীতে বাহাই ধর্মীদের সংখ্যা আজ চল্লিশ লক্ষের কিছু বেশী। বাহাইরা সব ধর্মই স্বীকার করে, খৃষ্ট বুদ্ধ আল্লাকে মানে। তাদের ধর্মে কোন আচার উপচার ভড়ং নেই। মোল্লা নেই, পুরুত নেই। যে কোন পোশাকে যে

কেউ প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারেন। সমস্ত পৃথিবীর জন্য একটি মাত্র ধর্ম, সত্যসন্ধানে স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়, নারী পুরুষের সমান অধিকার, কুসংস্কার বর্জন, বিশ্বব্যাপী বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সারা বিশ্বের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং একটি সহকারী সাধারণ ভাষা,—এই হচ্ছে বাহাই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। বাহাই ধর্ম ও সভ্যতাপুষ্ট রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হবে কোন একটি বিশ্বশহরে—সেইখান থেকে শুরু হবে নবীন সভ্যতার জয়যাত্রা। জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ, দারিদ্র্য এবং আয়ের অসাম্য থাকবে না বিশ্ব বাহাই মুল্লুকে।

বাহাইদের উপাসনালয় নয়টি কোণ বিশিষ্ট—বাহাই মতে নয় অঙ্কটি হচ্ছে সমস্ত ঐক্যের প্রতীক। নয় পর্যন্ত এসেই তো সংখ্যার পরিসমাপ্তি। প্রত্যেক বাহাইকে রোজ প্রার্থনা করতে হয় নিজের নিভৃত স্থানটিতে হাঁটু গেড়ে বসে—হাইফার দিকে মুখ ফিরিয়ে। হাইফাতে বাহাউল্লার সমাধি।

বাহাই পঞ্জিকায় উনিশ মাসে বছর। প্রতিটি মাসও উনিশ দিনের। বাকী চারটি দিন একটি করে অন্য মাসে যোগ করে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন পূর্ণ করা হয়। একুশে মার্চ নববর্ষ। বর্ষারম্ভের আগে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেক বাহাইয়ের উনিশ দিন উপবাস করবার নিয়ম।

বাহাউল্লার পূর্ব নাম ছিল মীর্জা হোসেন আলী। ১৮১৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন পারস্য সরকারের মন্ত্রী। ১৮৬৩ সালে মীর্জা যখন নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলে ঘোষণা করেন, তার ঠিক তের বছর আগে তাব্রিজে মীর্জা আলী মহম্মদ নামে আর একজন লোককে গুলী করে মারা হয়। তিনিও ১৮৪৪ সালে নিজেকে ভগবানের দূত বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন, তাঁর চেয়েও যে শক্তিমান দূতের আবির্ভাব আসন্ন, তাঁর নাম বাহাউল্লা। বাহাউল্লা বললেন, ১৮৪৪ সালের এক হাজার বছর পরে অর্থাৎ ২৮৪৪ সালে পরবর্তী দূতের আবির্ভাব ঘটবে। বাহাউল্লার আধ্যাত্মিক উপায়ে নবযুগ প্রবর্তনের দাবী পারস্যের মুসলমান শাসকদের ভাল লাগে নি। ফলে বাহাউল্লাকে নির্বাসন শিবিরে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

এডিলেডের এডিথ রীডের কাছে বাহাই ছাড়া কথা নেই। মাত্র পাঁচশত বাহাই লোকের অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, বাহাই ধর্মই হবে সারা পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম। অষ্ট্রেলিয়া থেকে বেবাক ধর্মের বিলোপ ঘটে বাহাই ধর্মের প্রবর্তন না হলেও এডিথ রীডদের কখনই ধর্মীয় নির্যাতনের

কবলে পড়তে হবে না—কারণ অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতির ভিত্তি ধর্মের উপর নয়। অস্ট্রেলিয়ানরা অধার্মিকও নয়। মিসেস রীড ধর্মপ্রচারে নিজে উৎসাহী হলেও পুত্রকন্যার দল শুধু জন্মসূত্রেই বাহাই। আসলে তাদের গড়পড়তা হিন্দুর মত—শুধু চাকরির দরখাস্তে 'ধর্ম কি' এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া ধর্মের ধার আর কিছুতেই ধারতে হয় না।

চৌদ্দ

ওয়ালাজা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার একটি অতি অখ্যাত স্থান। সেখানকার মিঠেল রোদের মাঠে মাঠে বাদামের বনে ঘুরতে ঘুরতে পরলোকগত শাস্ত্রীজীর কথা ভাবছিলাম। বিশেষ করে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হবার দিনের কথা। রোজকার মত সেদিনও তিনি দড়ির খাটিয়ায় শুয়েছিলেন, ভোর সকালে উঠে প্রভাতী কর্মসূচীগুলি পালন করেছিলেন। তারপর চারটি মাত্র বাদাম দানা এবং এক গ্লাস কমলালেবুর রস দিয়ে প্রাতরাশ সেরে রওনা হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে। সেখানে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিল বহু সমস্যাপীড়িত পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর গুরুভার।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যটির পত্তন হয়েছিল অপেক্ষাকৃত দেরীতে, ১৮৩৬ সালে। জার্মান লোক নিয়ে প্রথমে কলোনীর শুরু হলেও ইংরেজ স্কট আইরিশদের সংখ্যাই ক্রমে বেড়ে চলল। এখনও সরকারী লক্ষ্য হচ্ছে মূলত বৃটিশ প্রজা বৃদ্ধির দিকে এবং সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকার আগন্তুক বৃটিশ লোকের জাহাজ ভাড়ার শত খানেক টাকা বাদে বাকীটা বহন করেন। নবাগতরা সেখানে এসেই তৈরী বাড়ি পায়। সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বৃটিশ প্রজার সংখ্যা দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যটিতেই আজ সর্বাধিক। এই তার বৈশিষ্ট্য, এইখানেই বারমিশালী বাকী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার পার্থক্য।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সম্পদ ও সম্বলের তুলনা নেই। দুধ গম পশম মাংসের কারবার বাদেও অর্থার্জনের অনেক উৎসই আছে। ওয়াইলার লোহার খনি সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার মোট ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা আশীভাগ চাহিদা মেটায়; তারপর জাপানকেও বিস্তর লোহা জোগায়। এই রাজ্যটির পত্তনের সাত বছরের মধ্যে তামার খনির আবিষ্কার হল ওয়ালারু, মুন্তা, কাপুন্দায়। সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হল নতুন-ঐশ্বর্যের সিংহদ্বার। আজ পোর্টপিরির অদূর

অঞ্চলের দস্তা এবং সীসার খনিও অপার ঐশ্বর্যের বিরাট উৎস। পৃথিবীর বৃহত্তম সীসার কারখানা স্থাপিত হয়েছে পোর্ট পিরির নদীর ধারে।

অষ্ট্রেলিয়ায় আগে শহর গড়ে, বাড়ি ঘর খাড়া করে, কারখানা তৈরী করে তবে লোক খুঁজে বেড়াতে হয়। এডিলেডের সাতাশ মাইল দূরে ১৯৫৫ সালে এলিজাবেথ নামে একটি ছোট শহরের পত্তন করা হল। বেশীর ভাগ তার ইংরেজ অধিবাসী। এখনও লোকসংখ্যা সায়ত্রিশ হাজারের উপরে ওঠে নি। বছরে হাজারখানা করে বাড়ি তৈরী হচ্ছে সরকারী খরচে। ১৯৬৮ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখনও সবাইকে সেধে বেড়াতে হচ্ছে এখানে এস, ঘর নাও।

মিঃ ম্যাককিনলের অতিথি হয়ে তাঁরই গাড়িতে এডিলেড থেকে রওনা হয়ে এলিজাবেথ শহর দেখে ফিরে এলাম ওয়ালাঙ্গায়। এডিলেড শহরের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্মচারী মিঃ ম্যাককিনলে ওয়ালাঙ্গায় কিছু বাদামের চাষ করেন। সপ্তাহ শেষের ছুটিতে সোজা চলে আসেন এইখানে জমির যত্ন করা, আগাছা কাটা, বাদাম তোলা, বিক্রী করা—সবই তাঁকে করতে হয় প্রায় নিজের হাতে। শুধু ফল তোলা মরশুমে জনকয়েক মজুর নিতে হয়। এ হচ্ছে তাঁর এক রকমের কর্মবিলাস, নতুন কায়দায় ছুটি কাটাবার একটি কৃষানী কৌশল। অথচ চল্লিশ একরের বাদাম চাষ থেকে বছরে যে তিরিশ হাজার টাকা তিনি পান, তাও কিন্তু কম নয়। এই বাদামের চাষ দেখতে দেখতেই ম্যাককিনলেকে বলেছিলাম শাস্ত্রীজীর অনাড়ম্বর লঘুপথ্য প্রাতর্ভোজনের কথা। ম্যাককিনলে সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—শুধু চারটি মাত্র এলমণ্ড বাদাম আর কমলালেবুর রস? পরেজ এগ এণ্ড বেকন, মাখন টোস্ট—এসব কিছুই নয়! তিরিশ হাজারী কৃষাণ সাহেবের জানা নেই, অনেকেরই ব্রেকফাস্ট এককালে হত সামান্য মুড়ি দিয়ে, আর সে মুড়িও বাজার থেকে আজ কেটে পড়েছে।

ওয়ালাঙ্গা আসলে আদিম অধিবাসীদের ভাষায় দেওয়া গ্রামের নাম। অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি জনপদের কিন্তু ইংরেজী নাম নয়। আদিম অধিবাসী-গন্ধী অনেক নামের মধ্যে ওয়াইলা, ওয়ালারু, ওয়ালংগং, প্যারাম্যাত্তা, বেনেলং কিন্তু কম বিখ্যাত নয়। শহর গ্রাম, রাস্তাঘাট, নৌকা জাহাজের নাম আদিম অধিবাসীদের ভাষায় জনপ্রিয় করা অষ্ট্রেলিয়ায় আজ একটি ফ্যাশান

হয়ে উঠেছে। যে সব শূন্য প্রান্তরে ব্রিসবেন, সিডনি, হোবার্ট, মেলবোর্ন এবং পার্থ শহরগুলি গড়ে উঠেছে, তার সব কটি স্থানেই এককালে ছিল ব্ল্যাকদের বাস। পূবে পশ্চিমে তিন হাজার মাইল, উত্তরে দক্ষিণে আড়াই হাজার মাইলের মধ্যে একমাত্র বসবাসের উপযুক্ত স্থানেই তারা ছড়িয়ে ছিল। সভ্য মানুষ এসে ঐ একই স্থানে ঘরবাড়ি তৈরী করেছে, চাষ আবাদ করেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি করেছে। অথচ আদিম অধিবাসীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে যাযাবরের জীবন যাপন করেছে—সভ্যতা বিকাশের কিছু-মাত্র চেষ্টা করে নি। আরও আশ্চর্যের কথা, দশ হাজার বছর যাবৎ বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েও সারা অষ্ট্রেলিয়াকে তারা ছেয়ে ফেলতে পারে নি।

শ্বেতাঙ্গ লোকের আগমন কালে অষ্ট্রেলিয়াতে ব্ল্যাকদের সংখ্যা ছিল মাত্র দেড় লক্ষ। এখন কুইন্সল্যাণ্ড এবং নর্দার্ন টেরিটরির সংরক্ষিত অঞ্চলে হাজার পঞ্চাশেক ব্ল্যাক আছে। আরও পঞ্চাশ হাজার আছে হাফ-কাস্ট, শাদা লোকের ভেজাল রক্তের মানুষ। পণ্ডিতদের অনুমান, এই শতাব্দীর শেষ অঙ্কে উভয় প্রকার ব্ল্যাকের সংখ্যা হবে এখনকার ঠিক দুইগুণ।

হাফ-কাস্ট্‌রা অষ্ট্রেলিয়ানদের মতই বীয়ার খায়, পোশাক পরে, চাকুরি করে আর তাদেরই মত যিশুখৃষ্টকে দেবতারূপে ভজনা করে। অষ্ট্রেলিয়ানদের তুলনায় গায়ের জোর তাদের কম নয়, কাজের মজুরিও অল্প নয়—আর মাটির দাবি ত অনেক বেশী। অথচ শাদা লোকেরা উঁচু স্তরের জীব—এই মনো-ভাবটি কিছুতেই তাদের কাটতে চায় না। খুব বেশী হাফ-কাস্ট চোখে পড়ে ব্রিসবেনে। শহরের দূরে অদূরে সভ্য মানুষের পাশে পাশেই ডেরা বেঁধে তারা বাস করছে।

এই দারুণ এটমের দিনে ব্ল্যাকদের প্রস্তর যুগে পড়ে থাকার অবশ্য কিছু কারণ আছে। তাদের পূর্বপুরুষরা উচ্চতর সভ্য মানুষ দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় আগমনকালে সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে আসতে সক্ষম হয় নি—একদানা ধানগমের বীজ নয়, গরু ভেড়া কুকুরাদি গৃহপালিত পশুও নয়। আর যে দেশে এসে পৌঁছেছিল, তাও আবার তেমনি বিচিত্র—ধান গমের কণাটি নেই, গরু ভেড়ার টিকিটি নেই। চারদিকে শুধু মাটি, পাহাড়, আর ঘাস গাছ; সাপ ক্যাঙারু আর পাখী। সুতরাং শস্যবীজ না থাকলে চাষই বা কি করে চলে, চাল গম আপেল আঙুরই বা আসে কোত্থেকে! গরু না থাকলে দুধ মাখনই বা কে পাবে কোথায়? তাই অষ্ট্রেলিয়ার

ব্যাক্তিত্বে পা দিতে না দিতেই তাদের জীবন সংগ্রাম শুরু করতে হল—শামুক মাছ গুগলী খেতে হল, সাপ আর ক্যাঙারু ভক্ষণও অভ্যাস করতে হল। পাথর ঘষে তারা বর্শা বানাল। গাছের ছালে লজ্জা নিবারণেরও যৎসামান্য চেষ্টা করল। এক অঞ্চলের সাপ ক্যাঙারু সাবাড় হতেই অন্য অঞ্চলে তাদের ধাওয়া করতে হল। জীবনযাত্রার এই অনিশ্চিত এবং ক্লেশকর অবস্থার জন্য জন্মশাসন না করেও উপায় ছিল না। বৃদ্ধার সঙ্গে যুবকের এবং যুবতীর সঙ্গে বিবাহ বয়সোত্তীর্ণ পুরুষের মিলন একরকম চল হয়ে দাঁড়াল। আর কিই বা করা যেত—লুপের আবিষ্কারও তখন হয় নি, মুখে খাওয়ার বড়ি তৈরীও কেউ সুরু করে নি!

এমনি করেই কিন্তু এই হতভাগ্য মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অনার্যোচিত বন্য জীবনযাত্রার অনিবার্য অভ্যাস বছরের পর বছর একটি অনড় ট্র্যাডিশনে দাঁড়িয়ে গেল। ক্রমে তা এমনই গা-সহা হয়ে পড়ল, ব্ল্যাকদের মনে হতে লাগল—এই ত জীবন। এমন ধারা জীবনের চাইতে উন্নত আর যে কিছু থাকতে পারে তেমন কথা চিন্তা করার সুযোগ আর তাদের রইল না। তাই শ্বেতাঙ্গ লোকেরা যখন অষ্ট্রেলিয়ায় এলো, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালীকেও ব্ল্যাকরা উন্নত বলে ভাবতে পারল না, বরং মনে করল—একি সব উৎপাত। এরা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে বনজঙ্গল সাফ করছে—আর সাপ ক্যাঙারু বিনাশ করে আমাদের খাদ্য সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে? সুতরাং ব্ল্যাকরা অবিলম্বে বর্শা হাতে শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণ করল। আর শ্বেতাঙ্গরা চরম প্রতিশোধ নিতে একটুও দ্বিধা করল না—বন্দুকের গুলীতে খতম করে করে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের প্রায় উজাড় করে ফেলল।

আকাপেরিঙ্গা ওয়ালাঙ্গার কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট জায়গা। এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রীলোকের অবস্থান কেন্দ্র। এই থেকে অনুমান করা শক্ত নয়, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ব্ল্যাকদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক কত কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। আকাপেরিঙ্গায় পুরুষের গমনাগমন নিষিদ্ধ ছিল যত সব কঠোর অনুশাসনে, আমাদের শাস্ত্রভীতদের পক্ষে অমাবস্যার রাতে পঞ্জিকার নির্দেশে অম্বল, অলাবু এবং স্ত্রীসেবন নিষেধের মত। শুধু পুরুষের দল যেস্থানে মিলিত হত, আদিম অধিবাসীদের ভাষায় তারই নাম হল ইরাকাহিলা।

আকাপেরিঙ্গার উপত্যকা থেকে দেখলাম বিস্তৃত ঘাসের চাষ। এক

সঙ্গে পঁচিশ তিরিশ বিঘার এক একটি প্লটে প্রচুর ঘাস জন্মে আছে। কৃষক ট্রাক্টর চালিয়ে নিচ্ছে।—সেই ট্রাকটরে ঘাস কাটা হচ্ছে, আর কাটা ঘাস সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকটরের মধ্যস্থ যন্ত্রব্যবস্থায় বেল তৈরী হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আট দশ গজ পর পর এমনি এক একটি বেল করা ঘাসের আঁটি মাঠময় ছড়িয়ে আছে। এইগুলি লরীভরে তুলে নিয়ে গুদামজাত করে রাখা হয়। কাজে কর্মে এমনি সব সুশৃঙ্খল যন্ত্রব্যবস্থার ফলেই ত একটি মাত্র লোকের পক্ষে হাজার দুই হাজার জমি চাষ করা, ঘাস বোনা, পাঁচ সাত শ' গরু এক সঙ্গে পালন করা এবং দুধ দোয়া সম্ভব হয়। একজন কৃষক, একটি কুকুর এবং ট্রাক্টর, মোটরগাড়ি, দুধ দোয়ার কল—ওদিকে কল চালাবার বিদ্যুৎ আর প্রয়োজন মত জল। ব্যস, এই হলেই হল।

এবার এগিয়ে চলেছিলাম বারোসার পথে। সেই জার্মান কলোনী বারোসা। অষ্ট্রেলিয়ার আর কোথাও একটি মাত্র স্থানে এত জার্মান লোক এক সঙ্গে বাস করে না। মিঃ ম্যাককিনলের ধমনীতেও কিছু জার্মান রক্ত আছে। তাঁর মাতামহী ছিলেন জার্মান। আর পিতৃগোষ্ঠী স্কটল্যাণ্ডের লোক। ১৮৩৮ সালে ম্যাককিনলের পূর্বপুরুষ দেশ ছেড়ে এখানে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। একুশ বছর বয়সের দরিদ্র যুবক। বিবাহিত। ভাগ্য ফিরবে সেই ভরসায় দেশ ছাড়লেন। আঠারো বছরের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে পনেরো হাজার মাইল দূরে পালিয়ে এলেন। ম্যাককিনলে সাহেব বললেন—সেই দুঃসাহসী যুবক অজানার ঝুঁকি সেদিন নিয়েছিলেন বলেই ত তাঁর বংশের আমরা সবাই আজ এত সম্পদ, এত সৌভাগ্যের মালিক।

আঠারো মাইল দৈর্ঘ্য আর পাঁচ মাইল প্রস্থের বারোসা উপত্যকা। বিশ হাজার একর জমিতে সেখানে আঙুর ফলের চাষ হয়। বারোসার পীচ পেয়ার্স এপ্রিকট ফলের বাগান এবং দূরে দূরে পশুচারণ ভূমিগুলির ঐশ্বর্য দেখবার মত। ফলে ফুলে বনশোভায় সারাটি উপত্যকা রাঙা। কিন্তু ভিন্‌দেশের লোক বারোসায় গেলে কবির চোখ দিয়ে বনশ্রী না দেখে প্রেমিকের চোখ দিয়ে তার নারী-শ্রী দেখে। সবার সেরা নাকি বারোসার নারী। তাই কথায় কথায় এডিলেডের লোকে বলে—বিয়ে করে ঘর আলো করতে চাও ত বারোসায় যাও।

বারোসার বৈশিষ্ট্য তার লুথারিয়ান গীর্জাগুলি—আশপাশের সমস্ত সৌধাবলীর উপর মাথা তুলে আকাশে উঠেছে। যে সব লুথার পন্থী

মানুষের ঠাঁই হয় নি আপন দেশে, এখানে তাঁদেরই তৈরী গির্জাগুলি সেদিনের স্বৈরাচারী রাজাকে যেন আজও উপহাস করছে। বারোসার লোকেরা কিন্তু প্রাচীন জার্মানীর অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে আজও একটি বৈশিষ্ট্য জিইয়ে রেখেছেন—বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার ছোকরারা লাঠি দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে বরের কাছে মদের পয়সা আদায় করে; এককালের বাঙলাদেশে পাল্কী থামিয়ে জামাইবাবুদের কাছে মিষ্টির পয়সা আদায়ের মত।

মেলবোর্ণের অপ্রসর জনবসতি ব্রান্সউইক একটি ইটালীয় কলোনী, সকল রকম ইটালীয় আচরণের কেন্দ্রভূমি। তাই মেলবোর্ণবাসীরা ব্রানসউইক প্রসঙ্গে হালকা সুরে বলে—এ লিট্‌ল-ইট্যালী। সেখানে ইটালীয়রা গাদাগাদি করে বাস করে, রোজগারের ধান্দায় যত্রতত্র ঘোরে। ইটালীয় উচ্চারণে তারা ইংরেজী বলে, পাড়ার ইংরেজ স্কটদের দেখে করুণার চোখে। জীবন যাত্রার উচ্চমান নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ব্রান্সউইকের ইটালীয়দের কিন্তু প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের জন্য খুব একটা গর্ববোধ নেই, বারোসার জার্মানদের মত তারা কোন আদর্শের জন্যও দেশত্যাগ করে নি—নিছক পেটের দায়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল।

বারোসার তালুন্দায় একটি ব্রাণ্ডি তৈরীর কারখানা দেখলাম। মারে নদীর উপত্যকা থেকে শুরু করে বারোসার মাঠ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের এন্তার আঙুর এসে জড় হচ্ছে পেশাই কলের সামনে। রোজ চার হাজার মন আঙুর থেকে যন্ত্রে-নিংড়ানো রস হরেক রকম কলের পর্যায়ে চোলাই হয়ে ব্র্যাণ্ডি-ঘরে গিয়ে জমছে। লরী থেকে পেশাই কলের মুখে ঝুড়ি ঝুড়ি আঙুর নিক্ষেপের সময় হাঁ করে চেয়ে রইলাম। আমাদের চোখে এই দৃশ্য যে কত দুর্লভ। মদ তৈরীতে যে সত্যি এত টাটকা আঙুরের দরকার হয় তাই বা কি করে জানব? অবশ্য আমাদের দেশেও মদ্য তৈরী হচ্ছে। অনুমান করি, সেখানে চোলাইকারীরা আঙুরের সঙ্গে ডুমুর আর ডাবের রস মিশ্রনের ফিকির করে না—কারণ দ্রাক্ষারস-শোধিত অমৃতের সেবকরা গোবিন্দদাস শ্রেণীর জীবের চাইতে উঁচুতলার লোক।

বারোসার থিয়োডোর গেকীর সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন ব্যাভেরিয়া থেকে। গেকীর মত বারোসাবাসী ব্যাভেরিয়া সাইলেশিয়া এবং প্রাশিয়ার লোকেরা এখন সগর্বে বলেন—আমরা

অস্ট্রেলিয়ান। অবশ্য তাঁরা জার্মান ধরণেই বাড়ি করেন, জার্মান কৃষ্টি অতি আদরে পোষণ করেন। লক্ষ্য করেছিলাম, চার পাঁচ পুরুষ অস্ট্রেলিয়া-বাসের পরও কিন্তু ইংরেজীর উচ্চারণে তাঁরা জার্মান টানটি তোলেননি, শুওরের মাংসের সসেজ-প্রিয়তা তাঁদের একটুও কমে নি। প্রবাসী বাঙালী কি আর সহজে ভোলে মাছ ভাত লক্ষ্মীব্রত শারদীয়া পত্রিকা, সহজে কি আর রপ্ত করতে পারে অবাঙালী ধরণে ভ'র উচ্চারণ?

ডাঃ রজার টুইসনার নামে এক বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ১৯৪১ সালের একটি পত্রিকা বের করে দেখালেন। বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে এডিলেড থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত। বারোসা ভ্যালীর জার্মান লোকদের অভিযুক্ত করে তার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছিলেন—'এরা সবাই হিটলার ভক্ত এবং হিটলারের অনুকূলে গোপন সমর সজ্জায় রত'। সেদিনের বারোসায় দারুণ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সবাই কিন্তু প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে বারোসাবাসীদের অস্ট্রেলিয়া-প্রীতি কারও চাইতে কম নয়।

ডাঃ টুইসনার মনে প্রাণে অস্ট্রেলিয়ান। তবে এখন তাঁর একটি মাত্র দুর্বলতা আছে। জার্মান নামের দুর্বলতা। তাঁর মতে প্রাচীন দিনের জার্মান নামগুলি ঝঙ্কারময় এবং কাব্যময়। ওজনেও ভারী। অথচ ডাকতে কুশী লাগে না। টুইসনার নিজের মেয়ের নাম রেখেছেন উইল হেলমিনা। তবে জার্মান রক্তের উইল হেলমিনারা আমাদের বাঙলাদেশের আধুনিকা মীনা সেন নোড়া শীলের মত মোটেই নয়, যে আগের দিনের মীনাক্ষীরা সুযোগ পেলেই বলবে—যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া!

ডাঃ টুইসনারের সঙ্গে আলাপে বর্তমান জার্মানীর কথা উঠল, এডুনোয়ার এরহার্ড প্রসঙ্গও বাদ গেল না। যে পশ্চিম জার্মানীকে বৃদ্ধ এডুনোয়ার আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন সে হচ্ছে ধ্বংসস্তূপের জার্মানী, সাতচল্লিশের ভারতবর্ষের মত খণ্ডিত—খাদ্য বস্ত্র জ্বালানী বেকারী রেফুজী সমস্যাকীর্ণ জার্মান জাতির কঙ্কাল। বিদায়কালে যে জার্মানীকে তিনি অর্থমন্ত্রী ডাঃ এরহার্ডের হাতে তুলে দিলেন, সে হচ্ছে সুস্থ, সুখী, সুন্দর জার্মানী—যার আর্থিক কাঠামো গঠনে অর্থনীতি শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এরহার্ডের অসামান্য দান রয়েছে।

এরহার্ড কিন্তু ব্যাভেরিয়ার লোক। আমরা যে দৃষ্টিতে এরহার্ডকে দেখি তেমন দৃষ্টিভঙ্গী বারোসাবাসী ব্যাভেরিয়ান অথবা অন্য জার্মান

লোকদের নয়। এডুনোয়ার এরহার্ডকে নিয়ে বারোসাবাসীদের যে কিছুমাত্র গর্ববোধ আছে তাও মনে হল না। হোলটে-গিন্নীর ভূতপূর্ব স্বামীর চিকিনীপরা পুত্রবধূদের সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে প্রধানমন্ত্রী হোলটের সন্তরণের কথা আলোচনা করতেই তাঁরা বোধহয় বেশী পছন্দ করেন।

মিঃ ম্যাককিনলে মাঝে মাঝে বারোসায় এসে খুবই খুশি হন—হয়ত বারোসার ইয়ালুম্বা মদ আর আঙুর বনের সমারোহের জন্য। বারোসার লোকেরা যে জার্মান সে কথা তাঁর কাছে তেমন কোন বিশেষ অর্থও বহন করে না। কিন্তু কন্যাটি তাঁর মনে-প্রাণে ষোল আনা জার্মান। জার্মান ভাষা, জার্মান আচার, জার্মান কেতা তার নিখুঁতভাবে রপ্ত করা। সেও সুযোগমত বারোসার তানুন্দা নুরিউপ্তা এঙ্গাস্টনের বনে বনে ঘোরে, তানুন্দার বহুখ্যাত লোক সঙ্গীত শোনে।—সেই সঙ্গীতের মধ্যে আছে প্রাচীন সাইলেশিয়ার সুরছন্দের ঢেউ। মিঃ ম্যাককিনলের মতে মেয়েটি আসলে কাঠখোট্টা ধরণের জার্মান—যুদ্ধের খবরে তার ঔৎসুক্য, যন্ত্রচর্চায় তার আনন্দ, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁর আগ্রহ। আমি কিন্তু শুনে অবাক হলাম, প্রাকবিবাহ জীবনে সে ছিল নার্স, যে কাজের সঙ্গে যুদ্ধ, যন্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রের কোন যোগই নেই। এমন কি মেয়েটি নিজে নির্বাচন করে ভালবেসে যাকে বিয়ে করেছে সে জার্মান নয়, ইংরেজ নয়, ডাক্তার এঞ্জিনীয়ার দর্শনের অধ্যাপকও নয়—একজন ইটালীয় ফার্মার। সিডনি শহরের তিন শ' মাইল দূরে ডেয়ারী ফার্মারের বৌ হয়ে ম্যাককিনলে-নন্দিনী এখন দিব্যি আনন্দে ঘর সংসার করছে। উইমেন আর ফানি!

পনেরো

রবার্ট টাউন্‌স অস্ট্রেলিয়ার এক স্মরণীয় মানুষ। এগার বছর বয়সেই সমুদ্র, জাহাজ, আর দূর দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৮১৪ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে নিজে একটি জাহাজ কিনে তিনি অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে কনভিক্‌ট পারাপারের ভার নেন। সেই সূত্রেই তাঁর উত্তর জীবনের ঐশ্বর্য, আর সেই সূত্রেই অস্ট্রেলিয়ার পশম শিল্পে নতুন যুগের সূচনা।

সিডনি থেকে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে লণ্ডনে জাহাজ ভিড়িয়েই যুবক ক্যাপটেন রোমান্টিক মেজাজে লণ্ডনীয়াদের কাছে গল্প

করতেন। অস্ট্রেলিয়ার পশম মাংস ক্রয়ের গল্প। এই নতুন দেশের গল্প সবাই অবাক হয়ে শুনত ; ঠিক একদিন যেমন তারা ক্যাপটেন কুকের কাছে শুনেছিল সমুদ্র অভিযানের গল্প। লণ্ডনবাসীদের তখনও ধারণা, টাউন্‌সের গল্পের অসামান্যতা শুধু তাঁর বলবার কায়দায়—আরও কিছু গুরুত্ব যে তার থাকা সম্ভব সে কথা তেমন করে কেউ ভাবে নি। ১৮৩০ সালে একটু ব্যতিক্রম ঘটল। ক্যাপটেন টাউন্‌স যাত্রীবাহনের বদলে এক জাহাজ পশমের পণ্য নিয়ে এসে লণ্ডনে নোঙর করলেন। ইংলণ্ডবাসীরা অবাক হয়ে ভাবল, যে দেশে এমন পশম উৎপন্ন হয় সে ত ছেলেখেলার স্থান নয়। অস্ট্রেলিয়া-যে কয়েদীর উপনিবেশ সে ধারণা বদলে যেতে লাগল। ইংলণ্ডের শিল্পপতি-দের মধ্যে আলোড়ন শুরু হল। অনেকেই অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে মেষপালন করতে সিদ্ধান্ত করলেন। ক্রমে অস্ট্রেলিয়াতে স্বাধীন মানুষ আগমনের যে সাড়া জাগল, সোনার খনির আবিষ্কারে তাই শেষ পর্যন্ত চরমে উঠল। খাস অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও তখন পশম শিল্পে যুগান্তর আনয়নের চেষ্টা চলছিল। ক্যামডেনের ম্যাক আর্থার তার পুরোধা ছিলেন। আজ অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত আয়ের চল্লিশ ভাগের উৎস হচ্ছে পশম শিল্প। ক্যাপটেন টাউনসের কাছে আজ অস্ট্রেলিয়ার অনেক ঋণ।—অশেষ ঋণ ক্যাপটেন ম্যাক আর্থারের কাছেও। কুইন্‌সল্যাণ্ডের টাউন্‌সভিল বন্দরটি এখন ক্যাপটেন টাউনসের নামের স্মৃতি বহন করে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ার দুই ডলারের নোটে ক্যাপটেন ম্যাক আর্থারের প্রতিকৃতি মুদ্রণ করে তাঁর ঋণ স্বীকার করার ব্যবস্থাও বাদ যায় নি।

টিমারু উলাউরা অঞ্চলে একটি মেষচারণ তালুকের নাম। মেলবোর্নের দেড়শ মাইল পশ্চিমে উলাউরা। অদূরে ছোট শহর মেরুণা। পশমের কারবারটিকে একেবারে গোড়া থেকে দেখবার জন্যেই আমরা উলাউরায় গিয়েছিলাম। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাবার আগে মেরুণায় এসে মনে হল, যেন কি একটা নতুন জিনিস দেখলাম। যেন মেরুণা পার্থিব জগতের কোন স্থান নয়। সেখানে ডাকঘর আছে, টেলিভিসন আছে, ঘরে ঘরে মোটর গাড়িও আছে। তবু মনে হল, সাগর পাহাড় নদ নদীর দূরে নিঃসঙ্গ মেরুণা যেন একঘরে হয়ে পড়ে আছে—কেউ তাকে ভালবাসে না, চিঠি লেখে না ; কেউ তার খোঁজও করে না।

অস্ট্রেলিয়ার বড় শহরগুলির অবস্থান প্রায়শ নদীর তীরে, নয়ত বা সমুদ্রের

ধারে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই সে নদী লোনা জলের প্রবাহ মাত্র—সমুদ্রই সরু হতে হতে এমনি ক্ষীণ প্রবাহ নিয়ে অন্তর্দেশে ঢুকে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্দেশীয় শহরগুলির মধ্যে ব্যালারাট বৃহত্তম। ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণখনির প্রথম আবিষ্কার মেলবোর্ণের ষাট মাইল উত্তর পশ্চিমের এই ব্যালারাটে। ব্যালারাট গোল্ড-রাশের শহর। মেরুনার তেমন কোন জন্ম-ইতিহাস নেই। তবু ব্যালারাটের সঙ্গে তার অশেষ মিল, একটি দীর্ঘলয়ের অন্তর্দেশীয় মিতালীর মত—যা সিডনি মেলবোর্ণের আন্তর্জাতিক পরিবেশে কখনই চোখে পড়ে না। ব্যালারাটে আজ খনির কাজ বন্ধ, স্বর্ণযুগের সে তৎপরতাও নেই। তবু কারও স্বর্ণদ্যুতিময় ঐশ্বর্যের কিছু মাত্র কমতি আছে বলে বোধ হল না। শহরের মধ্য দিয়ে উলাউরার দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম, রবিবারের বেলা দশটার সকালে একটি মাত্র যাত্রী নিয়ে একখানা ট্রামগাড়ি ছুটে চলেছে। হয়ত সবে মাত্র সবার ঘুম ভেঙ্গেছে। রাজপথে একটি পদচারীও নেই। ওক বীচ ইউক্যালিপটাসের পাতাঝরা আবর্জনাও নেই। রাস্তার বাঁদিকে দেখলাম অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম অন্তর্দেশীয় হ্রদ। তার নীল জলে পঞ্চাশ বছরের পুরানো পার্শ্ব-চক্র একটি প্যাডেল স্টীমার দর্শনীয় বস্তু হিসেবে নোঙর করে রাখা হয়েছে। হ্রদের তীরে তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো হাঁসের দল—পঞ্চাশ হাজার লোকের ব্যালারাটে নির্ভাবনার ছুটির দিনে আহার বিহারের আনন্দে একমাত্র ব্যস্ত জীব।

অস্ট্রেলিয়ার শহরে শহরে খালি বাস খালি ট্রাম খালি ট্রেন কিন্তু মোটেই অভাবনীয় নয়। এমন কি জনবহুল মেলবোর্ণ থেকেও আপিস সময়ে ইলেকট্রিক ট্রেন উপনগরের দিকে ছুটে চলে জন কয়েক যাত্রী নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ায় সরকারী তহবিলের টাকা দিয়ে পরিবহন খাতে বাৎসরিক লোকসান পূরণ করতে হয়। যাত্রী না হলেও টাইম-টাইম ত গাড়ি চালনা বন্ধ করার উপায় নেই।

ব্যালারাটের শহর সীমা ছেড়ে যাওয়ার আগে একটি ঐতিহাসিক দুর্গ চোখে পড়ে—নাম তার ইউরেকা স্টকেড। স্বর্ণযুগের অস্ট্রেলিয়ার নানা অঞ্চলে জন কয়েক পুলিশের লোক নিজেদের মর্জিমত শাসনের কাজ চালাত, গায়ের জোরে অসহায় মানুষের সোনার ভাগ কেড়ে নিত। জন কয়েক হৃদয়বান লোক তখন বিদ্রোহ করলেন। ইউরেকা স্টকেড হল বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। মেলবোর্ণের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চেতনার

উন্মেষ ঘটেছিল আসলে সোনা আবিষ্কারের পর থেকে। তারই সূত্রপাত ব্যালারাটের মাটিতে, পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে ইউরেকা স্টকেডের দুর্গযুদ্ধে।

টিম স্টোন এবং পত্নী রুথের যুগ্ম নামে টিমারু তালুক, তারই একপ্রান্তে টিমদের ঘরবাড়ি। তিন মাইলের মধ্যে অন্য কোন জনমানবের আবাস নেই। ভাবছিলাম, এই সুবিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের একটি বাড়িতে জনকটি মানুষের কেমন করে বা দিন কাটে। অবশ্য এদের কাছে দিন কাটাবার সমস্যা নেই। মিঃ স্টোন সারাদিন ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে মাঠে কাজ করেন, ঘড়ি ধরে বাড়িতে এসে শহরের লোকের মতই খানা খান, সন্ধ্যায় স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ঘরে বসে টেলিভিশন দেখেন। স্টোন পরিবারের সবাই ডেয়ারী ফার্মারদের মত শাওয়ারে স্নান করেন, ফোনে কথা বলেন—তাঁদেরও মাঠজোড়া বসত বাড়ির আশে পাশে আপেল আঙুর কমলালেবুর গাছ ফলে ফলে ভরে আছে।

মেলবোর্ণ থেকে আমরা সেদিন পাঁচজন প্রাণী গিয়েছিলাম টিমারু ভবনে। লাউঞ্জে বসিয়ে মিসেস স্টোন জিজ্ঞেস করলেন কার কোন পানীয় পছন্দ। মিনিট দশেক পরে হরিণীর মত ত্রস্ত এক কিশোরী পাশের কক্ষ থেকে ছোট্ট ট্রলি ঠেলে পানীয়ের সরঞ্জাম নিয়ে লাউঞ্জে ঢুকল। পরণে তার কালো রঙের সরু পাতলুন, গায়ে তার সঙ্গে ম্যাচ করা ফুল-হাতা ব্লাউজ। খালি পা। মিসেস স্টোন মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন —ইটি আমার কন্যা ডোরিন। ডোরিন কপালের উপর লুটিয়ে পড়া এক-গুচ্ছ রেশমী চুল মাথার পেছনে হটিয়ে সংাস্যে বলল—হ্যালো!

বীয়ার হুইস্কি টাটকা কমলালেবুর রসে চুমুক দিতে দিতে গল্প শুরু হল। কোন গুরু গম্ভীর আলোচনা হল না, গেলাস-ঠোকা পানীয় সভার তাল-বেতাল রাগিনীও সৃষ্টি হল না। জানালার পাশে কমলার বনে তখন হলুদ বরণ অজস্র ক্ষুদ্র পৃথিবী ঝুলছিল, ফুলন্ত আপেলের গাছগুলি সামান্য হাওয়ায় দুলছিল, ইউক্যালিপটাসের অদূর অরণ্য থেকে টাটকা তেলের কড়া গন্ধ আসছিল। চারদিকে ভারি একটি বনজ আমেজ।

প্রথম জীবনে টিম স্টোন নাবিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৌবাহিনীর কাজ করে যুদ্ধশেষে ভর্তি হয়েছিলেন কৃষিবিদ্যালয়ে। দুই বছর শিক্ষা লাভের পর এক বছর হাতে কলমে কাজ করলেন একটি মেষচারণ ফার্মে। তারপর ওয়ার সার্ভিস ল্যাণ্ড সেট্‌লমেন্ট স্কীমের

কর্তৃপক্ষের কাছে জমির জন্ম দরখাস্ত করলেন। অনতিবিলম্বে নয়শ' একর জমি, তিনশ' চৌদ্দটি ভেড়া এবং নগদ বিশ হাজার টাকা পেলেন। জমির মূল্য নির্দ্ধারিত হল এক লক্ষ টাকা, পঞ্চাশ বছরের মেয়াদে সহজ কিস্তিতে পরিশোধনীয়। এই জমি পেতে টিমকে আপিসে আপিসে ধর্ণা দিতে হয় নি, লালফিতাবন্ধন শিথিল করতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করতে হয় নি। বিশ হাজার টাকা থেকে কিছু অংশ আমলা গোমস্তাদের দিতে হয় নি। আরও আশ্চর্যের কথা, জমি মঞ্জুর হওয়ার আগে প্রতিবেশী ভদ্র সন্তানরা জমি-আপিসে বেনামী চিঠি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে নি যে টিম নামে লোকটি সরকারী সাহায্য পাওয়ার অযোগ্য!

উলাউরা অঞ্চলে টিমের মত সরকারী সাহায্য পুষ্ট আরও কৃষক আছেন। সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকে মেষচারণের ক্ষেত্র হিসেবে কতগুলি স্টেশনে ভাগ করা হয়েছে। এরই একটির নাম বারামপীপ, টিমসহ এগার ঘর কৃষকের সেখানে বাস। সবাই প্রাক্তন নাবিক, সৈনিক বা বৈমানিক।

টিম স্টোনের তালুকে মোট ভেড়ার সংখ্যা চার হাজার। ছ'মাস বয়স না হলে ভেড়ার পশম কাটা চলে না। বছরে মাত্র একবার পশম কেটে ভেড়া পিছু আট থেকে ষোল পাউণ্ড পর্যন্ত পশম মেলে। মাত্র চার বছর পশম কাটার পর কশাইয়ের কাছে মাংসের দামে ভেড়াগুলিকে বিক্রী করে দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে চতুরবর্ষ বয়স্ক এমনি সব ভেড়ার মাংসই দুনিয়াময় চালান হচ্ছে।

টিম স্টোন মোটর গাড়ি নিয়ে মাঠময় ঘুরে ঘুরে নয়শ' একর মেষচারণভূমি দেখালেন। সঙ্গে ছিল একটি ভেড়া-তাড়ানো কুকুর, নাম তার ববি। ডেয়ারী ফার্মের মত মেষচারণেও কুকুরের কাজ একই। প্রভুর নির্দেশে ববি এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে, অল্প ঘাসের জমি থেকে অনেক ঘাসের জমিতে তাদের তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল আর ঘন ঘন আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, আমরা তারিফ করছি কিনা হয়ত সেই কথাটি বুঝে নেবার জন্য। ববি বেশ ধরে ফেলেছিল আমরা আগন্তুক; এদৃশ্য আমাদের কাছে অভিনবই ঠেকছে!

জন নামে টিমের একজন সহকারী আছে। পঞ্চাশ বছর বয়স। ব্যাচিলার—চেষ্টা করেও নাকি জন বউ জোটাতে পারে নি। টিমের জমিতে নিজের এক ছোট ঘরে সে বাস করে, রান্না করে খায়, আর অল্প লাভের অংশীদার

হিসেবে পশম কাটার কাজ করে। বৈদ্যুতিক কাঁচি চালিয়ে জন মহোৎসাহে পশম কাটার কাজ দেখাল এবং তার আগে পরে বার দশেক প্রায় মুখস্থের মত বলল—অস্ট্রেলিয়াতে তোমাদের স্বাগত জানাই, উলাউয়াতে তোমাদের স্বাগত জানাই, টিমারু ভবনে তোমাদের স্বাগত জানাই। পেছন থেকে ওর মাথার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে টিম বললেন—একটু ছিট আছে!

উলাউয়া অস্ট্রেলিয়ার অন্য অনেক অন্তর্বর্তী অঞ্চলের মতই শুষ্ক। আশপাশে জলের কোন উৎস নেই। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতও কিন্তু পনেরো ইঞ্চির বেশী নয়। সেজন্য অন্য কোন ফসল উৎপাদনের চেষ্টা না করে এই অঞ্চলের লোকেরা শুধু ঘাসের চাষ করে, মেষ পালন করে—জমিতে সুপার ফসফেট সার দেয়, আর প্রতি পাঁচ বছর পর পর ভাল ঘাসের বীজ ছড়ায়। বর্তমানে একর প্রতি এখানে চারটি করে ভেড়া চরে—পনেরো বছর আগে চরত মাত্র একটি। তখনও জমিতে সার দেওয়া শুরু হয় নি।

মাঠে মাঠে ঘাস দেখে ভেড়া দেখে ভেড়ার পালের পিছে পিছে ববির সঙ্গে ঘুরে টিমারু ভবনে যখন লাঞ্চ খেতে এলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বসত ঘরের এক কোণে ওয়াট্‌ল ইউক্যালিপের ছায়ায় গিয়ে প্লেট-হাতে সবাই দাঁড়ালাম। খান কত ইট গেঁথে সেখানে একটি উনোন তৈরী করা আছে। প্রমাণ পেলাম, বনভোজনের আয়োজন এখানে নতুন নয়। উনোনের 'পর লোহার একটি জাল রেখে কাঠের আগুনে ভেড়ার মাংস ঝলসানো হল। বার-বিকিউড ল্যাম্ব চপ—সঙ্গে ডিমসেদ্ধ, লেটুস, টমাটো। জলের বদলে কমলার রস, শ্যাম্পেন, ক্ল্যারেট ব্রাণ্ডি। ঘাসের উপর বসে কোলের উপর প্লেট রেখে দুপুরের ক্ষুধার গ্রাস তুলতে তুলতে মনে হল, মচ্ছোব খাচ্ছি।

খাদ্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে হিটার কুকার টোস্টার কত কিছুই চলছে। এখন আবার আমেরিকা থেকে রান্নার এক নতুন আইডিয়া এসেছে। মোটর গাড়ির বনেটের নিচে ব্যবস্থামত ছোট্ট চুল্লীতে রান্না চাপিয়ে আশী মাইল বেগের গাড়িতে গন্তব্যে পৌঁছে গরম গরম ল্যাম্ব চপ দিয়ে ডিনার খাওয়া যায়। রান্নার এমন যুগান্তরের মধ্যে বনভোজন ত সময়ের অপব্যয় মাত্র। তবু তাই মেনে নিতে হয়। মোটর চুল্লীর রান্নায় পেট ভরে, মচ্ছোবের ফলার খেতে বনভোজন চাই।

আজ লোক বেড়েছে, লোকের চাল বেড়েছে। আগে যে কৃষকের মাত্র শ'দুয়েক ভেড়া ছিল, তার থাকা খাওয়ায় আজকের মত রাজসিকতা ছিল

না; তার মোটরগাড়ি থোলাইকল টেলিভিশন ছিল না—নিমেষে ফ্রেজার থেকে বরফশীতল বীয়ার বের করে দশজন লোককে পরিবেশন করবার উপায় ছিল না। আজ তাকে আয় বাড়াতে হয়েছে। সুতরাং পাঁচ হাজার ভেড়া না থাকলেই বা চলবে কি করে? আজ একাই সে পাঁচ হাজার ভেড়া পালনের কাজ করে বলে কাজে তাকে 'স্পীড' আনতে হয়েছে, আর সেজন্য প্রবর্তিত হয়েছে কলের ব্যবহার, বিদ্যুতের ব্যবহার, নতুন নতুন চাষ প্রণালীর উদ্ভাবন। আজ সেই একই কৃষক একা তাই পাঁচ হাজার মেষপালকের বর্দ্ধিত আয় ভোগ করছে উন্নত প্রণালীর জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে। আর আমরা সেই মান্ধাতা আমলের গরু আর লাঙ্গলে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ জমি চাষ করছি। আমাদের পেটেও ভাত নেই, গরুর পেটেও ঘাস নেই। আমাদের দরিদ্র কৃষকের বৌ হিটার কুকারের কথা আজও শোনে নি। আম বাঁশ গাবের পাতা কুড়িয়ে দিনান্তে সে যখন রান্নার আয়োজন করতে যায়, তখনও হয়ত চালের যোগাড় হয় নি।

দেশে দেশে লোকে এখন অল্প সময়ে রান্না খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে, আর মাঝে মাঝে বনভোজন করে পুরানো দিনের স্বাদ গ্রহণ করছে। হয়ত এমন দিনও আসবে, যখন রান্নার পাট আর থাকবেই না। কাজের গতিবেগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে মানুষ তখন কি যে করতে চাইবে বলা শক্ত। হয়ত সংবাদপত্রে তখন হামেশা চোখে পড়বে—অমুক চন্দ্র অমুক তিন মাস মঙ্গল মুলুক সফর করে আজ তাঁর পৃথিবীর বাড়িতে ফিরে এসেছেন। জানি না তখন সংবাদপত্রের পাট চুকিয়ে খবর সংগ্রহের জন্য নতুন কোন ব্যবস্থা চালু হবে কিনা।

স্টোন পরিবারের সঙ্গে বনভোজন করতে করতে গল্প হচ্ছিল। সন্তানদের রূপগুণ নিয়ে মিসেস স্টোনের অশেষ গর্ব। তিন সন্তানের সবার ছোট ডোরিন। রূপ ত নয়, যেন আগুনের শিখা। মিসেস স্টোন বললেন—বড় মেয়ে লরাও খুব সুন্দরী। আর ছেলে জর্জ ত একেবারে রাজপুত্তুর। লরা মেলবোর্ণে থাকে, নার্সিং শেখে; যখন রাস্তায় বের হয়, তখন পাঁচজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাকি দেখে। মিসেস স্টোনকে বললাম—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রূপ দেখা কলকাতা শহরেও খুব দুর্ঘট নয়। সেখানেও রূপসীদের ট্রাম বাস থামানো রূপ আছে। এই সব শুনে মিসেস স্টোন ডোরিনের দিকে আবার তাকালেন, হয়ত তার রূপগুণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ

করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ খোলার আগেই ডোরিন বলল—মা, তোমার গেলাসে আর একটু ব্র্যাণ্ডি ঢালব?—বলেই নতুন বোতলের সন্ধানে ঘরের দিকে গেল।

তখন হু হু করে বাতাস বইছিল। উত্তুরে হাওয়া—দাবানল ছড়াবার যম। গাম গাছের অরণ্যে যখন আগুন লাগে, এই নিদারুণ হাওয়া তখন আগুনের শিখাকে বিতাড়িত করে শত শত মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দেয়। মাত্র বছর তিনেক আগে নাকি এমন আগুনের হলকা টিমদের বাড়ির সীমানা পর্যন্ত এসেছিল। ভাগ্যিস আর এগোয় নি।

টিমদের বাড়িতে কুকুর আছে, মুরগী আছে, ময়ূর আছে—কাকাতুয়া কোকোবারো প্লাটিপাসও আছে। বাড়ির বাইরে মাঠে মাঠে ভেড়া আছে। সেই ভেড়ার পালের একটি ভেড়াও কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় বাড়িতে ঢোকে না। বাইরে কেটে তার মাংস এনে ঘরে বসে সবাই খায়। টিমদের কিন্তু গরু নেই। এদের মতে গোপালনের সময়টুকু মেষপালনের কাজে লাগানোই নাকি বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া গরু রাখার যে অনেক সমস্যা—দুইবে কে?—বিশেষ করে শনি রবির ছুটির দিনে। মিঃ ও মিসেস স্টোন বললেন—আমরা ত আর ঘরে বসে থাকি না; ডোরিন আর ববিকে নিয়ে ওয়ারাম্বুলে চলে যাই। শুধু দুধ দোয়ার প্রয়োজনে ত আর সাপ্তাহিক ছুটির দুটি অমূল্য দিন নষ্ট করা যায় না।

মিঃ স্টোনকে জিজ্ঞেস করলাম—উলাউরা, বারামপীপ, ওয়ারাম্বুল নামগুলি শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে, এই দিকটাতে এককালে হয়ত আদিম অধিবাসীদের বাস ছিল। নয় কি? ঘাড় শ্রাগ করে নিতান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে টিম বললেন—হয়ত বা।

বিকেল বেলায় তাতিয়ুনের দিকে রওনা হলাম একটি বিচিত্র ফার্ম দেখতে। মিসেস কুপার নামে এক মহিলা-ফার্মার তার মালিক। স্বামীর মৃত্যুর পর ভদ্রমহিলা দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন, আর তখন বাধ্য হয়েই নিজের হাতে কাজ শুরু করেছিলেন ডেয়ারী ফার্মে এবং গমের চাষে। আজ তিনি সতেরো শ' একর জমির মালিক। চারদিকের মাঠের মধ্যে একটি সুউচ্চ টীলায় তাঁর সুদৃশ্য বাংলো। আমাদের দেশ হলে হয়ত জনমানবহীন প্রান্তরে এমন ধনবতী মহিলার ঘরে ডাকাত এসে কবে সব লোপাট করে দিত। আজ অস্ট্রেলিয়ায় তেমন ডাকাত নেই, ধনাধিকারীরাও ঘরের মধ্যে

গুপ্তধন রক্ষা না করে শুধু ব্যাঙ্কের হিসেবের উপর বুদ্ধিমানের মত চোখ রাখেন। বুশ-রেঞ্জারদের যুগ কেটে গেছে অনেকদিন আগে; ভুরভুরিয়া চক ভুমুণ্ডিমাঠের দুঃস্বপ্ন সেখানে আজ আর নেই।

মিসেস কুপারের কাজ কিন্তু শুধু তাতিয়ুনের মাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বহিঃ পৃথিবীর সঙ্গে আজ তাঁর যোগ সংযোগ গড়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ওয়াশিংটন মস্কো পিকিঙের কৃষি সম্মেলনেও একাধিকবার যোগ দিয়েছেন, ভারতদর্শন করেছেন বার তিনেক। উজবেকিস্তান ইউক্রেনের গমের চাষের কথা থেকে এলেন ভারতের কথায়; নয়াদিল্লীর অশোকা হোটেলের প্রশংসা করে বললেন—ওখানে কারি রাইস খেয়ে মনে হয়েছিল, সত্যি এমন খাবার আর হয় না।

মিসেস কুপার মহিলা সমাজের গর্ব। শনি রবিবারের বিকেলে দূর ও নিকটের কৃষাণবধূরা তাতিয়ুনে এসে মিলিত হন তাঁর বাড়িতে, তাঁরই মুখ থেকে দুটি কথা শুনবার জন্য। সেদিন এক-ঘর লোক জমেছিল, বীয়ার ব্র্যাণ্ডি দুধ—অতিথিদের রুচিমত ইতিমধ্যে সব দেওয়া হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে তিনি সামান্য একটু আলাপ করলেন, কাউকে পরে আলাপের আশ্বাস দিলেন। তারই এক ফাঁকে আলমারী খুলে একটি সার্টিফিকেট এনে আমাকে দেখালেন—ঐ অঞ্চলের সেরা ফার্মার হিসেবে পাওয়া সরকারী সম্মানের স্বীকৃতিপত্র। খ্যাতি যশ তাঁর অনেক জুটেছে, তাতিয়ুন থেকে ক্যানবেরা পর্যন্ত সে কথা অজ্ঞাতও নয়। তবু নতুন করে আরও কেউ তা জানুক, আরও একটু আগ্রহ দেখাক—এমনি একটি ভাব যেন মনের মধ্যে সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে। খ্যাতি প্রশস্তির প্রতি মানুষের এমনি দুর্বলতা—আত্মীয় বন্ধু পরিজন মিলে বার বার তা ভোগ করবার এমনি অশেষ স্পৃহা। সার্টিফিকেট আলমারিতে রেখে মিসেস কুপার আবার অতিথি আপ্যায়নে মন দিলেন। যখন দুধ বীয়ার কাজুবাদামের ট্রে বহন করে আবার ঘরে ঢুকলেন তখন কিন্তু মনে হল, এ যেন কলেজে পড়া খামারে কাজ করা দুনিয়া দেখা বিখ্যাত মহিলা নন—শুধুই মেয়ে মানুষ!

মেলবোর্নে ফিরে এসে হাওড়ার প্রণব চৌধুরীর কাছে উলাউরার বনভোজনের গল্প করলাম। ঘাসের শোভা ফুলের বাহার মাংসল ভেড়া এবং আঙুর আপেল কমলালেবুর কথা বললাম। মিসেস কুপারের ঐশ্বর্য আর আতিথেয়তার বর্ণনা দিলাম। চৌধুরী মশাই অল্প মনোযোগে এত

বেশী কথা শুনে একটু খুশির মেজাজে বললেন—আজ বাড়ি থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। জোর খবর আছে মাইরী! আমি ভাবলাম—বিয়ের পর বছর—হয়ত ছেলে হওয়ার খবর এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম—বৌয়ের চিঠি বুঝি? ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ। সেদিন বাড়িতে অতিথি এসেছিলেন, আর সেই উপলক্ষে অনেক চেষ্টা করে দুটি ইলিশ মাছও পাওয়া গিয়েছিল। স্পষ্ট বুঝলাম, মেলবোর্ণ প্রবাসী প্রণব চৌধুরী চিঠি পড়ে খুবই প্রীত হয়েছেন। জানি না অতিথির প্রীতিভোজে ইলিশ পরিবেশনের খবরই একমাত্র তার কারণ কিনা। অস্ট্রেলিয়ার মাছ মাংস দুধের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে আমার নতুন করে কিন্তু খেয়াল হল, দুই দুটি ইলিশ মাছ আজ হাওড়ার মত শহরে একই দিনে সংগ্রহ করা সত্যি এক অসামান্য ব্যাপার; সাত হাজার মাইল দূরে আপনজনকে দেওয়ার মত একটি খবরই বটে!

যোল

গমের চাষ দেখতে গিয়েছিলাম জিরাল্ডটনে; এক বিশেষ ধরণে গমের চাষ—অল্প জল অল্প বৃষ্টির মাঠে গম চাষের এক নতুন কায়দা। গাছগুলি খুব ছোট, এ-জাতীয় সে-জাতীয়ের মিশ্রণে এক বিচিত্র বর্ণসঙ্কর। অল্প বৃষ্টিতেই মাঠে মাঠে গাছ গজায়, ফসল ফলে। বড় জাতের গম গাছ এই অঞ্চলে জন্মে না বলেই নাকি বিজ্ঞানসম্মত কৃষি গবেষণার শেষে এখানে এমন গম চাষের প্রবর্তন হয়েছিল।

জিরাল্ডটন ছোট জায়গা। গাছপালা প্রায় নেইই। লোক সংখ্যা বারো হাজার। সামনে ভারত মহাসাগরের নীল জল। একটু এগোলেই দেখা যায় ধূ ধূ করা প্রান্তর, বালুগর্ভ ভূমি, উপলময় মাঠ যেন একেবারে শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে আছে—আর মাঠের উপরে মেঘহীন আলোকোজ্জ্বল আকাশের মধ্যে একটি গভীর নৈরাশ্যের ভাব স্তব্ধ হয়ে আছে। রোদের চেহারাতে সকাল বিকেলের পার্থক্য একেবারে নেই। মেঘে মেঘে বেলা হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না এখানকার আকাশে আকাশে।

জিরাল্ডটন অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যে দশ ইঞ্চির বেশী নয়, সে কথাটি বোধ হয় রাস্তার গুলিখেলা ছোকরাও জানে। আর শুধু জিরাল্ডটন নয়, বৃষ্টিপাতের হিসাব সারা অস্ট্রেলিয়ায় সবারই যেন মুখস্থ। এই অঞ্চলটিতে আট দশ মাইল দূরে দূরে এক একজন কৃষকের হাজার

দুই হাজার একরের খামার আছে। জমি এখানে উর্বর নয়, দুই ফসল তিন ফসলেরও নয়; তবু গমের চাষ করে যে পরিমাণ পয়সা মেলে তা হাজার দু হাজার একর জমির পক্ষে অপ্রতুল হলেও একটি কৃষকের অতুল সম্পদ। বেশীর ভাগ কৃষকই চাষের জমির পাশে পাশে বাড়ি খাড়া না করে জিরাল্ডটনের শহরাঞ্চলে বাস করে, গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি থেকে জমিতে গিয়ে কাজ করে। এই কৃষকেরা কলে জমি চাষ করে, কলে গম কাটে—মাঠের মধ্যেই কলের কায়দায় গম-মলনের পর লরী ভরে সোজা চালান দেয় জিরাল্ডটনের জাহাজ ঘাটায়। বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে সেই গম।

জিরাল্ডটনের শুষ্ক করুণ ধূসর মাঠে গম ছাড়াও আরও সম্পদ আছে। লোহা। উপকূল বরাবর বারো শ' মাইল উত্তর পর্যন্ত নবাবিষ্কৃত লৌহখনির বিস্তার। আগামী দিনের অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক জগতে যুগান্তরের জয়তোরণ রচিত হতে চলেছে এই খনিজ সম্পদে।

জিরাল্ডটনের আসল গর্ব কিন্তু গম নয়, লৌহ নয়—গলদা চিংড়ি মাছ। অস্ট্রেলিয়ানরা বলে ক্রে ফিশ। উপকূলের রেখা থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে এই রঙীন গলদা চিংড়ির উৎস সোনার খনির মত ছড়িয়ে আছে। শ' দুয়েক মোটর বোট রোজ সকালে সাগরে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসে নাউ ভরা মাছ নিয়ে। আমেরিকার বাজারে এমন প্রতিটি গলদা চিংড়ির দাম তিন টাকা। গম লৌহ ক্রে ফিশের অঢেল সম্পদের মধ্যে এই জনপদের সব মানুষই ঐশ্বর্যবান।

জিরাল্ডটনের দক্ষিণে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া রাজ্যটির মহাসম্পদের অন্য একটি দিক চোখে পড়ে। দক্ষিণের জমি অনুদার নয়, প্রকৃতিও করুণাকরুণ নয়। সমুদ্র বরাবর পাঁচ ছ'শ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ক্রমশ ভাল ধরণের জমি —কোথাও বা উপকূল থেকে শ'চারেক মাইল পূব দিকে তার বিস্তার। এই দিকটাতেই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার যত সব ফল গম টাটকা সবজীর চাষ, যত ডেয়ারী ক্যানারী এবং গোচারণের কারবার।

ফ্রিম্যান্টেলের ফেব্রুয়ারীতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া গ্রীষ্মাবসানের দিন গুনছে। শরৎ আসন্ন। আকাশে বাতাসে একটি স্নিগ্ধ সুন্দর চাকচিক্য ছড়িয়ে আছে, একটি উদার অপার আনন্দের মত। শহরের পশ্চাৎপটে উচ্চ একটি পার্কে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ভারত মহাসাগর যেন অটল প্রশান্তিতে ধ্যানমগ্ন

—ফ্রিম্যান্টেল সমস্ত কোলাহল নিয়ে তারই তীরে স্তব্ধ হয়ে আছে। যদি কোন মিথ্যাবাদী তখন অভিনয় করেও বলত—এইখানে, অষ্ট্রেলিয়ার এই পশ্চিম সাগরতীরে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ বাণী দিক থেকে দিগন্তে সর্বপ্রথম উৎসারিত হয়েছিল, হয়ত তাকে বলতাম—তুমি মহাসত্য জেনেছ বন্ধু! সেদিন মনে হয়েছিল, ফ্রিম্যান্টেলের এই ঐশ্বর্য, নীলিমায় নীল সাগরের এই মধুময় রূপ যেন লোকে জন্ম জন্মান্তরে দেখতে পায়।

ভারত মহাসাগর থেকে, সমুদ্রের শান্তি, আকাশের আনন্দতান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে বাস্তবের মুখোমুখী হতে হল আব্দুল হকের সঙ্গে আলাপ করে। হক ফ্রিম্যান্টেলের প্রবাসী ভারতীয়। ষাট বছর আগে তাঁর বাপজান এইখানে এসে দোকান খুলেছিলেন। এন্তেকাল করার আগে হাওড়ার বাড়ি থেকে আব্দুল হককে এনে গদিতে বসিয়ে গিয়েছিলেন। সে ব্যবসায়ের এখন অনেক প্রসার হয়েছে, আগের চাইতে আরও অনেক বেশী অর্থকরী হয়েছে। জন তিনেক সহকারিণী এখন হক সাহেবের মাইনে নিয়ে দোকান করে—যন্ত্রে ওজন করে কলে হিসেব মিলিয়ে সওদা বেচে। আপিসের লোকের মতই তাদের বিকেল পাঁচটায় ছুটি—শনিবারে হাফ, রবিবারে মাফ। দু'বছর পর পর হক দেশে গেলে এরাই তাঁর হয়ে কারবার চালায়।

হাওড়া জেলার লোক হলেও হকের চেহারাতে একটি শেরই বাঙাল ছাঁদ আছে, স্বভাবে একটুখানি পূর্ববঙ্গীয় গোঁ আছে। তবে রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হলে ফজলুল হকের মত কুশলী জননেতা হতে পারতেন কিনা বলা শক্ত। ফ্রিম্যান্টেলের বণিক মহলে তাঁর একটি বিশেষ স্থান দেখে কিন্তু মনে হল, আপন ভোট কেন্দ্রে হক হয়ত সেই সুবিখ্যাত আবহাওয়াটি সৃষ্টি করতে পারতেন—থামু দামু নবাব সাহেবের, ভোট দিমু হক সাহেবরে!

হক সাহেবকে বললাম—অনেক পয়সা ত কামালেন। বিদেশ বিভূঁইয়ে একলাটি পড়ে থেকে বিবি ব্যাটাদের দিলে আর কেন চোট দিচ্ছেন? এবার দেশে গিয়ে কি একটা ব্যবসা ফাঁদলে হয় না? হক একেবারে ফোঁস করে উঠলেন—ক্ষেপেছেন মশাই, দেশে কি আর ব্যবসা করবার উপায় আছে? ক্ষুদে মুদিখানার মালিককে রাত দশটা পর্যন্ত সওদা বেচে তহবিল মিল করতে হবে, মালপত্রের স্টক মিলিয়ে বোর্ডে চক দিয়ে লিখতে হবে

কাল কতটা ছিল, আজ কত বিক্রী হল—কতটা রইল। এইসব কাজ আবার একা পেরে উঠবার উপায় নেই। সুতরাং সামর্থ্য না থাকলেও তাকে মুহুরী রাখতে হবে, সমস্ত কাজের সূক্ষ্ম হিসাবের জন্য ফাইল খুলতে হবে। ভোরের দোকানে স্টক লেখা না থাকলে ধর পাকড়ের ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হবে। শুধু কি তাই—হেল্‌থ্‌ অফিসার, এনফোর্সমেন্ট, পুলিশ আসবে। তাদের সঙ্গে হেসে কথা কয়ে চা-সিগ্রেট দিতে হবে, রীতিমত তাদের খাতির করতে হবে। নতুবা চাল চেক করতে এসে কোন কসুর না পেলেও এই মহাজন সাহেবরা ডাল সিজ করে চলে যাবে। এর উপর আবার ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা আছে। আপনি দুটো করে খাচ্ছেন দেখে বন্ধুর দল আয়কর আপিসে বেনামী চিঠি দিয়ে জানাবে, আপনার আয়ের সীমা নেই, সুতরাং নির্ঘাৎ ইনকাম ট্যাক্স বসবে। মজার কথা, পরের বছর কোন আয় না হলেও বার্ষিক চাঁদার মত কর দিয়ে যেতে হবে। এমনি শাস্তির মধ্যে দিয়ে দোকান করতে বলছেন? হক এমন ভাবে কথাগুলি বললেন, যেন পুলিশ, এনফোর্সমেন্ট আয়করের লোকেরা আমার পরামর্শেই চলে, আর তাদেরই একজনকে আজ একা পেয়ে তিনি মনের সুখে ঝাল মেটাচ্ছেন। হক হাঁপাতে লাগলেন। দেশের দোকানদারি যে এই পর্যায়ে নেমে এসেছে তার খুঁটিনাটি এই সুদূরে ত আমার জানার কথা নয়। তবু হকের অভিযোগে অস্বস্তিবোধ না করে পারলাম না।

সেদিন হক সাহেবের বাড়িতে দাওয়াদ খেলাম। মোগলাই মটন, চিকেন বিরিয়ানি, দৈ, পাঁপর ভাজা। হক অষ্ট্রেলিয়ায় থাকা খাওয়ার আরাম এবং আয় রোজগারের সুবিধা সম্বন্ধে অনেক কথা জানালেন। তারপর একটু থেমে বললেন—আমার অবশ্য থাকা খাওয়ার এখানে বড্ড বেশী খরচ পড়ে। বলতে পারেন, কি করে কমানো যায়? আমি তাঁকে চা বাগানের একটি চালু গল্প বললাম—দার্জিলিঙের চায়ের কারবারে বিলেতি সাহেবের গল্প। ছুটিতে দেশে গিয়ে সাহেব তাঁর ছেলেকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন কারবার দেখাশোনা করতে—বিশেষ করে তাকে বলে দিয়েছেন খরচ পত্র সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকতে। বাচ্চা সাহেব বাগানে এসেই প্রথমে কুলীদের নিয়ে পড়লেন; তাদের ডেকে ধমকের সুরে বললেন—তোমাদের খাওয়া খরচ বড্ড বেশী পড়ছে। এবার কমাতে হবে। কুলীরা করজোড়ে নিবেদন করল—হুজুর। বেশী পড়বে ক্যানে। আমরা ত দু-টাইম সেরেফ ডাল-ভাত খাচ্ছি। হুজুর

বিগড়ে গেলেন—কি দু-টাইম ডাল-ভাত খাচ্ছ? এখন থেকে এক-টাইম ডাল খাবে, এক-টাইম ভাত খাবে। হক সাহেব হাসতে লাগলেন।

বিদায় নেবার আগে কিন্তু অবাক হয়ে জানলাম, এমন মধুর ভেড়ার মাংসের দেশে হক প্রায়-নিরামিষাশী হয়ে বাস করছেন। মুর্গী মটন দৈবাৎ পাতে তোলেন মুখ বদলাবার মর্জি হলে। কারণ জানতে চাইলে তিনি অসঙ্কোচে বললেন—এখানে যে এম্-কে-মার্কা গোশত বেশী মেলে না। প্রশ্ন করলাম—সেটা কি পদার্থ? হক বললেন—মুসলমান কশাই যে সব গরু ভেড়া আপন হাতে জবাই করে শুধু তারই গায় ছাপ মারা থাকে এম-কে অর্থাৎ মুসলিম-কিল্‌ড। শুনে কি বলব ভেবে পেলাম না। হক অষ্ট্রেলিয়াতে আছেন আজ তিরিশ বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভারতবর্ষে, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং বহিঃ-পৃথিবীতে খাদ্যচিন্তা রাষ্ট্রনীতি, জন্মনীতিবোধে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এই তিরিশ বছরই হক সাহেব এম-কে মার্কা গোশ্‌ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম দিকটাতে কলোনী চালু হয়েছিল ১৮২৯ সালে। সোয়ান রিভার কলোনী। তারই বর্তমান নাম পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া। রাজধানী পার্থ্। সোয়ানের তীরে দাঁড়িয়ে আছে পার্থ্ শহর। ঘন চকোলেট রঙের জল এই অনতিদীর্ঘ রোমান্টিক নদীর—দূর থেকে দেখলে ভ্রম হয় যেন মনোহারী নীল। সুদানের রাজধানী খার্টুমের কাছে নীলনদের জলেরও এমনি চকোলেট রঙ, দূর থেকে দেখতেও এমনি মধুর নীল। সোয়ান নদীর আসল বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার কালো হাঁসের দলে। প্রথম দিনের অভিযাত্রীরা কালো হাঁস দেখেই নদীর নাম দিয়েছিলেন সোয়ান রিভার।

রাজধানী পার্থে বাস করেই লাট সাহেব আর মন্ত্রীরা রাজ্য শাসন করেন, সেইখান থেকেই সারা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কলকাঠি চলে। অথচ দেখলে মনে হয়, পার্থ্ যেন কত নিঃসঙ্গ, বারো মাইল দূরের ফ্রিম্যান্টেল গৌরবে ঐশ্বর্যে আভিজাত্যে তাকে আড়াল করে রেখেছে। পার্থ্ কলকাতার ডালহৌসির মত শুধুই আপিস-পাড়া। ফ্রিম্যান্টেল আপিস বাবদের বাসভূমি। পার্থে-ফ্রিম্যান্টেলের পার্থক্যটা হয়ত বালীগঞ্জ-টালিগঞ্জের মত। যত রকমের ছায়াছবি তৈরী হয়ে আসছে টালীগঞ্জের স্টুডিও থেকে। তবু আভিজাত্যের দাবী বালীগঞ্জের বেশী। বালীগঞ্জ ফিল্মী শিল্পীদের বাসভূমি।

অস্ট্রেলিয়ার সমাজ জীবনের বিবর্তন ধারায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। রাশিয়ার মত সেখানে বিপ্লব ঘটে নি, বিপ্লবের মাধ্যমে সকলের অবস্থাও এক

করতে চেষ্টা করা হয় নি।—রাশিয়ার মতও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি, যে পরিকল্পনা রূপায়ণে বড় ও ছোটকে সমান ভাবে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল। আবার ভারতের মত অ-বিপ্লবের শান্তি-নির্ঘোষিত পথে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেয়েও পঞ্চবার্ষিক প্রকল্প চালু করতে হয় নি, যার রূপায়নে সকলের দান সমান নয়—সকলের দামও অসমান। অষ্ট্রেলিয়া এগিয়ে চলেছে তার আপন বৈশিষ্ট্যের গণতান্ত্রিক ধারায়। ভারতের মত ভাগ হয়ে বার প্রদেশের লোকের অবহেলার ভার হয়ে সেখানে রেফুজী আসে নি। কালাপানির পারে আন্দামানে কয়েদ করার বৃটিশ প্রবর্তিত কারসাজির চাইতে বৃটেন থেকে বৃটিশ কনভিকট্ অপসারণের পার্থক্য অনেক। কয়েদী মানুষের আপন দেশের অনেক স্বাধীন লোকও অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছিল গরু ভেড়া নিয়ে, ফলফুলের বীজ নিয়ে।

ফ্রিম্যান্টেল থেকে চলেছিলাম আর্মাডেলের পথে। মধ্য পথে এক যুগোশ্লোভীয় কৃষকের ক্ষেতে আলুর চাষ দেখলাম। এক হাজার দেড় হাজার একরের ডেয়ারী বা মেষচারণের মত বড় নয়। মাত্র দশ একরের আলুর ক্ষেতি। তাতে কিছু গাজর চাষও চলে। মধ্য ক্ষেতে বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে পাতালের জল টেনে এনে আট দশ গজ পর পর বসান ধারা-যন্ত্রের যোগে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অল্প আবাদেই কৃষকটির চলে যাচ্ছে। তিরিশ বছর আগে যুগোশ্লোভিয়া থেকে অভাবের তাড়নায় এরা অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছিল। এখন অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু কৃষকটির বৃদ্ধা মায়ের মনে কোন শান্তি নেই। ফেলে-আসা দেশের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে বৃদ্ধা বললেন—যুগোশ্লোভিয়ার মত দেশ কি আর পৃথিবীতে আছে? সোনার দেশ। তাঁর নাতি নাতনীরাও অবশ্য অন্য অষ্ট্রেলিয়ানদের মত আর কিছু দিন পরেই বলবে—অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ কি আর পৃথিবীতে আছে?—সোনার দেশ।

সোয়ান নদীর কলোনী যখন চালু হল, তখন লোকসংখ্যা আর কতই হবে। প্রথম পঞ্চাশ বছর ঝিমিয়ে চলল। ১৮৯২ সালে কুলগার্ডিতে সোনা আবিষ্কার হল, ১৮৯৩ সালে হল কার্লগুর্লীতে। ভাগ্যান্বেষীর দল ছুটল পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার দিকে, যেমন করে স্বর্ণভিক্ষুরা একদিন ছুটেছিল মেলবোর্ন, বেণ্ডিগো, ব্যালারাটের দিকে। স্বর্ণযুগই আসলে অষ্ট্রেলিয়ার লোক বৃদ্ধির যুগ। যখনই সোনার কারবার কমে এসেছে, তখনই ঐসব অঞ্চলের লোক

গমের চাষ, ডেয়ারী, ফলের চাষ অথবা পশমেধ্ন কারবারের দিকে ঝুঁকেছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতেও তাই হল। সোনার খনির কাজে মন্দা চলতেই শুরু হল গমের চাষ। তিরিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যটি গমের উৎপাদন এবং রপ্তানীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করল।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিঘা প্রতি গমের ফলন কিন্তু খুব বেশী নয়—বর্তমান হিসেব অনুসারে মণ ছয়েক। অবশ্য এখন জোর চেষ্টা চলছে ক্যানাডা আমেরিকার বিঘা প্রতি ফলনের সমান করে তুলতে। বেশী পরিমাণ জমি গম উৎপাদনে ব্যবহার করা উচিত কিনা এখন আবার তাই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আশী লক্ষ টন বাড়তি গম বিক্রীর অপেক্ষায় গুদাম জাত ছিল। বাঁধা খদ্দের বাদেও তখন চীন এবং রাশিয়ার কাছে অনেক গম বিক্রী করা হয়েছিল। তবু পঁচিশ লক্ষ টন গম ছিল অবিক্রীত। এখন আবার তর্ক উঠেছে উৎপাদন কমাবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

কেউ কেউ বলছেন উৎপাদন কমান উচিত নয়। খুব বেশী শস্য দেশে উৎপন্ন হলে ক্ষতি কোথায়? চীন ছাড়াও এশিয়ার অনেক দেশই গম কিনবে। ওদিকে চীনের প্রসঙ্গেই কিন্তু উঠছে রাজনীতির প্রশ্ন। চীন যখন অষ্ট্রেলিয়ার গমের বড় খদ্দের, তার গোঁসা হতে পারে এমন কথা বলতে ব্যবসায়ী মহাল নারাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে গেছে। চীন কি চিরদিনই বিদেশ থেকে গম কিনবে? খাদ্যে স্বাবলম্বী চীন একদিন হবেই। ওদিকে ১৯৬৪ সালে পৃথিবীর নানা দেশে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতির সুযোগে গম বিক্রীর যে মওকা মিলেছিল, তাই কি আর চিরদিন মিলবে? সুতরাং 'উৎপাদন কমাও' গোছের একটি বণিকী আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। অবশ্য আরও একটি কারণ আছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা শতকরা বিশ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও গমের ব্যবহার বেড়েছে পনোরো ভাগ। কারণ লোক বৃদ্ধির হার বেশীর ভাগই অন্নভোজী অঞ্চলে। ওদিকে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় গমের ব্যবহার কমেছে শতকরা তিন ভাগ।

কোন কোন রাজ্যের আবার ভিন্ন ধরণের সমস্যা আছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বছর তিরিশ লক্ষ বিঘা নতুন জমি সংযোজন করা হচ্ছে। সেই সব জমির বাড়তি শস্যও ত আছে। তার উপর নানা পরিকল্পনার সাফল্যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। উত্তরের কিম্বার্লী প্রদেশে ওর্ড নদী নামে একটি নিষ্প্রাণ নদীখাত আছে। জল নেই। অথচ গ্রীষ্মের

বৃষ্টিতে এত জল জমে যে একদিনের জলে গোটা সিডনি পোতাশ্রয়টিকে ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই জল এতদিন গিয়ে পড়ত ভারত মহাসাগরে। এখন ওর্ড-নদী-পরিকল্পনা চালু হয়েছে। বড় বড় ড্যাম তৈরী হয়েছে। জলসেচপুষ্ট এলাকায় এখন ধান আখ তুলা তেল বীজ অপর্যাপ্ত উৎপন্ন হচ্ছে। ওর্ড নদীর ধানের চাল দেখে খুশি হয়ে সবাই বলছে—এশিয়াবাসীদের খাবার উপযুক্ত জিনিসই বটে। নিজেদের খাদ্যের ভাবনা নেই। তাই যখন কোন নতুন ভূমি চাষ যোগ্য হয়, তখন সবাই নতুন সমস্যার কথা ভাবে—এই শস্য এবার কোথায় রপ্তানী বা হবে! ওর্ড-নদী-পরিকল্পনা রূপায়ণের খরচ পঁচিশ কোটি টাকা অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাণীকে এনে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করতে আমরা যতটা টাকা খরচ করেছিলাম।

ভোগ প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে জীবনের গভীরে তলিয়ে দেখবার অবকাশ যেন অষ্ট্রেলিয়ানদের চাপা পড়েছিল। বহিঃ পৃথিবীর প্রতিও যেন তারা কিছুটা ছিল উদাসীন। আজ হাওয়া বদলাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐশ্বর্য শক্তি এবং সাহায্যের পরিচয় পেয়ে আমেরিকার প্রতি অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের যে শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল, আজ তাই উচ্চশিখরে। আজ অষ্ট্রেলিয়া জাপানকেও শ্রদ্ধা করে, চীনকে ভয় করে, ইন্দোনেশিয়াকেও উড়িয়ে দেয় না। আর ভারতবর্ষ? অষ্ট্রেলিয়ানরা বলতে শুরু করেছে—আমরা সাদা চামড়ার লোক হলেও এশীয়। ভারত আমাদের প্রতিবেশী। প্রশান্ত মহাসাগরের এই দিগন্তে প্রতি-চীনা প্রাচীর গড়ে তুলতে হলে ভারতের যে সুস্থ অস্তিত্বের প্রয়োজন, সেই ধারণা আরও দৃঢ় হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়াতে। ভিয়েৎনাম থেকে চীন, চীন থেকে গমের প্রশ্নে পার্লামেণ্টে বিতর্ক চলছে। সদস্যদের অনেকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—প্রতিবেশী ভারতের উপর শত্রুর খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে। অনাহারের ছিদ্রপথে সাম্যবাদের পতাকা-হাতে সেই শত্রু এগিয়ে আসছে। ভারতের পতন ঘটলে অষ্ট্রেলিয়া কি পারবে টিকে থাকতে? তাই অনেকে দাবী জানিয়েছেন—চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধন ছিন্ন হোক। চীনের কাছে গম বিক্রী স্থগিত রেখে সেই গম চালান দেওয়া হোক ভারতের পথে।

কিন্তু এখনও তা হয় নি। অষ্ট্রেলিয়া চীনের কাছে গম বিক্রী ঠিকই করছে।

সতেরো

গাড়ি থামিয়ে স্টিয়ারিঙে হাত রেখে মেরী বলল—এই হচ্ছে হসপিটাল বে। আর ঐ দেখ হিয়ন।

হিয়ন একটি নদীর নাম। টাসমেনিয়ার নদী। তার পার্বতী ধারা পাহাড় থেকে নেমে এসে মাঠের পর মাঠের শেষে বাঁকের পর বাঁক সৃষ্টি করে তর তর থর বেগে সামনে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে—যেন পেছনে ফিরে চাইবার একটুও সময় নেই। নীল নীল স্বচ্ছ জল হিয়নের। তার চলার তালে বাজে নূপুরের ছন্দ। মধুর গম্ভীর হিয়ন উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে আপেল বনের লাবণ্য, ইউক্যালিপটাসের অরণ্য, মেষচারণভূমির তৃণদল। দেখে দেখে কার চোখ না জুড়ায়।

১৮৩৩ সাল। লণ্ডন থেকে এক জাহাজ লোক রওনা হয়েছিল টাসমেনিয়ার ডারওয়েন্ট নদীতীরে হোবার্ট বন্দরের উদ্দেশ্যে। কনভিক্টের পরিবর্তে সে জাহাজে ছিল সব স্বাধীন মানুষ। ক্যাপটেন কিন্তু ভুল করে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ডারওয়েন্টের বদলে হিয়নের জলে। তারপর হোবার্ট বন্দর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কিন্তু খুবই ভাল লেগেছিল হিয়নের শান্ত সৌন্দর্য। তাই হোবার্টের কথা আর কিছুমাত্র না ভেবে সদলবলে অবতরণ করেছিলেন হিয়নের কূলে। দীর্ঘ পাঁচ মাসের যাত্রাবসানে নাবিকেরা তাঁবু খাটিয়ে পীড়িত যাত্রীদের স্থান করে দিয়েছিলেন হিয়নের তীরে। সেদিনের সেই জাহাজ যাত্রী আইরিশ লোকদের অবতরণ স্থানের নামই আজ হসপিটাল বে। অবশ্য এই ঘটনার অনেক আগেই কিন্তু হিয়ন উপত্যকায় উপনিবেশ গঠনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অপরাধীরা সেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিল তিল করে জীবন ক্ষয় করতে বাধ্য হয়েছিল—আর সে এমন এক যুগে, যখন সারা অস্ট্রেলিয়া টাসমেনিয়ায় ছিল শুধু আদিম অধিবাসীদের বাস। চাষ আবাদ নেই, খাদ্য পানীয় সংগ্রহেরও কোন ব্যবস্থা নেই। আজ হিয়ন উপত্যকায় অনেক মানুষের বাস। খাদ্যে পানীয়ে সুখে সম্পদে সবাই আজ নিশ্চিন্ত নির্ভয়। তাদের অনেকের ধমনীতেই বয়ে চলেছে আইরিশ রক্তের ধারা।

একদিন টেম্‌স নদী বেয়ে যে মেফ্লোয়ার জাহাজ খানা প্রথম আমেরিকা যাত্রা করেছিল উপনিবেশ স্থাপন করতে, তার যাত্রীরা ছিল সব অভিশপ্ত কনভিকটের দল—কঠোর রাজদণ্ডের নির্মম মার্কা মারা সব হতভাগ্য মানুষ। ধর্মের সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশের অপরাধে মেফ্লোয়ার যাত্রীর একটি বৃহৎ অংশ ছিল রাজার চোখে অপরাধী। তাদের সঙ্গে আরও চালান দেওয়া হয়েছিল লণ্ডনের অনেক ভবঘুরে, চোর, পকেটমার এবং রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া অনাথ অনাথিনীদের। ক্রমে আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে উঠল, বছরের পর বছর জাহাজ ভরে ভরে ইংলণ্ডের অপরাধীদের পাঠান হল সেই উপনিবেশে।

অদ্ভুত বিচারের মানদণ্ড তখন ইংরেজের রাজদরবারে। সামান্য একটি রুমাল চুরির অপরাধে সাত বছর, অথবা নয় পেনির পকেট কাটার জন্য আট বছরের কারাদণ্ডও এমন কোন কঠোর শাস্তি নয়। এমনি সব হতভাগ্য অপরাধী এবং অন্য অনেক নিম্ন শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীতে ইংলণ্ডের জেলখানা একেবারে ভরে গিয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস, এমনি সময়ে, ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রুখে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের বলল—তোমাদের কনভিক্‌ট লোকের স্থান আর আমেরিকায় হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় সমস্যা ঘনিয়ে এলো ইংলণ্ডে। কনভিক্‌ট অপসারণ সমস্যা।

তখন দিকে দিকে নিত্য নতুন দেশ আবিষ্কারের যুগ; ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার যুগ। ক্যাপটেন কুক ইতিমধ্যে সিডনির বোটানিবেতে অবতরণ করেছেন, দেশে ফিরে এডমিরালটিতে তাঁর প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানের বিবরণে নবাবিষ্কৃত অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কুকের সুপারিশের ফলেই অস্ট্রেলিয়াতে পরবর্তীকালে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তারপর ১৭৮৮ সালে ক্যাপটেন ফিলিপ লণ্ডন থেকে কনভিক্‌ট দল নিয়ে এসে সিডনিতে পৌঁছালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থামত সরকারী পরোয়ানায় জাহাজ-ক্যাপটেন থেকে গভর্ণর হলেন। সিডনির কথায় এই সম্পর্কে কিছু আলোকপাত আগেও করা হয়েছে। সিডনি থেকেই কিন্তু পরবর্তীকালে একদল কনভিক্‌টকে টাসমেনিয়াতে পাঠান হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে এই তথাকথিত কনভিক্‌টদেরই ইতিহাস। রাজার

কঠোর আইনে যারা সামান্য কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল, দেশের মাটিতে আর তাদের স্থান হয় নি। এমনকি দেশের মানুষ ছিল ছলে বলে কৌশলে তাদের বিদায় করে দেওয়ার ফিকিরে। আবার তারাই কিন্তু পনেরো হাজার মাইল দূরে এসে এই অপরাধীদের উপর খবরদারী করেছে তাদের শাসন করেছে যেন আমাদের সংস্কৃত শাস্ ধাতুর আক্ষরিক প্রয়োগে, কেবল শাস্তি দিয়ে দিয়ে। সেই অপরাধীদের শ্রমেই গড়ে উঠেছিল হিয়ন উপত্যকার আপেল বন, মেষ চারণের মাঠ, এবং ডেয়ারীর সম্পদ।

চার লক্ষ অধিবাসী নিয়ে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পার্বত্যময় দ্বীপ টাসমেনিয়া, উত্তর দক্ষিণে একশ' আশী মাইল। পূবে পশ্চিমে একশ' নব্বই মাইল। দূর থেকে দেখলে কিন্তু মনে হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের জলে একটি যেন হৃদপিণ্ড ভাসছে।

ওলন্দাজ অধিকৃত ব্যাটাভিয়ার গভর্ণর ভ্যান দিয়েমেন ১৬৪২ সালে ক্যাপটেন আবেল যানজুন টাসমানকে দক্ষিণ সাগর অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিনমাস পর এই পাহাড়ী দ্বীপটিতে পৌঁছে টাসমান তার নাম রাখলেন ভ্যান দিয়েম্যানস ল্যাণ্ড। টাসমানের পর ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ—কত সব প্রতিদ্বন্দ্বী এইখানে এসেছে। ক্যাপটেন কুকও টাসমেনিয়ার ভূমিস্পর্শ করেছিলেন তাঁর তৃতীয় ও শেষ অভিযানে, ১৭৭৭ সালে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে টাসমেনিয়া বৃটিশ অধিকারভুক্ত হল। তখনও এই দ্বীপের নাম ভ্যান দিয়েমেনের মুল্লুক। অপরাধী উপনিবেশের যুগে সেই নামের মধ্যে ছিল একটি বিভীষিকার ছায়া। ১৮৫২ সালে অপরাধী চালান করা চিরতরে বন্ধ হলে দ্বীপবাসীরা সকল দুঃস্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকু মুছে ফেলবার জন্য দ্বীপের নাম নতুন করে দিলেন টাসমেনিয়া। টাসমান ধন্য হলেন, টাসমেনিয়া হল ভুবন বিখ্যাত।

টাসমেনিয়া অস্ট্রেলিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য। মেলবোর্ণ বরাবর দুইশ মাইল সাগর জলের ওপারে টাসমেনিয়া দ্বীপের উত্তর উপকূল। হিয়ন তার দক্ষিণ দিগন্তে এক ছোট নদী। অস্ট্রেলিয়া-ইতিহাসের এক অতি করুণ অতি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল এই হিয়ন নদীর দেশটিতে। পারলৌকিক শান্তির কামনায় গঙ্গার তীরে তীরে হৃষিকেশ বারাণসী নবদ্বীপের ইতিহাস আমরা গড়েছি কোন্ সে প্রাচীন কালে। দক্ষিণ মেরুর হাজার দুই মাইল দূরে পার্বত্য টাসমেনিয়ার এই নির্জন দ্বীপে মাত্র দেড়

শতাব্দী আগে পনেরো হাজার মাইল দূর থেকে লোক এসে হিয়ন ভর্ডন ডারওয়েন্টের কূলে কূলে ইতিহাস গড়েছিল। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল পরলোক নয়, ইহলোকের সুখ সমৃদ্ধি। কোন গৌতম বুদ্ধের পদরেণু পড়ে নি হিয়নের কূলে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয়নি হিয়ন পুলিনে। টাসমেনিয়ার নবযুগ সাধকরাও হিয়নের কূলকে বারাণসীর সমতুল বিবেচনা করেনি। তবু সবাই কিন্তু ভালবেসেছে রূপময়ী হিয়নকে, পরবর্তী যুগের যে কোন আগন্তুকই ভালবেসেছে হিয়নের মানুষকে। হিয়নের ইতিহাস মানুষ গড়ার ইতিহাস।

হিয়ন উপত্যকায় যে কংক্রিটের পথে টাসমেনিয়া সুন্দরী মেরীর মোটরে অত্যন্ত আরামে ঘুরে অবাক হয়ে আপেল বনের সৌন্দর্য দেখছিলাম, সে-পথের প্রতি কঙ্কর কণায় মিশে আছে দেড়শতাব্দী আগের ইংলণ্ডের দ্বীপান্তরিত মানুষদের জল-হওয়া রক্ত, আর অতি গভীর দীর্ঘশ্বাস— পথের ধূলায় কান পাতলে আজও তাদের শেকল-বাঁধা হাতে পাথর ভাঙার শব্দ শোনা যায়।

টাসমেনিয়ার রাজধানী হোবার্ট। পাহাড়ী অবগুণ্ঠনের শেষে সাগরের সমতটে তার অবস্থান। হোবার্টের বর্ডারে দূর দুর্গম পাহাড়গুলি সবাইকে শুধু হাতছানি দেয়। কিন্তু হাতের কাছে লোনা জলের বাঁকে বাঁকে চিরুণী-চর্চিত মাথার মত মই-দেওয়া মাঠ, আপেল আঙুর গাছ, আর গাম গাছের বনগুলি যেন ডেকে কথা কইতে চায়। অস্ট্রেলিয়ার অন্য শহরগুলির তুলনায় হোবার্টের অনেক বয়স, অথচ দেখলে মনে হয় যৌবনের দীপ্তি তার একটুও ম্লান হয়নি। শ্যামবাজার, পার্কপল্লী, চৌরঙ্গীর কলকাতার মধ্যে চিৎপুরের মত হোবার্ট একটু রহস্যময়, তবে যাকে বলে অনেক বেশী ডিশটিঙগুইশড। টাসমোনিয়া অস্ট্রেলিয়ার অঙ্গ। হোবার্ট তার দেহসৌষ্ঠব। ডারওয়েন্ট নদীমোহানায় পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর বন্দর হোবার্টে এসেছিলাম সেপ্টেম্বরের শেষে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক জায়গাতেই তখন শীত শেষ হয়ে এসেছে। টাসমেনিয়াতে শীত আছে, তবে তার তেমন প্রখরতা নেই। দিনগুলি সোনার রোদে ঝলমল। আকাশ নীলোজ্জ্বল। দূরবর্তী ওয়েলিংটন পাহাড়টি বরফে বরফে শাদা হয়ে আছে। ডিসেম্বরের গ্রীষ্মদিনে মধ্য অস্ট্রেলিয়ার দিক দিগন্ত যখন মরুর হাওয়ায় তেতে ওঠে, টাসমেনিয়ার সারা দেহে দক্ষিণ মেরুর শীতল হাওয়া তখনও একটু করে

লাগে। আর ঠিক তেমনি মধুর দিনে হিয়ন নদীর উপত্যকায় আপেল ফলের উৎসব লাগে।

হিয়নের উপত্যকায় চলতে চলতে কিন্তু ভাবছিলাম, যখন পশ্চিমের অভিযাত্রীর দল নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে এসে শীতে অনাহারে রোগে মরেছে, বন্দী অপরাধীরা নির্মম যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে, আমাদের লোকেরা দারুণ উৎসাহে তখন সতীদাহ করেছে। আর টাকায় আট মন চালের ভাত খেয়ে পান-মুখে গড়গড়া টেনে দিবা নিদ্রা দিয়ে উঠে আলস্যে ঔদাস্যে বিধান দিয়েছে, গোরচনাই আত্মশুদ্ধির জবর দাওয়াই। পশ্চিমের লোকেরা যখন বুঝতে পেরেছে যে কালাপানি পার না হলে জাত থাকে না, আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতেরা বলেছে—কালাপানি পার হলে জাত যায়!

হিয়ন উপত্যকায় ক্র্যাডক সিগনেট ওয়ার্টালু গিভস্টোন ডোভার ইত্যাদি কত সমৃদ্ধ জনপদ দেখে দেখে চলেছিলাম। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এসেও এই সব জনপদের প্রথম অধিবাসীরা দেশকে ভোলে নি, যদিও দেশ তাদের অবহেলা করে দূরে ঠেলেছিল, তাদের চিরতরে ভুলতেও চেয়েছিল। দেশের শাসন তাদের বাধ্য করেছিল অপরাধীর বেশে শৃঙ্খলিত হয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে এসে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে যুঝে বেতন না নিয়ে বেত হজম করে বেগার খাটতে। কিন্তু তবু তারা নতুন উপনিবেশে কত জনপদের নাম রেখেছে কেমব্রিজ, নরফোক, নিউডোভার—সম্প্রতিকালে আমরা যেমন টাঙাইল থেকে ধলেশ্বরী পার হয়ে এসে শখ করে দীন আশ্রয়ের নাম রেখেছি নতুন-টাঙাইল। এ যেন দীন দরিদ্রের পর্ণকুটিরে মহৎ ঐশ্বর্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এরই নাম ইতিহাস—যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই, তাহাদের ত তুমি ভোল নাই।

দক্ষিণ সাগরের সমীরণ, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্তি, টাসমেনিয়ার বনরাজি নীলার শান্ত স্নিগ্ধ টাটকা ছায়ায় আচ্ছন্ন হিয়ন ভ্যালী। সেখানে নির্জনতা আছে, কিন্তু শূন্যতা নেই। হিয়নের মৌন প্রকৃতি অপার দাক্ষিণ্যে মানুষের হৃদয় ভরিয়ে দেবার অনন্ত সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে। অস্ট্রেলিয়া দেখে প্রথমে কিন্তু মনে হয়েছিল, সেখানে ভোগ ও লালসা আছে, উত্তেজনা আছে, সৌন্দর্য ঐশ্বর্য কুশ্রীতাও আছে—মানুষের মনে যেন তত শান্তি নেই। কিন্তু তেমন শান্তি পৃথিবীর কোন মানুষের মনেই ত নেই। তবু হিয়নের আপেল উপত্যকায় এলে সবাই যেন সব জ্বালা, সব উত্তেজনা ভুলে অতল

শান্তির মধ্যে ডুবে যায়। পুষ্পিত মার্টলের অরণ্য, ঘাসের গালিচার উপর ডেজির ফুলফোটা, বন্য লাইলাকের সমারোহ মানুষের মধ্যে শান্ত সমাহিতি এনে দেয়। তাই বোধ হয় টাসমেনিয়ার মানুষ শান্ত আর সুন্দর।

টাসমেনিয়ার শান্তির প্রসাদ পেতে যারা অস্ট্রেলিয়ার মানুষ ছুটে যায় সেইখানে—কিছুমাত্র সময়ের অপব্যয় না করে প্রথমেই ছোটে হিয়ন উপত্যকায়। টুরিস্টরা ঘুরে ঘুরে ফটো তোলে, নববিবাহিতের দল মধু-চন্দ্রিমাযাপনে এসে আপেল ফুল দেখে, পিকনিক করে, ট্রাউট মাছ ধরে—একেবারে রাতকে দিন, দিনকে রাত করে ছাড়ে। তবে অল্প ভিড়ের হিয়ণ উপত্যকায় আছে আলাদা একটি রোমান্স, রথ যাত্রায় কলমুখরিত পুরীর চাইতে নির্জনপুরীর মাদকতার মত।

টাসমেনিয়া জাতে অস্ট্রেলিয়ানই বটে, কিন্তু নামে গুণে বৈচিত্র্যে প্রায় আন্তর্জাতিক। সেখানে একটি নদীর নাম জর্ডন, আর অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, হোবার্টের কাছে এক ছোট্ট জনপদের নাম হচ্ছে হাওড়া। তবে সেই ছোট হাওড়ার বড় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে বাস-কন্‌ডাক্‌টররা কখনই প্রাণপণে চীৎকার করে না—শালকাই, শিয়াল্লা, শালীমার!

আমাদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও প্রকৃতির এক অপূর্ব লীলা নিকেতন। এককালে মহারাজা জাহাজে সেখানে অপরাধী চালান হত। স্বাধীনোত্তর যুগে হয়েছে রেফুজী। হিসেবী দক্ষিণ ভারতীয়রা কিন্তু রেফুজী না হয়েও দলে দলে ভিড় করেছে আন্দামানে, বর্মীরাও বাড়ি করেছে। তবে বাঙালী লোকেরা বিশেষ মাথা ঘামায় নি। কালাপানি যে!

হিয়ন উপত্যকার সিগনেটে শুনলাম রোমাঞ্চকর এক প্রণয়কাহিনী। আশী বছর বয়সের একজন বিপত্নীক বৃদ্ধ এবং একজন বৃদ্ধা বাস করত কাছাকাছি বাড়িতে। এ ওকে কাঠ কুড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করত, সে তাকে একটু করে ঘরের কাজ গুছিয়ে দিত। তারপর একদিন দুজনে গিয়ে পুরুতকে বলল—আমাদের বিয়ে দাও। পুরুত ঠাকুর কিন্তু তিরস্কার করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা বলল—থোড়াই কেয়ার করি তোমাদের মন্ত্র পড়া বিয়েকে। আমাদের মনের মিল হয়েছে, আমরা একসঙ্গে থাকব। ঠেকাক দেখি কে পারে? তারা তাই থেকেছিল, আর টাসমেনিয়াবাসীরা সেই ঘটনার নাম দিয়েছিল হিয়নের রোমান্স। হিয়নের কূলে কূলে আজও বাজে চির প্রণয়েরই সুর।

হিয়নের মাঠে মাঠে দেখছিলাম আপেলের ক্ষেত। তিন চার বিঘা জমি জুড়ে এক একটি বাগান। একটু বড় রকমের টগর ফুল গাছের মত এক একটি গাছ। প্রচুর ডালাপালাময়। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সবগুলি নিষ্পত্র গাছ নিতান্ত অলক্ষীর মত দাঁড়িয়ে থাকে—দেখে মনে হয়, রাজ রাজেশ্বরের ঘরে কি দারুণ কাঙাল পনা। অক্টোবর থেকে আপেল গাছে পাতা গজায়, ফুল ফোটে, ফলের গুটি বাঁধে। ফেব্রুয়ারীর প্রথমে যখন প্রতিটি ফল রূপে রঙে রসে পুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন শুরু হয় সত্যিকারের আপেল মরসুম। জাপানের চেরিফুলের মত টাসমেনিয়ার আপেল ফলের উৎসবত বিখ্যাত। হিয়নের সব রকম আপেল এনে জড় করা হয় সিগনেটে! বড় আর ছোট আপেল বাদে শুধু মাঝারি সাইজের আপেল সাজিয়ে রাখা হয় বাক্সে বাক্সে। কে কত বাক্স কত কম সময়ে প্যাকিং করতে পারে, আসলে তাই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। ওদিকে লোক নৃত্য গান বাজনা পান ভোজেরও থাকে রাজসিক আয়োজন। বছরের সেরা হিয়ন সুন্দরীকে সাজান হয় আপেল-রাণী। রাণীর হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার সে কি আনন্দ। আজ টাসমেনিয়ার লালরঙের রসমধুর আপেলের বড় আদর বিদেশে আর দেশের হাটে। হিয়ন ডারওয়েন্ট নদী উপত্যকার আপেলের জোরেই টাসমেনিয়ার মানুষের এত রূপ, এত রূপা।

১৭৭৭ সালে ক্যাপটেন কুক হোবার্টের দক্ষিণে ব্রুণী দ্বীপের মাটিতে একটি আপেল চারা পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন ব্লাই টাসমেনিয়াতে এলেন। কুকের স্মৃতিবিজড়িত অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে সেই আপেল চারার কথাও তাঁর মনে পড়ল। খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন, চারাগাছটি পত্র পল্লব শাখায় বেড়ে উঠেছে, আর তাতে বিস্তর আপেলও ফলেছে। এর পর অবশ্য ব্লাই সাহেবই টাসমেনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ চাষের ভিত্তিতে আপেল চারা রোপনের কাজ শুরু করে দিলেন। সেই হিসেবে সারা অস্ট্রেলিয়াতেই তিনি আপেল চাষের প্রবর্তক। ক্যাপটেন কুক টাসমেনিয়ার মাটি পরীক্ষার কৌতূহলে একটি মাত্র আপেল গাছ পুঁতে কল্পনাও করেন নি এই সুদূর নির্বাসন দ্বীপে কি সম্পদ তিনি রেখে গেলেন, কি সম্পদ দিয়ে গেলেন ভাবীকালের অষ্ট্রেলিয়াকে। তারপর কত যুগ চলে গেছে। টাসমেনিয়ার আরও কত উন্নতি হয়েছে। আপেল ক্ষেতের পাশে পাশে ঘাস গজানো মাঠে মাঠে এখন গরু চরে, ভেড়া চড়ে। বনে বনের গাছগুলি

যোগায় কাঠ সম্পদ। পাহাড়ী খনি থেকেও উত্তোলিত হয় সোনা সীসা দস্তা। আজ টাসমেনিয়াবাসীরা পরম অর্থবান। হিয়নের দূর কুটিরেও তাই মোটর গাড়ি টেলিভিশনের অভাব নেই। টাসমেনিয়ায় শতকরা পঞ্চাশ এবং সারা অষ্ট্রেলিয়ার হিসেবে শতকরা পঁচাত্তর জন লোকেরই আছে একটি করে মোটর রথ।

আজ ক্যাপটেন ব্লাইয়ের নাম অষ্ট্রেলিয়ানরা তেমন করে জানে না। তবু তিনি ইতিহাসের মানুষ। ব্লাই এসেছিলেন কুকের প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানের সঙ্গী হয়ে, তাঁর জাহাজের এক জুনিয়র অফিসার হিসেবে। তিনিও ছিলেন হাওয়াই দ্বীপে ক্যাপটেন কুকের শোচনীয় হত্যার এক অসহায় দর্শক. কুকের পর ব্লাইও একদিন ক্যাপটেন হলেন, কুকের প্রদর্শিত পথে তিনিও এলেন তাইহিতি আর টাসমেনিয়ায়। ইংরেজী সাহিত্যের 'মিউটিনি অন বাউন্টি' বইটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, অথবা তার ছায়া-চিত্র যাঁরা দেখেছেন, ব্লাইয়ের রোমহর্ষক কাপ্তানগিরির কথা সহজেই তাঁরা অনুমান করতে পারেন। জাহাজের লোক ব্লাইয়ের স্বৈরাচারে একদিন বিদ্রোহী হল, সামান্য একটি ছোট্ট নৌকোয় অকূল সাগরে তাঁকে ভাসিয়ে দিল। কয়েকজন অনুচর এবং কিছু অকেজো-প্রায় নৌচালন সরঞ্জাম নিয়ে ব্লাই একদিন সত্যি ইংলণ্ডে পৌঁছালেন। দুর্দ্ধর্ষ আর কুশলী নাবিক হিসেবে তাঁর জয় জয়কার হল। অনতিবিলম্বেই গভর্ণরের পদাভিষিক্ত হয়ে তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে এলেন। ভাগ্যের পরিহাস, অল্পদিনের মধ্যে কলহ সুরু হয়ে গেল মিলিটারীর ক্যাপটেন ম্যাক আর্থারের সঙ্গে। ইনি অষ্ট্রেলিয়ার পশম শিল্পে যুগান্তর আনয়নকারী সেই ম্যাক আর্থার। দুর্দ্ধর্ষ ব্লাইকে ম্যাক আর্থার দলের কাছে নতি স্বীকার করতে হল। জীবনে আর অষ্ট্রেলিয়া-মুখো হবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্লাইকে দুঃখের সঙ্গে লাটের কাজ ছেড়ে দেশে ফিরতে হল। আজ সিডনির শুধু একটি ছোট সড়ক তাঁর নামের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করছে।

হিয়নের বনপথে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে আলো-ছায়ায় ঘুরতে ঘুরতে আমাদের একটুও ক্লান্তি বোধ হল না। আপেল ফুলের সৌন্দর্য, রোবীন পাখীর গান, প্লাটিপাসের সলাজ নীরবতা এবং ক্যাঙারুর লাফিয়ে চলা উপভোগ করতে করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, টাসমেনিয়ার সন্ধ্যায় যখন আঁধার ঘনায়, ইউ ক্যালিপটাসের অরণ্যে কাঠ বিড়ালী ছুটাছুটি করে,

হিয়নের নীল জলে কালো হাঁস পাখা ঝাড়া দেয়, তখন সেই মৌন মুখর বনপ্রকৃতির মধ্যে মোটরে করে যাওয়াটা অত্যন্ত বেমানান। জানি না কোনদিন কখনও এইখানে এমনি সময়ে হিয়নের কোন বনবালা অরণ্যচারী কোন মানুষকে বলেছে কি না—পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

হিয়নের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখলাম, ক্র্যাডকের বনপ্রান্তে এক জোড়া যুবক যুবতী ঘনচুম্বনের আবেশে বিভোল হয়ে বসে আছে একটি হেলান দেওয়া বেঞ্চে। হিয়নের বনচিড়িয়া এরা নয়, শহরের বিলাসী মানুষ। হয়ত ছুটির দিনে হিয়নে এসেছে বন্য মধুর সন্ধানে। আমরা নিঃশব্দে পাশ দিয়ে চলে গেলাম। ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভ্রূক্ষেপ আমাদেরও ছিল না। একটু এগিয়ে ইভলিন মেরী আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। জানি না সে হাসিতে কোন অর্থ ছিল কিনা।

আমাদের নদীর মত কূল ভাঙা উদ্দামতা নেই হিয়নের, যতটা আছে তার মানুষের জীবনছন্দে। নিয়তবাহী গঙ্গার বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, অজয়ের গৈরিক প্রবাহে জয়দেবের গান, দামোদরের কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস মনে পড়ল। মনে পড়ল, নদীর কূলে কূলে আমাদের কপাল ভাঙা দীন মানুষদের কথা। জানি না, নর্মদা তাপ্তী গোদাবরীর তীরে, মহানন্দা চূর্ণী বিদ্যাধরীর পারে দিগন্ত জোড়া মাঠে ঘাস গজিয়ে বেঞ্চ পেতে এমনি নীরব শান্তি-সন্ধ্যায় প্রণয়ীরা জোড়ায় জোড়ায় পড়ে থাকার কল্পনা কোনদিন করতে পারবে কিনা।

আঠারো

এভিলেভের শহরোপকণ্ঠে ম্যানিংহামের বাড়িতে লিওনার্ড বিলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল মায়ে উপত্যকায় যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে। বিলের বোনের সেখানে বাড়ি আছে। ট্রাঙ্ক-কলের ফোনে কথা বলে বিল ব্যবস্থা করেছেন, সপ্তাহশেষের দুইদিন ছুটিতে আমরা সেই বাড়িতে থাকব, মায়ে নদীর হাওয়া খাব, আর আঙুর ফলের রস গিলব। অথচ বিলকে বোঝানো শক্ত হল যে মায়ে দর্শন আগেই আমার হয়ে গেছে, আর সেজন্য আকর্ষণটি এখন অন্য দিকে। ফোর্ডের ফ্যালকন গাড়িটি ধোলাই করতে করতে বিল বললেন—তোমার মতন অমন এলোপাথারি ঘুরে বেড়াবার পক্ষে এই গাড়িটি হচ্ছে আদর্শ।

জানি না আদর্শ গাড়ির খাঁটি অর্থটি কি। অস্ট্রেলিয়াতে আজ ক্যাডিলাক, হোল্ডেন, ফ্যালকন এবং তোয়োতা গাড়ির বড় ছড়াছড়ি। তবে সবার প্রিয় হোল্ডেন ; বিশেষ করে হোল্ডেনের স্টেশন ওয়াগন। সপ্তাহ শেষের ছুটিতে বৌ নিয়ে বাইরে গেলে হোটেল-বাসের আর দরকার হয় না। গাড়ির পেছন দিকটাতেই টান টান হয়ে শোওয়া চলে। বিল অবশ্য স্ত্রীর জন্ম হোল্ডেনই কিনেছেন, যদিও ছুটো গাড়ি একাই তাঁকে রোজ ঘষে মেজে ধুয়ে মুছে ভদ্র করে তুলতে হয়।

হোল্ডেন অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব সম্পদ ; শতকরা নিরানব্বই ভাগ দেশী মালমশলা এবং পুরোপুরি অস্ট্রেলীয় কারিগরী নিপুণতায় হোল্ডেন তৈরী হচ্ছে। ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মোট লোক সংখ্যা তিরিশ লক্ষ। তার চার লক্ষ লোকই হোল্ডেন নির্মাণের নানা কাজে রত আছে। ভিক্টোরিয়া এবং বাকী অস্ট্রেলিয়ায় অপর্যাপ্ত বিক্রীর পর বহিঃ পৃথিবীর আটচল্লিশটি দেশে নিয়মিত হোল্ডেন রপ্তানী হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার কল কারখানার শ্রমিকরাও দিব্যি নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করে। কিন্তু তা দেখে মালিক বা ম্যানেজারের গা জ্বলে না, পদে পদে তাঁরা এমন চিন্তাও করেন না, যে ছোটলোকের গাড়ি কেনার পয়সা হলেই বড় লোকের জৌলুষ নষ্ট হবে এবং কেউই কথায় কথায় তাঁদের সেলাম ঠুকবে না। বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অল্প গাড়ি বেচে বেশী পয়সা করার স্বপ্নও তাঁরা দেখেন না। আমাদের স্বাধীনোত্তর যুগে অনেক লোকের গাড়ি কেনবার পয়সা হয়েছে, যদিও তাঁরা শ্রমিক নন। দরখাস্ত করে অনেককেই বৎসরাধিককাল অপেক্ষা করতে হয়। কারণ একাধিক কারখানার অভাবে নাকি আমাদের বেশী গাড়ি তৈরী হয় না। অথচ দেশের কত লোক বেকার। শত শত কারখানা খুললে আরও বেশী গাড়ি তৈরী হবে, বেকার লোকের কাজ জুটবে, দরখাস্ত করে ক্রেতাদেরও অনির্দিষ্ট অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। অস্ট্রেলীয় হোল্ডেন বা জাপানী তোয়াতোর মত ভারতীয় মোটর গাড়ি বিদেশে রপ্তানী হলে আমাদের সম্পদও বাড়বে। তা কেন হয় না সেই কথাটা আজও আমরা বুঝে উঠতে পারি নি।

এডিলেডে শ্রমিকের সর্দার মিঃ লিওনার্ড বিল অন্য অনেক অস্ট্রেলিয়ানের চাইতেই ভিন্ন ধরণের লোক। লেখাপড়ার দিকে তাঁর দারুণ ঝোঁক। বড়

ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। এখন রাজ্য সরকারের বড় অফিসার। ছোট ছেলে আর মেয়েটির এখনও ছাত্রদশা কাটেনি। মাত্র তের বছর বয়সের পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিল বললেন—বারবারা হবে হাওয়াই জাহাজের পাইলট।

বিল অনেক আলাপ করলেন। গাড়ি বাড়ি ফুলের বাগান কত কিছুই দেখালেন। ওঁর বোনের বাড়িতে এবার আমাদের না গেলেই যে চলবে না সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অথচ বিলের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর নয়। একেই বলে খাঁটি অষ্ট্রেলিয়ান। হঠাৎ বুঝবার উপায় নেই, যে এই লোকগুলি এত সহজে বন্ধু হন, আবার অনেক সময়ই কাউকে তেমন একটা বড় আমল দেন না। ঠিক তখনই কিন্তু বিদেশীরা ভাবে—অস্ট্রেলিয়ানরা কেমন যেন বিদঘুটে চরিত্রের লোক।

বিলের পূর্বপুরুষ অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন আয়র্ল্যাণ্ড থেকে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক মানুষের মতই বিলের মনে মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটু আক্রোশের ভাব আছে। অষ্ট্রেলিয়ানরা ইংরেজদের পাইকারী হারে বলে 'পমি'। এর একটি কৌতুককর কারণ আছে। উপনিবেশের যুগে এদেশে বেশীর ভাগ মানুষই এসেছিল কনভিক্‌ট হয়ে। সরকারী ভাষায় তারা 'প্রিজনার অব হিজ ম্যাজেষ্টি, সংক্ষেপে P.O.H M.—দুর্ভাগ্যক্রমে এই চারটি বিচ্ছিন্ন অক্ষর লোকের মুখে মুখে দাঁড়াল 'পমি'। সবাই ক্রমে ইংলণ্ডের লোক মাত্রকেই ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল 'পমি', অষ্ট্রেলিয়ানদের থেকে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করবার জন্য। বিল কথায় কথায় বললেন—ঐ হোথায় পমিরা থাকে, পমিরা এই করেছে, তা করেছে ইত্যাদি। সিডনির অবস্থা আরও খারাপ। ট্যাক্সিতে নিশ্চিন্তে উঠে বসেছে সদ্য ইংলণ্ড-আগত ইংরেজ। একটু আলাপের সূত্রপাত হলেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাকে নির্ঘাৎ শোনাবে—পমিজ আর নট পপুলার হিয়ার! অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সর্বত্র এই রকম একটি গল্পও চালু আছে—আমাদের পাড়ায় এক ছোকরা ছিল; দুদিনও হয় নি ইংলণ্ড থেকে এসেছে। কি বলব মশাই, এসেই গুরুগিরি শুরু। কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা উচিত নয়, আমাদের শেখাতে যাচ্ছিল। যত সব পমির দল! অবশ্য আইরিশদেরও একটি কৌতুককর নাম আছে! সে নাম স্পাড, আইরিশ ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে আলু! আয়র্ল্যাণ্ডে আলুর দুর্ভিক্ষের পর লোকের দেশ ছেড়ে দলে দলে অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেওয়ার জন্য এই নাম কিনা বলা শক্ত।

অস্ট্রেলিয়ানদের ধমনীতে বহু জাতির রক্ত আছে। তবু তারা এমন একটি জীবনছন্দ বেছে নিয়েছে যাকে বলা চলে নিজস্ব। কেতা কানুন ফরম্যালিটির ধার তারা ধারে না, কোট টাই হ্যাটে টিপটপ হয়ে থাকাও তেমন পছন্দ করে না। এমন কি গরম বেশী পড়লে পায়ের জুতোটি পর্যন্ত খুলে রাখে। বিলেতের ট্রেনে শীতের মধ্যে লোকে খুব করে পোশাক এঁটে একাই একশ'র মত হাম বড়া ভাব নিয়ে বসে পত্রিকা পড়ে বা পড়ার ভাণ করে—পাছে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় এমন কথা ভাবা যায় না।

অস্ট্রেলিয়াতে আমেরিকানদের জনপ্রিয়তা আজ একটু বেশী করেই চোখে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ানরা হামেশা আমেরিকার সঙ্গে বৃটেনের তুলনা করে বলে—আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা ইংলণ্ডের লোক। তাই আজ সেখানে দলাদলি ভেদাভেদের শেষ নেই। কিন্তু উত্তরের লোকদের পূর্বপুরুষরা ইউরোপের নানা অঞ্চল থেকে এসেছিল বলেই সেখানে ভেদাভেদ বর্ণবিদ্বেষ অনেক কম। অস্ট্রেলিয়ানরা আমেরিকানদের মত বার জাতির বংশধর বলেই অন্ধ সংস্কারমুক্ত—বিশ্ববাসীকে তারা এই ধারণাটাই দিতে চায়। নিজেদের জীবন ছন্দে আমেরিকার সুর কল্পনা করতেও তারা ভালবাসে। আজ আবার আমেরিকার মত ডলার মুদ্রা প্রচলন করে পাউণ্ড স্টারলিঙের কলোনিয়াল প্রেতছায়াকে গলাধাক্কা দিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকানদের সঙ্গে নিজেদের যত মিলই খুঁজুক, তাদের শক্তি শৌর্য এবং সম্পদের উপর যত বিশ্বাসই থাক, অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু এশিয়ার সঙ্গে প্রতিবেশীত্বের কথাটা কিছুতেই ভুলছে না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে তাদের এশীয় নীতি। বর্তমানে সমগ্র অস্ট্রেলিয়াতে এশিয়াবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে আটত্রিশ হাজার। হয়ত হোল্ট সরকারের উদার নীতির ফলে তাদের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু হিসেবী বুদ্ধিতে অস্ট্রেলিয়ানরা বুঝে নিয়েছে যে এশিয়ার মধ্যে জাপানের সঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠতা এবং একমাত্র জাপানীদের অস্ট্রেলিয়ায় আগমনই অন্যের তুলনায় অনেক বেশী কাম্য।—অবশ্য নির্বিচারে এশীয় লোক আহ্বানের নীতি এখনও ঘোষিত হয় নি—আর হবে কিনা সন্দেহ আছে। তবে জাপানীরা অস্ট্রেলীয় মনোভাব সম্বন্ধে বেশ সজাগ। জাপানের ক্ষুদ্র কয়টি দ্বীপের মধ্যে দশ কোটির বেশী লোক বাস করলেও

তারা জানে, আর লোকবৃদ্ধি হলেই বিপদ। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা গেলেও মাথা গোজার ঠাঁই কোথায়? অষ্ট্রেলিয়ার হিসেব হয়ত মনে মনেই আছে। দুটি দেশই বৈষয়িক আদান প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের অতি নিকটে; বাণিজ্যবন্ধন তাদের এত দৃঢ়, যে জাপানই অষ্ট্রেলিয়ার রপ্তানী-পণ্যের আজ বড় খদ্দের—আগের মত আর বৃটেন নয়।

অষ্ট্রেলিয়ানরা ছুটি কাটাবার জন্য এখন দলে দলে যাচ্ছে জাপানে; জাপানীদের সৌজন্যে মুগ্ধ হচ্ছে, তাদের ইউরোপীয় মানের জীবনযাত্রা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে অপার উন্নতি দেখে বিস্মিত শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে ফিরে আসছে। পারস্পরিক শুভেচ্ছার ভিত্তিতে জাপানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার সকল বন্ধনই দৃঢ়তর হচ্ছে।

আজ বৃটেনের গৌরব-রবি অস্তাচলে, অমিত বলের রাশিয়া আমেরিকা দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত, চীনের ক্ষুধিত ঘুমন্ত ড্র্যাগন জেগে উঠে উদ্যত নখর বিস্তারে ব্যস্ত। অষ্ট্রেলিয়ানরা এই অভাবনীয় জটিল যুগে বেশ নিপুণতার সঙ্গে ঘরে বাইরে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। মনে হয় পৃথিবীতে আরও কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটলে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় যথোচিত লোক বৃদ্ধি সম্ভব হলে হয়ত আগামী দিনে অতুল সম্পদের অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের দেশ বলে পরিগণিত হবে।

স্যার রবার্ট মেনজিসের যুগ পর্যন্ত লণ্ডনের গৌরব এবং জৌলুষই কিছু বৃটিশ-ভক্তের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল। সরকারী লক্ষও ছিল লণ্ডনের দিকে। হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করেও সরকারী আগ্রহপুষ্ট লোকেরা বৃটনদের উত্তরপুরুষ বলে নিজেদের কল্পনা করতে ভাল বাসত।—যেন তারা বৃটনীয়ারই একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংস্করণ। এখন কিন্তু সবাই জোরের সঙ্গে বলছে—আমরা অষ্ট্রেলিয়ান।

দীর্ঘ তিরিশ বছর রাজনৈতিক জীবনের পর স্যার রবার্ট মেনজিসের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার নবযুগের অভিক্ষেপ। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার যে কথা মেনজিস-যুগে কল্পনাও করা যেত না, আজ সেখানে বৃটিশ-রাজের সম্পর্ক-মুক্ত প্রজাতন্ত্রের যুগ আর যেন দূরে নয়। হয়ত তেমন যুগ খাস বৃটেনেও ধীরপদে এগিয়ে আসছে। ফেল্ট-টুপি-পরা ছাতা-হাতে বুড়ো-মত কোন্ এক বৃটনকে কবে যে ইংলণ্ড-বাসীরা প্রেসিডেন্ট-পদে বরণ করে বসবে কে জানে!

টাউন্‌সভিল থেকে টাসমেনিয়া, সিডনি থেকে ফ্রিম্যান্টেল—সর্বত্রই কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ানরা ইংরেজী বলে মোটামুটি একই উচ্চারণে। ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ার এবং লিঙ্কনশায়ারের উচ্চারণ পার্থক্য, অথবা বাঙলা দেশের নদে-মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক টানের প্রকার ভেদ অষ্ট্রেলিয়ার দুই তিন হাজার মাইলের ব্যবধানেও তেমন করে গড়ে উঠে নি—ঘটি-বাঙালের উচ্চারণগত কোন্দলের মত কোন মূঢ়তাও আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নি। উচ্চারণের যে গুণ অথবা যে দোষ দেখা যায় ফ্রিম্যান্টেলে, দুই হাজার মাইল দূরের সিডনিতেও সেই একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ফ্রিম্যান্টেলের ট্যাক্সিতে উঠলে ড্রাইভার সুযোগ মত আলাপ সুরু করবে, হয়ত একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করবে—কেম হিয়ার টু ডাই অর্থাৎ টু ডে? রহস্য করে অনেকে জবাব দেয়—নো মেট, কেম হিয়ার টু লিভ! বাঙালী লোকও কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ানদের মতই 'এ' এবং 'আই'র মধ্যে গোলমাল বাঁধিয়ে বোম্বেকে বলে বোম্বাই—যদিও খাস মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণে বোম্বে হয়েছে মুম্বেই!

অষ্ট্রেলিয়ানদের সংসার জীবনটা যেন দিন দিন বড় বেশী রকম আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সবাই আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঘরের বাইরে আর পাঁচ জন লোকের কেমন করে চলছে, কি তারা ভাবছে, তা নিয়ে বড় বেশী কারও মাথা ব্যথা নেই। এমন কি পাশের বাড়ি সম্পর্কেও সবাই নির্বিকার। অষ্ট্রেলিয়ানরা বলে, বেশী মাখামাখিতে প্রতিবেশীত্ব নষ্ট হয় বলে সম্পর্কটা না রাখাই ভাল। আমরা কিন্তু সম্পর্কটা জিইয়ে রাখতেই ভালবাসি, যদিও পাশের বাড়ির কারও ভাল চাকুরি হলে, মাইনে কেউ বেশী পেলে, কারও মেয়ের আশাতীত রকমে ভাল বিয়ে হলে আমরা মনে তেমন শান্তি পাই না। অবশ্য কারও কারও সম্পর্ক রাখার মহৎ সঙ্কল্পকে আমরা অভিনন্দিত করি—বিশেষ করে যারা পাশের বাড়িকে কেবলই শ্বশুর বাড়ি করতে চায়!

স্বচ্ছলতার দেশ অষ্ট্রেলিয়া। সবাই রোজগার করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, যখন খুশি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে—আর প্রচুর গাড়ি দুর্ঘটনা করছে। ভিক্‌টোরিয়া রাজ্যে মোটর দুর্ঘটনার হার নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ছুটির দিনে সবাই ছোটে মাঠময় গ্রামের দিকে, নয়ত সমুদ্র-সৈকতে। অথচ গ্রাম বলতে অষ্ট্রেলিয়ার তেমন কিছুই নেই। পোর্ট-পিরি একটি ছোট জায়গা। লোক সংখ্যা পনেরো হাজার। আমাদের

একটি বড় গ্রামের মত। সেখানেও কিন্তু প্রতিবেশীত্ব গড়ে ওঠে নি, আবার গাড়ি দুর্ঘটনার হারে পোর্টপিরিও পিছিয়ে থাকে নি। পঞ্চাশ মাইল দূরের ওয়ালারুর লোক সংখ্যা মাত্র দুই হাজার। চার পাশের ফার্ম থেকে গম আমদানি হয়ে ওয়ালারু দিয়ে চালান হয় পৃথিবীর দেশে দেশে। জাহাজ ঘাটায় কাজ করা ছাড়া অধিবাসীদের অন্য কোনই জীবিকা নেই। তবুও শহরের মতই সেখানে প্ল্যান করা রাস্তাঘাট। প্রতি বাড়ির লনে লনে ফুলের বাগান। ঘরে ঘরে টেলিভিশন। কিন্তু আমাদের গ্রাম দেশের মত পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় তাসপেটা, এবাড়ির গিন্নির ওবাড়ি থেকে এটাওটা কর্জ আনা, আলাপ করতে গিয়ে একেবারে হাঁড়ির খবর নিয়ে বাড়ি ফেরা—এ সবের বালাই নেই।

অষ্ট্রেলিয়ায় গীর্জায় গিয়ে ধর্ম করার মত লোকের সংখ্যা আর সব দেশের মতই বেশী নয়। তবে শতকরা ষাটজন ক্যাথলিক নিয়মিত উপাসনা করে। যেখানে অভাব নেই, রোগ কম, অস্বাস্থ্য অল্প—লোকে সেখানে ভগবানকে ডাকবেই বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে? হে ভগবান, চাকুরি দাও, রোগটা সারাও, মাদুলিটা ভাল ফল দিক—এই সব প্রার্থনার সুযোগই বা কোথায়? কিন্তু তাই বলে অষ্ট্রেলিয়ানরা অধার্মিক বা পাষণ্ড নয়। কালোবাজারে খাদ্য পাচার করে তারা পূজোর মন্দির গড়ে না। চাকুরিতে ঘুষ খেয়ে এবং পদাধিকার বলে অন্যকে দাবিয়ে রেখে বাড়িতে গণক এবং বাজারে গণিকা পোষে না, কালীপূজো শনিপূজো করে না। স্নেহময়ী মাতা, কর্তব্যপরায়ণ পিতা, প্রেমাসক্ত স্বামী আমাদের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়াতে কিছুমাত্র কম নেই।

বিলেতের মত একটি লম্বা ব্লকের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে পঁচিশটি পরিবার বাস না করে অষ্ট্রেলিয়ার শতকরা আশীজন লোক বাস করে যার যার নামে আলাদা বাড়িতে।—এক টুকরা নিজস্ব জমিতে তৈরী করা বাড়ি। যে ব্যক্তি শ্রমিকের কাজ করে তারও একটি ব্যক্তিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আছে। পাঁচ বছরে নিজের বাড়ি, তারপর একটি গাড়ি করাও চাই। গাড়ি বাড়ি না হলে নব দম্পতীরা সন্তান কামনা করে না। প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজনে অষ্ট্রেলিয়ানরা ইউরোপ থেকে লোক আমদানী করছে, তবু কিন্তু প্রতিটি পরিবার পাইকারী হারে সন্তানের জন্ম না দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, খাদ্য নেই—ফি বছর সন্তান হওয়ারও তবু কামাই

নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের আরও সমস্যা আছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিবর্গ মাইলে এখন সাড়ে তিন জন লোকের বাস ; ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে সাড়ে তিন শত জন। অর্থাৎ আমাদের শতকরা আশীজন লোকের বাড়ি করবার ক্ষমতাও যদি হয়, তবু হয়ত তার উপযুক্ত জমি পাওয়া সহজ হবে না। বাড়িও করব, গাড়িও রাখব, ফসল ফলিয়ে পেটের ক্ষুধাও মেটাব—পঞ্চাশ কোটি লোকের সেই পরিমাণ জমির জন্য চন্দ্রলোকের দিকে চোখ রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে কি? আশা করি সেখান থেকে পরলোকও তত দূরে নয়।

হোয়াইট-অষ্ট্রেলিয়া-পলিসি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে অনুসৃত হচ্ছে বলে বিস্তর অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ানরা ভাগ্যবান, শাদা-কালোর ব্যাপারটি তাদের কাছে আসল কোন সমস্যা নয়, যেমনটি তা আমেরিকায়। আমেরিকাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কৃষ্ণাঙ্গ লোক বসবাস করে আসছে, আর তাদের গাত্রবর্ণের অপরাধে শ্বেতাঙ্গরা কালো বলে তাদের ঘৃণা করছে ; পদে পদে ঘাটে ঘাটে বৈষম্য সৃষ্টির ফিকির খুঁজছে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী বাদে বাকী কালোরা প্রায়শ অস্থায়ী উড়ুক্কু লোক – ওদিকে নতুন করে কাউকে আসতেও দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং কৃষ্ণকায়দের আগমন রোধ করে অষ্ট্রেলিয়াতে বর্ণবিদ্বেষ চালান হচ্ছে বলে লোকের এত অভিযোগ। কিন্তু এর আরও একটি দিক আছে। আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের অনুমোদন করে শুধু শ্বেতাঙ্গ জনতা—সরকার কিন্তু সহানুভূতিশীল। অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ কৃষ্ণকায় বহিরাগতদের স্বাগত জানাতে চায়। কিন্তু সরকার তত পক্ষপাতী নন। সরকারী নীতি হচ্ছে দেশটাকে যথাসম্ভব শাদা রাখা এবং কৃষ্ণকায় মানবদের অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে একেবারেই শিকড় চালাতে না দেওয়া—যাতে ভবিষ্যতের ডামাডোলে আমেরিকার মত শাদা-কালোর সম্ভাব্য সংঘর্ষটি সহজে এড়ানো যায়।

শ্বেতাঙ্গ মতবাদপুষ্ট সরকারী নীতির সমর্থনে আরও কিছু যুক্তি আছে। কালো লোক আমদানির অছিলা পেলেই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি কালো শ্রমিক নিয়োগ করবে। তার ফলে যে সব শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক আজ পঞ্চাশ টাকা মজুরি পায়, তাদের সেই মোটা আয়ের পথটি বন্ধ হবে। তখন দেশের ধনবৃদ্ধির আশীর্বাদ সকল স্তরের লোক সমান হারে লাভ করবে না--স্বভাবতই

জীবনযাত্রার মান অবনত হবে। ধনী আরও ধনী হবে, ধনী দরিদ্রের দুস্তর প্রভেদ আরও বাড়বে এবং সেই পুঞ্জিত অসাম্যের মধ্যে শোনা যাবে সাম্যবাদের জয়ধ্বনি। অর্থাৎ সেই ইজম-জনিত সংঘাতের সঙ্কেত, ঘরপোড়া গরুর পক্ষে সিন্দুরে মেঘের মত যা মারাত্মক। সরকার মনে করেছেন; কৃষ্ণাঙ্গ লোক আহ্বানের নীতি ঘোষিত হলে অষ্ট্রেলিয়া কার্যত আমেরিকার মতই একটি শাদা-কালোর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। তবে আজ কিন্তু এই সরকারী মতের একটু পরিবর্তন সূচনা করেছে ভিয়েৎনামের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে। আজ কর্তা ব্যক্তিরাও যেন বলতে চান—কালা ধলা ভাই ভাই।

পণ্ডিতেরা বলেছেন, আগামী পঁচিশ বছরে পৃথিবীর অধুনা উন্নত দেশগুলির আরও ধনবৃদ্ধি হবে, গরিব দেশের দারিদ্র্য না কমে আরও বেড়ে যাবে। কলের ব্যবহার আরও বাড়তে বাড়তে হাতে-করার মত কাজ থাকবে তখন অনেক কম। আর সেই কম কাজের দেদার অবসরে মানুষের মাথায় এসে বাসা বাঁধবে যত সব অশুভ শয়তান। যে সমস্ত দেশে কলের কায়দায় কাজ হবে, লোকের হাতে সময় থাকবে, ভাণ্ডারে ভাণ্ডারেও খাদ্যের অভাব থাকবে না, অ-কাজের বিলম্বিত অবসর সবাই সেখানে হয়ত শুধু খেয়ে খেয়েই কাটিয়ে দেবে। মাথাপিছু খোরাকও স্বভাবতই বেড়ে যাবে—আর বাড়বে মানুষের যৌন সম্ভোগস্পৃহা, জুয়াখেলার নেশা, পরচর্চার অভ্যাস। সুতরাং কোথায় শান্তি ভাবীকালের অষ্ট্রেলিয়ায়, ঐশ্বর্যের দেশ আমেরিকায়, এবং দীনের হতে দীন ভারতবর্ষে ?

ভারতে আমাদের সামাজিক জীবনটি তেমন নিরাপত্তায় সুরক্ষিত নয়, মেয়েদের ত নয়ই। যে ছেলে ভাল রোজগার করে বিয়ের বাজারে আজও তার অনেক দাম। তার আর্থিক নিরাপত্তাই স্ত্রীর কুমারী জীবনের অনিশ্চয়তা বোধটুকু দেয় ঘুচিয়ে। সমাজে যদি ঠিক এমন অবস্থা চলতে থাকে, তবে পুরুষের প্রতি স্ত্রীর মনের টানে ভাঁটা পড়ার কারণ হয়ত ঘটবে না। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা পুরুষের তুলনায় একটুও কম নয়। কারণ অর্থার্জনের সুযোগ তাদের অনেক আছে। গতানুগতিক চাকুরি ছাড়াও জোয়ান জোয়ান মেয়েরা আজ দুই তিন হাজার বিঘা জমিতে জোয়ারী খুলে একা একাই কাজ করছে। সুতরাং বিয়ে দেরীতে হলে বা একেবারে না হলেও তাদের দিব্যি চলে—খাওয়া পরা বিলাস বিহারের

কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। আর ঠিক এই জন্যই অষ্ট্রেলীয় সমাজে এর প্রতিক্রিয়া নানা বিকৃতিতে দিন দিন আত্মপ্রকাশ করছে। অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েরা ভারতীয় মেয়ের মত বিবাহের চিন্তাক্লিষ্ট নয়, জাপানী মেয়ের মতও ভাবে না, যে বিয়ে না হলেই জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হবে। অথচ বিয়ের প্রতি তারা যে কিছুমাত্র উদাসীন তাও নয়। মেয়েদের সংখ্যা সেখানে অনেক কম বলে চাহিদাটা তাদের অনেক বেশী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাও হয় নি। স্ত্রীরত্ন লাভের জন্য ধনুর্ভাঙা কোন সর্ত ত চালু হয়-ই নি, বরং পুরুষের মন জয়ের প্রতিযোগিতা সেখানে একেবারে কম নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে আমেরিকার সমাজে মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাটা খাস মার্কিনীদেরই তেমন উদার নয়। আমেরিকান স্ত্রীর লক্ষ্য নাকি প্রেম নয়, সন্তান সংসার কিছুই নয়।—স্বামীর শুধু জীবন বীমার টাকাটার দিকেই তার তীক্ষ্ণ নজর। আর সেই টাকার জন্য স্বামীর মৃত্যু ঘটাবার চেষ্টা করতে পর্যন্ত সে মোটে ইতস্তত করে না। আমেরিকান-দের মতে অষ্ট্রেলীয় স্ত্রীরা সত্যিকারের মেট—ছায়া-সঙ্গিনীর মত সঙ্গে সাথে ফেরে, সুখে দুঃখে মিলেমিশে ঘর করে, তবে স্বামীর সব রকম কাজে নাক গলাবার অধিকার যে কম নয়, সে কথাটা মোটে ভোলে না। আর ইউরোপীয় স্ত্রী? এখনও তারা নাকি ক্রীতদাসীর সামিল! অবশ্য আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইউরোপ, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্ত্রী জাতি সম্পর্কে এই ইয়াঙ্কি মতামতগুলি আসলে আংশিক সত্য, পুরো সত্য হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াত একবার ভাববার কথাই বটে।

অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ জীবনের বিকৃতিগুলি দিন দিন যেন প্রকট হয়ে বেরিয়ে পড়ছে। বিশেষ ধরণের টেলিভিশন অধিবেশনে তার প্রতিচ্ছবি অনেক দেখতে পাওয়া যায়। বৈকালিক টেলিভিশনে মাঝে মাঝে একটি করে বৈঠক বসে। সভ্য সভ্যার দলে একজন করে মনোবিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ এবং সমাজ সেবিকা নিযুক্ত আছেন। বিবদমান দুটি পক্ষ তাঁদের কাছেই আপন আপন সমস্যাটি তুলে ধরেন। সদস্যমণ্ডলী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তথ্যের পর তথ্য জেনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটিকে তলিয়ে দেখে সমাধানের নির্দেশ দেন। কুমারীর মাতৃত্ব, স্বামী স্ত্রীর কলহ, পিতা পুত্রে বা মায়ে-ঝিয়ে মনোমালিন্যের জটিল জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতে হয়।

একটি 'কেস' ত টেলিভিশন-দর্শকের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেই

ফেলেছিল। বিশ বছর বয়সী এক ছেলে তার তের বছরের বড় একটি মেয়ের খপ্পরে পড়ে অনেকদূর এগিয়েছিল। দুজনেরই কর্মস্থল এক এবং ছেলেটির পিতাই সেখানে বড় সাহেব ছিলেন। কিন্তু স্নেহাতুর পিতা সব জেনেও পুত্রকে কিছু বলেন নি, পদাধিকারের বলে মেয়েটিকেও সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি—কারণ তার অগাধ সম্পত্তির দিকে ভদ্রলোকের নজর ছিল। তাঁর স্ত্রী এই নিয়ে বিস্তর কলহ করলেন; শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে না পেরে নিজের সতেরো বছরের মেয়েকে এমন এক লোকের সঙ্গেই তাইহিতি-ভ্রমণে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন, যিনি তার পিতৃবয়সী। স্বামীর উপর প্রতিহিংসায় অন্ধ ভদ্রমহিলার ধারণা, অতি-বয়স্ক লোকের সাহচর্যে কন্যার নির্ঘাৎ অনিষ্ট হবে এবং তখনই তিনি বুঝতে পারবেন পিতা হিসেবে মনটা কেমন লাগে—ছেলেটির বেলায় যেমন লেগেছে মায়ের মনে! টেলিভিশনের বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ দিলেন। অবশ্য ফলাফল আমাদের জানা নেই।

অষ্ট্রেলিয়াতে কুমারী মাতৃত্বের সমস্যাটাই আজ বোধ হয় সব চাইতে বেশী। একটি 'কেস' বিশ্লেষণে দেখলাম এক রণরঙ্গিণী মেয়েকে। গর্ভবতী। বয়স একুশ বছরের কম বলে বিয়েতে পিতা মাতার অনুমতির দরকার হল। মেয়ের অবস্থাটি জেনেও কিন্তু পিতা বেঁকে বসলেন। কারণ অবশ্য হাস্যকর—অপরাধী ছেলেটি তাঁর মতে খুব বেশী মাত্রায় ধনী। শুধু তাই নয়, সে আবার ইহুদী। টেলিভিশনের বৈঠকেই পিতা পুত্রীর তর্ক চলল। গরম গরম বচসা। ভাবতে লাগলাম, ভারতীয় হলে এমনি অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায়ে পড়েও মেয়েটি কি ঝগড়া করে বাবাকে বলতে পারত—আমি সলোমনকে ভালবাসি, এখন গর্ভবতী; সুতরাং বিয়ের অনুমতি তোমাকে দিতেই হবে। নতুবা ইত্যাদি। অনেক সময় আমাদের মনে হয়েছে, স্বাধিকার প্রমত্ত অষ্ট্রেলিয়ানরা তা হলে কি অনেক এগিয়ে গেছে—আর চিরদিন ভারত শুধু পিছিয়ে রয়।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি টেলিভিশনের স্টেজ-ম্যানেজড অভিনয় মাত্র নয়। অষ্ট্রেলিয়াতে দিনের পর দিন এমন ঘটনা বেড়েই চলছে। বিয়ের পর প্রেম আর অনেকের টিকছে না, স্ত্রী শুধু 'মেট' হয়ে খুশি হতে পারছে না—অল্প দিনের মধ্যে এগিয়ে আসছে বিচ্ছেদ; অথচ ডাইভোর্সের পর নতুন জুটী-বন্ধনেও তারা সুখী হতে পারছে না। তবে কি চায় তারা?—হয়ত নিজেরাই জানে না কি তারা চাইছে।

বিবাহিত জীবনের কর্ম বিভাগ আজ নতুন করে চালাই করা হয়েছে অষ্ট্রেলিয়াতে। রবিবারের ছুটির দিনে স্ত্রী আর পূর্বের মত স্বামীর আগে ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের আয়োজনে তৎপর হয় না; স্বামীই হয়ত বেড-টি হাতে নিয়ে তাকে ডেকে তোলে। অথচ বাড়ির কাজে শুধু মানবতার খাতিরেই স্ত্রীকে আগে সে সাহায্য করত। এখন এসেছে বাধ্যবাধকতা। গৃহের অধিশ্বরী ঘরের কাজের শৃঙ্খলে বেচারা স্বামীকে একটু করে বেঁধে ফেলেছে; গৃহস্থালীতে হাত না দেওয়ার কথা কোন স্বামীই আজ আর ভাবতে পারে না। ইস্ত্রি করা, বাসন ধোওয়া, জুতো পালিশ করা অবহেলা করে খোস মেজাজে স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করবার হিম্মত কম স্বামীরই আছে। স্বামীও যে মেট, সকল কাজের সমান শরিক। আজ বিয়ের দু বছরের মধ্যে অষ্ট্রেলীয় স্বামীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে—বিয়ে ত নয়, জীবনের মূর্তিমান বিরোধিতা। স্ত্রী যেন তাদের কাছে পার্লামেন্টের বিরোধী দলের সদস্য, যার অভিসন্ধি দিবালোকের মত স্পষ্ট—মুখ খোলা মানেই বিরোধিতা করা। আশ্চর্যের ব্যাপার, পরস্পর মেট হওয়া সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীতে এত অমিল। বিপন্ন স্বামীরা আজ গালে হাত দিয়ে ভাবছে, স্ত্রী ত বিরোধী দলের মার্কা পরে ঘরে আসে না। তবু কেন এমন হয়?

পোর্টপিরির এলান সেদিন তার গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে দূর দুরান্ত ঘুরিয়ে আনল, বড় হোটেলে দামী লাঞ্চ খাওয়াল, গেলাস গেলাস বিয়ার গিলে পরম তৃপ্তিতে বলল—বেস্ট ইন দি ওয়ার্লড! তারপর অষ্ট্রেলিয়ার উন্নতির ইতিহাস থেকে শুরু করে নিজের সংসার জীবনের অনেক কথাই শোনাল। আগামী বছর যে আবার নতুন মডেলের গাড়ি কিনবে সে কথাও জানাল। রিটায়ার করার আগেই যে একবার সস্ত্রীক ইউরোপ ঘুরে আসবে তাও বলল। এলানকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার স্ত্রীও কি চাকুরি করে? কাষ্ঠ হাসি হেসে এলান বলল—না। তবে চাকুরি করবার জন্য তার বড় সাধ। বাড়ি গাড়ি করতে হলে অনেক টাকারই দরকার হয়। তখন অবশ্য দুজনের আয়টা এক করলে অনেক সুবিধাই হয়। কিন্তু বাড়ি গাড়িত আমাদের আছে। এখন ওর চাকুরি করবার এমন কি দরকারটা বলত? এলানের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একমত হয়ে বললাম—কিছুমাত্র দরকার নেই।

অনেকটা সময় কেটে গেছে। ঘড়ি দেখে এলান বলল—এইবার ফিরতে হবে। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, যেন মুখে একটু উদ্বেগের ছায়া আছে।

সত্যিত, ডিনারের আগে বাড়ি ফিরে বৌকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে হবে, টেবিল সাজাতে হবে। সুতরাং ঠিক সময়ে হাজির না হলে হাজার রকম প্রশ্নের ঝামেলায় পড়তে হবে। অনুমান করলাম, সেই সব উৎকট প্রশ্নের মত সদুত্তরই এলান দিক, প্রেয়সী তা খুব সহজে গ্রহণ করবে না। বিদায় নেওয়ার আগে এলান জিজ্ঞেস করল—বিয়েথা করেছ?—যেন আমার জবাবটা না বোধক হলে অজস্র অভিনন্দন জানিয়ে সে বলে যাবে—তোমার মত বুদ্ধিমান লোক আর হয় না। অষ্ট্রেলিয়া দেখলে মনে হয়, সত্যি বিচিত্র এই দেশ। প্রথমে ক্যাঙারুর নাম বাহির বিশ্বে এর পরিচিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে—যেন অষ্ট্রেলিয়ার অর্থই হল ক্যাঙারুর দেশ। কিন্তু আর নয়, ক্যাঙারু এখন আর সে আকর্ষণের বস্তু নয়। আদিম অধিবাসীর যুগ, কনভিক্‌ট যুগ, কলোনীর যুগ অতিক্রান্ত হয়ে আজ অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছে নবযুগের আহ্বান। তার যন্ত্র কৃষি এবং বিজ্ঞান সেই আহ্বানের সাড়া, সাগরের তীরে তীরে স্বাস্থ্যোচ্ছল মানুষের জলকেলীর উচ্ছ্বাস তার প্রতিধ্বনি, বিবাহের পর স্বপ্নভাঙা যৌথ জীবন তার প্রতিবাদ।

উনিশ

মেলবোর্ণে এক ভদ্রমহিলার ঘরে বসে গান শুনছিলাম। রেকর্ডপ্লেয়ারে বেজে চলছিল বাঙলার লোকসঙ্গীত, ভাটিয়ালী, কীর্তন। একের পর আর একটি গান। শেষে বাজল বাঁশি—যমুনার তীরে রাধা-কাঁদা সুরে। এই গান আর বাজনার মাঝে অতিথি-আপ্যায়নের আয়োজনেও একটি রুচিকর সঙ্গতি ছিল; কাঠের প্লেন রেকাবে কেক পেস্ট্রি আখরোট, অজন্তা গুহার নক্সা-কাটা পেয়ালায় চা। কিন্তু মনটা তখন সমস্ত স্থূল লক্ষ্যের বাইরে, আর হয়ত সেই কারণেই রেকাবের কেক পেয়ালার চা অমনি পড়ে রইল। ইংরেজী কেতা দুরস্ত পরিবেশের মধ্যে অনেক দিনের বাঙালী আবেগ এবং একটি গোপন বঙ্গমানস বেদনা বাধ-ভাঙা জলের তোড়ে মুহূর্তে মুক্তি পেয়ে গেল। মনে হল, যুগান্তরের মোহনিদ্রা থেকে এই মাত্র জেগে উঠে না-জানি সে কবেকার হারানো সুরটি আবার ফিরে পেয়েছি।

গৃহকর্ত্রীর নাম মিসেস টম্পসন। জাতে ইহুদী। ধর্মাচরণে আমাদের মতই। —না-হিন্দু না-খৃষ্টান না-কিছু গোছের। মিসেস টম্পসনের বিয়ে হয়েছিল অবশ্য খৃষ্টানের সঙ্গে। দুঃখের বিষয়, সে বিয়ে তাঁর বেশীদিন ধোপে টেকে নি।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর ভদ্রমহিলা এখন মেলবোর্ণের ভুরাক অঞ্চলে কন্যা লোরেনকে নিয়ে একটি ভাড়াটে ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। লোরেন শিল্পী। তিনমাস পর বিয়ে হবে। এখন বসে বসে ছবি আঁকছে।

মেলবোর্ণে মিসেস টম্পসনের একটি দোকান আছে। ভারতীয় হস্ত শিল্পের রকমারি পণ্যের দোকান। ওদিকে আবার ভারতীয় নৃত্য গীত চিত্রশিল্পেও ভদ্রমহিলার অশেষ অনুরাগ। এলবাম খুলে ছবি দেখালেন। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের নানা ভূমিকায় মিসেস টম্পসনসহ অনেকগুলি মেয়ের ছবি। শাড়ি পরা, দীর্ঘকেশের বেণীবন্ধনে ফুল-গোঁজা, ফুলের গয়না পরা সব অষ্ট্রেলীয় মেয়ে। এ যেন একটি নৃত্যনাট্যে শুধু রূপদানের উদ্যোগমাত্র নয়, ভারতীয় চরিত্রে অভিনয় করতে করতে একেবারে ভারতীয় হয়ে পড়া। শুনতে কিন্তু অবাক লাগে যে এত গীত, এত সুর এবং বিদেশের বিজাতীয় ঘরে এমনি অভাবনীয় রুচি সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছেন একজন বাঙালী ঘরের মেয়ে। নাম তাঁর জ্যোতিকণা রায়। জ্যোতিকণা মিসেস টম্পসনের বন্ধু। সিডনির মহারাণী। মহারাণীর সংস্পর্শে এসেই মিসেস টম্পসন ভারতীয় রুচি পেয়েছেন, মেলবোর্ণের বাজারে ভারতীয় পণ্যের পসরা সাজিয়েছেন। বন্ধুত্বের টানে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মহারাণীকে আজ প্রায়ই সিডনি-মেলবোর্ণ করতে হয়। সেদিন রবীন্দ্র বিশ্বাস নামে আর এক ভদ্রলোক এবং আমি যখন বাঁশির সুরে তন্ময় ছিলাম, মিসেস টম্পসনের রান্নাঘরে বসে মহারাণী তখন মাছের ঝোল ভাত রান্না করছিলেন।

জ্যোতি রায়ের পূর্বপুরুষের বাস ছিল শান্তিপুরে। পিতার কর্মস্থল লখনউ শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতা গিয়ে পড়ার জীবন শুরু করলেন জ্যোতি রায়। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের দূর বংশে জন্মসূত্রে তাঁর পরিবার খুব রক্ষণশীল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মা বাবা কন্যার নৃত্যগীত শিক্ষার অনুমোদন করলেন না। কন্যাটি অগত্যা ঘরে বসেই শুরু করলেন নৃত্যচর্চা। হরেন ঘোষ তাঁর নৃত্য শিক্ষার গুরু, নৃত্য পটিয়সী সাধনা বোস তাঁর প্রেরণা। জ্যোতি রায় নাচ শিখলেন, গান শিখলেন। তারপর কত নাচের আসর গানের জলসা জমে উঠল জ্যোতি রায়ের প্রতিভায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু নাচ দেখে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়গান করতে তাঁকে পাঠালেন দেশের বাইরে। সিঙ্গাপুর হঙকঙ হয়ে গান গেয়ে নাচ দেখিয়ে জ্যোতি রায় এলেন সিডনিতে। এলেন আর থেকে গেলেন।

সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে জ্যোতি রায় ছয় মাস পর্যন্ত সারাটি অষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরে বেড়ালেন। তারপর শুরু করলেন ব্যবসা।—থাইল্যাণ্ড থেকে সিল্ক এনে দোকানে দোকানে বিক্রী করার কাজ। এরই অল্প দিন পরে সিডনির কিংস ক্রস অঞ্চলে একটি রেস্তোরাঁ খুললেন। ভারতীয় খাবারের দোকান। নাম দিলেন মহারাণী। মহারাণী টুকটাক করে এগিয়ে চলল। একটু পসার বাড়ল, আদর হল। ঠিক তখনই জ্যোতি রায়ের অষ্ট্রেলিয় অংশীদারটি হঠাৎ একদিন বেঁকে বসে বললেন—আমাকে এবার বিয়ে কর, নতুবা আমার অংশের টাকাটা ফেরৎ দাও। জ্যোতি রায় বললেন—তখন ত আর টাকার তেমন জোর ছিল না। মাত্র পাঁচশ পাউণ্ড অর্থাৎ হাজার পাঁচেক টাকা সম্বল। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবই বা কি করে মেনে নেব। বর জোটাবার জন্য বাঙলা ছেড়ে অষ্ট্রেলিয়ায় এসে ত আর হোটেল খুলি নি। আমার ব্যবসায়ের সাথীকে তখনই বললাম—বিদায় হও। ভাবলাম, নিজের শক্তিটাকে এইবার পরখ করা যাবে।

শক্তি পরীক্ষায় জ্যোতি রায় যে জিতেছেন তরে প্রমাণ আজকের মহারাণী। লণ্ডনের কিংস ক্রসের সঙ্গে যারা বৃথাই তুলনা করতে চান, তাঁদের মনে রাখা দরকার সিডনির কিংস ক্রসের বৈশিষ্ট্য অন্যরকম। সেখানে লণ্ডনের মত রেলস্টেশন নেই যে বার মুল্লুকের লোক শুধু রেলে চড়ে শহর থেকে বিদায় নিতে আসবে কিংস ক্রসে। সিডনির কিংস ক্রসে গ্রীক ইটালীয় চৈনিক হাঙ্গেরীয় জাপানী ভারতীয় ইত্যাদি কত জাতের খাবারের দোকান। দোকানে দোকানে কি দারুণ প্রতিযোগিতা। মহারাণী সেখানে আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। মহারাণী আজ শুধু একটি হোটেল রেস্তোরাঁ নয়, একটি বিশেষ নাম—বিদেশে বহু পরিচিত মহারাজা নামের সামনে একটি মস্ত চ্যালেঞ্জ। সাহেবদের দেশে দেশে অনেক কাল মহারাজারা অনেক কৌতুক জুগিয়েছেন, লোকের অনেক কৌতূহল জাগিয়েছেন। এবার যেন মহারাণীদের পালা। সিডনি প্রবাসী জ্যোতির্ময় মৌলিক মশাই জ্যোতি রায়কে রহস্য করে বলেন রায়সাহেব। কিন্তু আর সবাই বলেন মহারাণী। জ্যোতি রায় কিন্তু পরিহাস করে নিজেকে বলেন রায় বাঘিনী।

মহারাণীকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে জ্যোতি রায়কে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল, নিজ হাতে রান্না এবং বাসন ধোওয়ার কাজ করতে হয়েছিল, অবাঞ্ছিত বিয়ের প্রস্তাব উপেক্ষা করে নিজের পায়ে

দাঁড়াতে হয়েছিল। অবশ্য অবস্থার পরিবর্তনে একদিন তাঁর আর একজন অংশীদারও এসে জুটলেন, মাইনে দিয়ে রান্নার লোক, কাজের লোক রাখার ক্ষমতাও হল। আর তখনই জ্যোতি রায় হাতে পেলেন অনেক সময়, অন্য কাজে মন দেবার অনেক অবসর। খুলে বসলেন নাচ আর গানের ক্লাশ। তাঁর কাছে ভারত নাট্টম থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখার ভিড় পড়ে গেল।

ওদিকে সিডনির আর এক প্রান্তে আর একটি দোকান খুলে কিছু ভারতীয় মাল অষ্ট্রেলিয়ায় জনপ্রিয় করবার জন্য জ্যোতি রায় উঠে পড়ে লেগেছিলেন। সে এক বিশেষ পণ্য। ইণ্ডিয়ান হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট গুড্‌স। সিডনিতে তখন আরও পাঁচ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শুধুই টাকার দিকটাতে। যেনতেন প্রকারে টাকাটা হলেই হল। ভারতীয় মাল, ভারতীয় রুচি, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিদেশীর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে তাঁদের দায় পড়েছে। জ্যোতি রায়ের কিন্তু ভিন্ন পথ। একেবারে গোড়াতেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন, যে সিডনিতে তাঁর লক্ষ্য হবে মূলত অভারতীয় সমাজ।—বার মিশালী মানুষদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্যই তিনি কারি ভাত শাড়ি হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট গুড্‌স চালু করলেন, ভারত নাট্যম এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভারত সংস্কৃতির স্বাদ বিতরণ করলেন। সিডনিতে থাই সিল্কের প্রচলন যেমন তাঁরই মধ্যে হল, তেমনি একদিন জনপ্রিয় হল ব্যাঙ্গালোরী সিল্ক, পেতলের ফুলদানি, কাঠের কাজ করা ছোট টেবিল, ট্রে, বারকোস, টেবিল-লণ্ঠন ইত্যাদি সব ভারতীয় জিনিস। আজ মহারাণীর বিশেষ সার্থকতার প্রমাণ এই, যে সিডনি থেকে মেলবোর্ন, মেলবোর্ন থেকে এডিলেডেও তাঁর কর্ম-কেন্দ্রের বিস্তার হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাসের লোকেরা যথোচিত বিদ্যা বুদ্ধি স্বদেশ প্রেম থাকা সত্ত্বেও যখন মনে করেন, আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের টাকা খরচের ক্ষমতাটা আরও কিছু বেশী থাকলেই বিদেশে বসে বসে তাঁদের পক্ষে ভারতের স্বার্থে আরও বেশী কাজ করা সম্ভব হত, তখন রবিশঙ্কর উদয়শঙ্কর জ্যোতি রায়রা বহির্জগতে লোকের মন কত সহজেই জয় করেন, স্বদেশের কতই মঙ্গল সাধন করেন।

মহারাণীর আমন্ত্রণে খেতে গিয়েছিলাম তাঁর কিংস ক্রসের রেস্তোরাঁয়। একটি অনতি বৃহৎ হল ঘর। গোটাকত মোরাদাবাদী পেতলের লণ্ঠনে তখন মৃদু আলো জলছে। মধ্য ঘরের দেয়াল ঘেঁষে আলপনা-আঁকা, ছোট টিপয়ে মঙ্গল-ঘট বসানো। একদিকের দেয়ালে নটরাজের সুবৃহৎ একটি

চিত্র অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। তারই পাশে কার্পেটে কাজ করা মণিপুরী নৃত্যের দৃশ্যপট। অপর দিকে খাজুরাহের চিত্রাবলী। গান্ধী নেহেরু রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ঘর জুড়ে বিরাজ করছেন। একপাশে রঙ করা চটের পরদার উপর করাচি থেকে কেনা উটের চামড়ার রঙীন দীপাধার থেকে আলো এসে ঠিকরে পড়ে একটু রহস্যময়তার আভাস এনেছে।

হল ঘরময় ছোট ছোট সব টেবিলে ফুল তোলা টেবিল ক্লথ। দুজনে দুজনে মুখোমুখী বসে সবাই খাচ্ছেন। কাঠের বার কোণের পাঁপড় ভাজাগুলি কেউ কেউ বিশেষ ভঙ্গীতে বুড়ো আঙুলের চাপে মুড় মুড় করে ভেঙে মুখে ফেলছেন। একটু বিশেষ ধরণের দম্পতী এসে একপাশে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। নব বিবাহিত। বড় ব্যস্ত ভাব। অল্প একটু পরেই প্লেন ধরবেন ইউরোপের পথে। কিছুটা সময় হাতে আছে বলে এসেছেন মহারাণীর দ্বারে, আসন্ন হানিমুনের আগে নতুন কিছু খেয়ে মুখ বদলাতে। জিজ্ঞেস করলাম—এই খাবার বুঝি তোমাদের খুব ভাল লাগে? দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বললেন—নিশ্চিয় নিশ্চয়, তা বৈকি! মনে হল বৌটি সিডনির মেয়ে। ভদ্র মহিলা বললেন—এ পর্যন্ত যত রকমের বিদেশী খাবার খেয়েছি, সবার সেরা মহারাণীর খাবার। সুযোগ পেলেই এখানে এসে খাই। এ পাশে ওপাশের অনেক জোড়া চোখ দেখে কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ভদ্র মহিলার মন্তব্যে সবারই সমর্থন রয়েছে।

ভারতীয় লোকদের কেউ কালে ভদ্রে মহারাণীর খাবার খেতে গেলে নিয়ন আলোর ঝলকানি, বাসন পত্রের জেল্লা এবং জানালা দরজায় দামী পরদা না দেখে মনে মনে ভাবেন, বড় গরিবী বন্দোবস্ত। মহারাণী এমনি কিছু অভিযোগ শুনে অস্ট্রেলীয় খদ্দেরদের কাছে একদিন বললেন—কিংস ক্রসের অন্ত সব সভ্যভব্য রেস্তোরাঁর মত এটিকেও চটকদার করলে কেমন হয়? তাঁরা কিন্তু ব্যগ্রতার সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেছিলেন—ভারতবর্ষে আমাদের যাওয়াটা না ঘটলেও অন্তত কারি-ভাত ত এখানে বসে বসেই খাচ্ছি। তার সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশের কিছুটা পরিচয় যদি না-ই পেলাম, কারি-ভাতের স্বাদটা তবে ফিকে হয়ে যাবে না কি? জ্যোতি রায় অবশ্য এর পর প্রসাধনের জোরে মহারাণীর অঙ্গ সজ্জায় আর নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি।

কোণের দিকে ছোট একটি টেবিলে বসে খেতে খেতে গল্প, আর গল্প

করতে করতে খাচ্ছিলাম। মহারাণী বললেন—ডিনারের আগে যে একটু কিছু পান করবার ভদ্রসম্মত রীতি আছে নিশ্চয়ই মানেন? আমি বললাম—সে ত বিলেতি কায়দা, কারি ভাতের সঙ্গে অচল। মহারাণী আমার সঙ্গে একমত হতে না পেরে বললেন—কিন্তু কারি-ভাতটি খাচ্ছেন ত সিডনিতে বসে?—আর কে না জানে, সিডনিবাসীদের পূর্বপুরুষরা সবাই ছিল বিলেতের লোক? মনে হল, যুক্তির দিক দিয়ে হেরেই যাচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার না করে বললাম—আমারও একটু পান-দোষ আছে। এমন ভোজের শেষে এক খিলি মিষ্টি পান যদি খাওয়াতে পারেন তবে অশেষ খুশি হব। কিন্তু আমাকে খুশি করবার উপায় মহারাণীর ছিল না। কারণ সিডনির হাটে কেউ-ই পান বেচে না।

পানীয়-প্রস্তুতের কায়দা-সম্মত কত রকম মিকশ্চার মহারাণীর জানা আছে সে কথা জিজ্ঞেস করি নি। কিন্তু সেদিন তৈরী হয়েছিল এক আশ্চর্য রকমের পানীয়, হয়ত তাঁরই কোন নতুন এক্সপেরিমেন্টের খেয়ালে। ইটালীয় টামব্লারে খুব খানিকটা মধুর সঙ্গে অল্প ক' ফোঁটা জিন, পেগ-খানেক ভারমুথ এবং একটু গোলাপ-নির্যাসের নাড়া-খাওয়া ককটেলে দু আনা সাইজের চৌকো সন্দেশের মত এক টুকরো বরফ—তার উপর অল্প কিছু আপেল-কুচি। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে বললাম—এটি বুঝি মহারাণী-স্পেশাল?

মহারাণীর নিজের গেলাসে ছিল হুইস্কি আর বরফ; হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গেলাসের বরফ গলে জল হল, হাতের সিগারেট পুড়ে ছাই হল—হয়ত ইচ্ছা করেই খেলেন না, কিংবা খেতে ভুলে গেলেন। অথচ এমন দিনও তাঁর গেছে যখন গেলাসের পর গেলাস গিলেই চলেছেন, রাশি রাশি সিগারেট টেনেই চলেছেন। আবার হয়ত হুইস্কি সিগারেট বীয়ার ব্র্যাণ্ডি মাসের পর মাস একেবারেই বন্ধ—খাওয়ার কথা মনেও হয় নি, তেমন কোন উপলক্ষও ঘটে নি।

তখন জেনারেল কারিয়াপ্পা অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতের রাষ্ট্রদূত। সিঙ্গাপুর হংকং হয়ে জ্যোতি রায় সবে সিডনিতে এসেছেন। কিন্তু সিডনির অপরিচিত পরিবেশ দেখে মনটা তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল। ভাবলেন, পত্র পাঠ বিদায় হবেন। কারিয়াপ্পা কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—কিচ্ছু ঘাবড়িও না জ্যোতি, সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি অল্পদিন পরই সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, জেনারেল কারিয়াপ্পার ব্যক্তিগত তৎপরতায়। সিডনি ভাল লাগতে শুরু করেছিল। প্রাথমিক অস্থির ভাবটি কেটে গিয়ে মনটা ক্রমে

আগ্রহ হয়েছিল। তারপর জেনারেলের আহ্বানে তিনি সিডনি থেকে কতবার ক্যানবেরায় গিয়েছেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে সংস্কৃতি-সম্মেলনে গান গেয়েছেন, নাচ দেখিয়েছেন। অনেকদিন পরের কথা। জ্যোতি রায় তখন জেঁকে বসেছেন। জলন্ত সিগারেট হাতে দেখে জেনারেল কারিয়াপ্পা একদিন বললেন—শাড়ির সঙ্গে সিগারেট কি খাপ খায় জ্যোতি? খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্যোতি বলেছিলেন—বেখাপটি যে কার কিসে হয় আজও তা বুঝে উঠতে পারি নি জেনারেল। কালাপানি পার হয়ে সিডনিতে এসে থাই সিল্কের ব্যবসা করা অথবা হোটেল খোলাও কি ভারতীয় মেয়ের পক্ষে খুব খাপ-খাওয়ানো কাজ?

সেদিন টেবিলে টেবিলে খাবার পরিবেশন করছিল শার্দুল সিং। পাঞ্জাবী যুবক। ওর কাজের ধরণ অনেকটা পুস্তক-প্রকাশকের দোকানে পার্ট-টাইম কাজ করে করে মেড-ইজি-নোট-লেখা গরিব প্রফেসারের মত। শার্দুল সিং ঘটনার নানা অভিঘাতে সিডনিতে এসে জুটেছিল। তখন বয়স কম। তবু শুভ বুদ্ধির উদয়ে শার্দুল পড়াশোনার পথই বেছে নিয়েছিল। অর্থনীতি শাস্ত্রে পি-এইচ-ডি শার্দুল সিংর ছাত্র দশা সবে শেষ হয়েছে। কিন্তু যে মহারাণীর দরবারে এসে ছোট বেলাকার অনটনের দিনে হাজির হয়েছিল, সে দরবার ছেড়ে এখনও দূরে যায় নি।

আজ মহারাণী নিজেই রান্না করেছেন।—ভাত, সর্ষের তেল প্রলিপ্ত উচ্ছে-ভাতে, ঢেঁড়স ভাজা, পেঁয়াজ লঙ্কায় মশুর ডাল, মাছের ঝোল, রসম। খাওয়ার শেষে দৈ আর পেঠা। লাউ থেকে তৈরী উত্তর ভারতীয় মিঠাই এই পেঠা নামক পদার্থটি এখন একটি 'মহারাণী স্পেশাল' হয়ে পড়েছে। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা বাঙালীর মত তেতো থেকে শুরু হয়ে মিষ্টিতে শেষ হলেও তার মধ্যে ছিল একটি সর্বভারতীয় বৈচিত্র্য। সেদিন ভাবতে ভাল লাগল, যে অস্ট্রেলিয়ার সাহেব লোকগুলো এইখানে এসে আমাদের এইসব নেটিভ জনোচিত খাবার খেতে দিনের পর দিন ভিড় করছেন। উচ্ছে-ভাতের পদ হয়ত তাঁদের পাতে পড়ে না, তবে আদা-লঙ্কা পেঁয়াজ-এলাচে মসলা-কষা মাংসের স্বাদ এবং গন্ধের সঙ্গে গরু ভেড়ার সেদ্ধ মাংস যে তুলনীয় নয়, সেই কথাটি তাঁরা ভাল করেই বুঝে নিয়েছেন। এক কালে অস্ট্রেলিয়ার লোকদের কাছে কিন্তু প্রচার হয়েছিল, অ-খাদ্য ঘোষের মাংস খাওয়ার উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টাতেই নাকি ভারতবর্ষে মশলা খাওয়ার চল হয়েছিল।

কাজের চাপে ব্যবসায়ের প্রসারে জ্যোতি রায়ের আজ অবসর নেই। অথচ রেস্তোর*াটি তাঁর তেমন লাভের ব্যবসা নয়। বর্তমান স্কটিশ অংশীদারটি মাঝে মাঝেই বলেন – মহারাণীর পাট চুকিয়ে দিলে কেমন হয়? জ্যোতি রায় বললেন – এই প্রস্তাবটা কিন্তু আমি মোটে সইতে পারি না। মহারাণীকে আমি ত ব্যবসা বলে মনে করি না। এটা আমার বাড়ি। সবাইকে এইখানে খাওয়াই, নিজের হাতে পরিবেশন করি। নিজেও কখন রাঁধি। মনেই হয় না আমি একা। নিজের দেশকে যে আমি এইখানে ধরে রাখতে পেরেছি।

মহারাণীকে ঘিরে আছেন জ্যোতিরায় আর জ্যোতিরায়কে আশ্রয় কার আছে শার্দূল সিং, মিসেস প্রধান, দারার দল। মিসেস প্রধান রান্না করে, আর দারা আনাজ মাংস মাছ কাটে, বাসন ধোয়, খুচরো ফাইফরমাইজ খাটে। আমাদের খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে মহারাণীর কানের কাছে ঝুঁকে দারা বলল—দুটি বীয়ার খাব মহারাণী? আচ্ছা, ফ্রেজার থেকে বের করে নাও বলে হুকুম দিলেন। একটু পরে শার্দূল এলো আর একটি আর্জি নিয়ে।—কিছু টাকা চাই মহারাণী। আজ যে পকেট বড় খালি। নিস্পৃহ নিরাসক্তে আলমারীর চাবি শার্দূলের হাতে দিয়ে বললেন টাকাটা বের করে নিতে। মহারাণী হোটেল খুলেছেন, ব্যবসা করছেন, মানুষ চরাচ্ছেন। অথচ ভাবখানা এমন, যেন বোঝা নিয়েছি, তার ভার গ্রহণ করি নি।

দারার বাবা ঘরানা সিং তার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে সাংহাইয়ে কাপড়ের ব্যবসা করত। মন কষাকষি হতেই একদিন সাংহাই ছেড়ে পালিয়ে এলো সিডনিতে। তখন অস্ট্রেলিয়ায় কলোনীযুগের জড়তা একটু করে কাটতে শুরু হয়েছে। সিডনি ব্রীজ তখনও তৈরী হয় নি। ঘরানা সিডনিতে মজুরের কাজ করে দিব্যি চালাচ্ছিল। সিডনি কোডের কাছে একটি 'পাবে' গিয়ে একদিন সে বীয়ার খেতে ঢু মারল। 'পাব' বড় ভীষণ স্থান। সেখানে মানুষরা আর যেন মানুষ থাকে না। গেলাস গেলাস মদ গিলে ভাবটি তাঁদের এমন হয়, যেন সামনে বৌ পেলে তালাক দেবে, ছেলে পেলে ত্যাজ্য করবে, কুস্তি করার লোক পেলে আলু ভরতা করে ছাড়বে। মদে টৈটুম্বুর একটি লোক এগিয়ে এসে ঘরানাকে বলেছিল—ওয়ান্ট এ ফাইট, ম্যাইট? ইংরেজী-না-জানা ঘরানা উত্তর দিয়েছিল—ইয়েস। ব্যস, 'ফাইট' শুরু হয়ে গেল। মনের আনন্দে আক্রমণ করে কিল ঘুষি লাথির চোটে মাতালটি মুহূর্তে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল। এই ঘটনার পর

ঘরানা আরও পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিল এবং সেই পঞ্চাশ বছরই আর কারও কোন কথায় সে 'ইয়েস' বলে নি।

পাবের মার না ভুলে শক্তি অর্জনের প্রতিজ্ঞায় ঘরানা ডন বৈঠক করল, কুস্তি শিখল। তারপর কুলীগিরি ছেড়ে শহরে শহরে কুস্তি করে বিস্তর পয়সা কামিয়ে ভিক্টোরিয়া রাজ্যে গিয়ে ঘরানা যখন গমের ফার্ম কিনল, তখন তার নিজের বয়স অনেক, তবে বৌয়ের বয়স কম। কারণ ধনী হওয়ার পর দেশে গিয়ে বিয়ে করে সবে সে বৌ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় এসেছিল।

ঘরানার মৃত্যুর পর তার বিধবা জলের দামে ফার্ম বিক্রী করে পাঞ্জাবে চলে গেল। কিন্তু তখনও তার হাতে দেদার টাকা। ঘরানার উইলের বলে পুত্র দলিপ দারা কানোয়ালদের পকেটও বেশ ভারী। মাস কয়েকের মধ্যে দারার মায়ের অল্প বয়স আর অনেক টাকার লোভে পড়ে এক বুদ্ধিমান সর্দারজী তাকে বিয়ে করে ঘরে তুলল। আর অপক্ক বুদ্ধির দারারা পথে পথে ঘুরে ফতুর হল। ঠিক তখনই একজন হৃদয়বান পাঞ্জাবী উকিল দারাদের নথীপত্র ঘেঁটে বললেন—অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে যখন তোমাদের জন্ম হয়েছে অন্তত সেখানে ফিরে যেতে ত কোন বাধা নেই। তারপর অষ্ট্রেলীয় সরকারের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন এবং তারই ফলে দারাদের অষ্ট্রেলিয়ায় পুনরাগমনের আবেদন মঞ্জুর হল। দারা এসে উঠেছিল কুইন্সল্যাণ্ডে। তার এক পিতৃবন্ধুর আশ্রয়ে। সেখানে কাজ করে কিছু পয়সা হল। তখন সিডনির শ চারেক মাইল উত্তরে জমি কিনে কলার চাষ শুরু করল। ইতিমধ্যে সিডনির মহারাণীর সঙ্গেও তার পরিচয় হয়ে গেছে। কলার মরসুম শেষ হলেই দারা এখন প্রতিবছর বাকী সময় কাটায় মহারাণীর রেস্তোরাঁয়। খাটে, খায়, পয়সা কামায়। চারশ মাইল দূরে বৌ তখন কলাবাগান তদারক করে।

এখন আর শার্দুলের মত দারার দাড়ি নেই। গুরু নানক স্বর্ণ মন্দির গ্রন্থ সাহেব নিয়ে সে আর এখন মাথা ঘামায় না। শিখ বলেও তাকে চেনা যায় না। পাঞ্জাবী এবং হিন্দী বলতে জিহ্বা তার একটু জড়িয়ে আসে। অস্ট্রেলীয় কায়দায় মেটকে ম্যাইট, এইটকে আইট বলাও তার রপ্ত হয়েছে, যদিও কথ্য ইংরেজী সে বলে অত্যন্ত অকথ্য রকমে। মজার কথা, শার্দুল এবং অন্য সব সর্দারজীর মত দারাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, যে দাড়ি পাগড়ি না থাকলে কেউ শিখ হয় না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের

অস্ট্রেলিয়াতেও পুত্রদের তাই সে দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা শিখরূপে গড়ে তুলবে। জানি না মোগল সিংহাসনের দাবীদার রাজকুমারদের নাম মনে রাখার কৌশলটি ইতিহাসের জ্ঞান-গর্বী প্রাইভেট মাষ্টারের মত সে তার পুত্রদের শেখাবে কি না—আওরংজেব, মুরাদ থাকে সোজা হয়ে দাঁড়া!

মিসেস প্রধানের উপরই মহারাণীর অশেষ স্নেহ। তার স্বামী আছে, পুত্র কন্যা আছে, সিডনি শহরে মাথা গোঁজার ঠাঁইও আছে। কিন্তু স্বামীটি তার পর-নারীতে আসক্ত। একদিন কেঁদে এসে মিসেস প্রধান বলেছিল—মহারাণী, তোমার এইখানে একটু রোজগারের পথ করে দিলে আমি একবারটি চেষ্টা করে দেখতাম সন্তানগুলিকে মানুষ করতে পারি কিনা। সেই মুখ খোলার দিন থেকেই রেস্তোরাঁতে থেকে যাওয়ার তার সুযোগ হল। মহারাণী বললেন—মারাঠী মিসেস প্রধান এখন বাঙালীর মতই শুক্তো ঘণ্ট কপির ডাল্‌না রান্না করে, আর আমার মত তাই খায়। শুধু খদ্দেরদের জন্য রাঁধে মাছ, ডাল, মাংসের ঝোল। পেঁয়াজটা লঙ্কাটা বড্ড বেশী খরচ করে বলে মাঝে মাঝে ধমকাই। আমি যেন ওর শাশুড়ী।

অবতার পুরুষদের আবির্ভাব ঘটলে নাকি তাঁর লীলাসঙ্গীরাও কোথাও না কোথাও জন্ম নিয়ে খুঁজে পেতে এসে তাঁরই সঙ্গে মিলিত হন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মহারাণীর সঙ্গীসাথীগুলোও কোথা থেকে কি করে তাঁরই মত ছিট্‌কে এসে এক জায়গায় জড় হয়েছে। যোগোন যোগ্যম যুজ্যতে কথাটা খুবই খাঁটি। জ্যোতিকণা রায় ভারতীয় সবাইকে সিডনির হোটেলে এনে শুধু একত্র করেন নি—বাঙালী মারাঠী পাঞ্জাবীর সঙ্গে একেবারে এক করে ফেলেছেন। সাহিত্য রথী মুল্লুক রাজ আনন্দ এবং এ-কে নারায়ন একবার সিডনিতে এসেছিলেন। কাজের শেষে দিনান্তে তাঁরা রোজ ছুটে এসেছেন মহারাণীর খাবার খেতে। দরজা থেকেই মাদ্রাজী নারায়ণের হাঁক শোনা যেত—অন্নপূর্ণা খেতে দাও। দোষা সাম্বার রসমের আয়োজন তাঁর কাছে শুধু ঘরের খাবার বলেই মনে হয় নি—ধনে পাতার ডাল, বড়ির ফোড়ন দেওয়া লাউঘণ্ট, সুক্তো এবং আলু ছেঁচকির নিরামিষ পদে ভাত খাওয়ার শেষে কিসমিস-দেওয়া পায়স এবং রেকাব ভরা রসগোল্লায় মিষ্টিমুখ করে অবাক হয়ে ভেবেছেন, একটি মেয়ের পক্ষে কি করে সম্ভব, বায় জাতির ভের স্বাদের সঙ্গে পোষ মানিয়ে এমনি রান্না করা—মহারাণীতে এমন একটি সর্বভারতীয় ছাপ ফেলা। তার উপরও নাচ, গান আয়না এবং শ্যামা

চিত্রাঙ্গদার অভিনয় শেখানোর কাজ আছে; জলসা জাঁকিয়ে তোলা এবং সংস্কৃতি সম্মেলনে বক্তৃতা করাও আছে।

দীর্ঘ পনেরো বছরের অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসের মধ্যে জ্যোতি রায় মাত্র একবার দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যেন বিদেশে এসেছেন। দিল্লীর সড়কগুলো আর তত মনে নেই, কলকাতার রাস্তাগুলিতেও একটু গোলমাল হয়। রাসবিহারীর মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য একদিন অপেক্ষা করছিলেন। এক ভদ্রলোক গুটি গুটি এগিয়ে এসে বললেন—মাফ করবেন। আমি একটি মেয়েকে জানতাম। নাচে গানে তার বড় নাম। দেখতে আপনারই মত। জ্যোতি রায়ের মনে হল—আশ্চর্য, কলকাতা আজও আমাকে ভোলে নি। সিডনির কর্মক্লান্ত দিনে আজও তাঁর সাধ হয় নিজের দেশেই ফিরে যেতে। স্নেহের টানে লোকে সেখানে একবারটি বলবে—জ্যোতি তুমি কেমন আছ। কলকাতা প্রসঙ্গে জ্যোতি রায় কত কথাই বললেন।—বললেন তাঁর হরেনদার কথা, সাগরদা, (দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ) শান্তিদার (সঙ্গীতাচার্য শান্তিদেব ঘোষ) কথা। হরেনদা আর শান্তিদার কাছে তাঁর যে অনেক ঋণ।

অনেক আলাপের পর প্রশ্ন করলাম—জীবনে কখনও প্রেম করেছিলেন মহারাণী? সিডনির মহারাণী ক্ষণেকের জন্য কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে নাচ-শেখা গান-গাওয়া জ্যোতিকণা রায়ের দিকে ফিরে চাইলেন। তারপর কিছু মাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন—প্রেম আবার করি নি! প্রেমের জন্য আমি যে—। যাক্ গে, কি আর হবে সে কথা বলে, আর কি বা হবে সে কথা শুনে। জ্যোতি রায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই বলেছিলেন। বলেছিলেন তাঁর জীবন-ইতিহাসের একটি সকরুণ অধ্যায়ের কথা। তখন তিনি কলকাতায় কলেজের ছাত্রী। প্রেম হল এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে। সদ্য বিলেত ফেরত। রূপ গুণ মিলিয়ে পাত্র হিসেবে খাসা। অথচ অনেক মন দেওয়া নেওয়ার পর অনেক এগিয়ে জ্যোতি রায় অনেক পিছিয়ে গেলেন। হঠাৎ কেন জানি তাঁর মনে হল—বিয়ে! সে ত আমার জন্য নয়। আমার যে অনেক কাজ আছে। প্রত্যাখ্যাত যুবক ঘরে ফিরে গিয়ে চারদিন পর জ্যোতি রায়ের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সদ্য ঠিক করা বিয়ের চিঠি। সোনার জলে লেখা। চোখের জল মুছে জ্যোতি রায় রওনা হলেন হঙকঙের পথে।

জ্যোতি রায় এখন পরের কত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান। মিসেস

প্রধান, শার্দূল দায়াদের সমস্যা। হস্ত শিল্পের সমস্যা। কখনও বা ভারতবর্ষের সমস্যা। সম্প্রতি আবার উঠে পড়ে লেগেছেন একজন অসমীয় যুবকের সমস্যা নিয়ে। দুই বছর কোর্টশিপের পর তার অষ্ট্রেলীয় প্রণয়িণী হঠাৎ জানিয়েছে যে এখন তারা শুধু বন্ধু-মাত্র। প্রণয়ী যুগল নয়। বঞ্চিত যুবক জ্যোতি রায়ের কাছে ছুটে এসেছে সান্ত্বনা খুঁজতে। সব কথা শুনে আমি কিছুটা রহস্য করেই বলেছিলাম—এই মেয়েটিকে দোষারোপ করা আপনার মোটে শোভা পায় কি? মনে হল, জ্যোতি রায় কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু মুখ খুলতে পারলেন না।

জ্যোতি রায়ের দল সব অদ্ভুৎ লোক। এরা গড়তে পারে, ভাঙতে পারে, হয়ত সুযোগ পেলে বিশ্বজয়ও করতে পারে। এদের মত শক্তমনা মানুষ নেই— আবার আবেগের চাপে চোখের জলে একাকার হওয়ারও বিরাম নেই। একদিন যাকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আজও তারই বিয়ের চিঠি জ্যোতি রায় নিজের কাছে রেখেছেন সঙ্গোপনে, হয়ত নির্বুদ্ধিতার কাছে আপন পরাজয়ের চিহ্নের মত। বহু সহস্র মাইল দূরে সিডনির স্বেচ্ছা-নির্বাসনে প্রত্যাখ্যাত সেই অভিমানী যুবকের কুণ্ঠিত মুখটি আজও তার মনে পড়ে কিনা জানিনা। হয়ত সেই ব্যর্থ প্রেমিক জ্যোতি রায়কে ক্ষমা করেছে, এতদিনে ভুলেও গেছে। মনে হয় জ্যোতি রায় নিজেকে যেন ক্ষমা করেন নি।

সিডনি থেকে ছুটি নিয়ে জ্যোতি রায় এবার নাকি বের হবেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। জ্যোতি রায়ের এমন অবস্থায় কে কবে না বেরিয়েছে অন্তহীন বিশ্বপরিক্রমায়, কে বসে থেকেছে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে? এদের জন্মও হয়ত একটি অশুভ দিনের কোন এক অশান্তি লগ্নে। জীবন ভোর এরা শুধু ঘুরে বেড়ায়, তবু জানে না কেন ঘুরছে—কার আহ্বানে, কোন আকর্ষণে। জীবনের অনেক পাওনা এরা না চাইতেই পায়, আবার পেয়েই হারায়— পাওনার ধন পায়ে ঠেলতে ঠেলতে অবুঝের মত এগিয়ে চলে। এরা প্রেম করে ভালও বাসে—আবার ইপ্সিত ধন যখন হাতের মুঠোয় আসে, অত্যন্ত অসতর্ক উদাসীর মত আপন ভোলা হয়ে,সব ভণ্ডুল করে দেয়।

অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশে একজন বাঙালী মেয়ের সংগ্রাম, তাঁর লক্ষ্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনীতেই আমার ছিল আসল উৎসুক্য। ভেবেছিলাম ভারতের আর কোন্ জায়গার মানুষ কেমন করে অষ্ট্রেলিয়ায় এসে আপন

পায়ে দাঁড়িয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ানদের কি সম্পর্কই বা তাঁদের সঙ্গে গড়ে উঠেছে সে কাহিনীও কিছুটা একই সঙ্গে বলা যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টান পড়ল জ্যোতি রায়ের একান্ত আপন কথায়। অখণ্ড মনোযোগে সব কথা শুনে মনে বড় বেদনাবোধ হল।

আজ জ্যোতি রায়ের অনেক অর্থ প্রতিপত্তি। সিডনিতে একাধিক বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে রেখেছেন। সব কটি বাড়িতে নিজের জন্যও খালি রেখেছেন একটি করে ঘর। সাধ হয়ত কখনও গিয়ে সেইখানে থাকবেন। জ্যোতি রায় মহোৎসাহে বললেন প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বোণ্ডাই বীচের পাশে তাঁর অধুনাতম বাংলোর কথা। বড় প্রিয় বাড়ি তাঁর। তখনও ভাড়াটে বসে নি। নিজের কক্ষে প্রথম দিনে মনের আনন্দে শুয়েছিলেন। ছটার আগেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পাখী ডাকার শব্দে। আধো ঘুমে আধো জাগরণে তাঁর মনে হয়েছিল কত চেনা যেন সেই স্বর—তবু যেন কত দূরের। আবার যখন ভোরের পাখীরা ডাকল, তখন জ্যোতি রায় জেগে উঠেছেন। মাত্র পঁচিশ গজ দূরের প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়া জানালার ওপারে সোঁ সোঁ করছিল। মনটা তাঁর অকারণ ব্যথায় ভরে উঠল। মনে হল, এত পাখীর কলকণ্ঠে যেন এমন একটি পাখী আছে যার সুরটি তাঁর বিশেষ ভাবে চেনা। হাই তুলে জ্যোতি রায় ভাবলেন, এক পেয়ালা চা হলে মন্দ হয় না। রবিবারের সকালে দশটার আগে যেখানে লোকের ঘুম ভাঙে না, সিডনির সেই পাখী ডাকা ভোরে অসময়ে জেগে তাঁর ভারী আশ্চর্য বোধ হল।—শুয়ে শুয়ে ভাবলেন, পাখীরা কি করে জেনেছে যে এইখানে জ্যোতি রায়ের বাড়ি, আর সেই বাড়ির গাছে গাছেই নীড় বেঁধে এমন নিঃসঙ্গ সকালে তাদের ঘুম ভাঙানো গান গাইতে হবে। ঠিক তখনই সেই এলোমেলো ভাবনাগুলোর মুহূর্তে জ্যোতি রায় গভীর বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, অস্ট্রেলিয়ার কোকোবারো বেল-পাখী রোবীন পাখীর দলে বাঙলা দেশের একটি চিরচেনা পাখীও আছে। ডালিম গাছের ডালে বসে সে-পাখী তখনই আবার ডেকে উঠল সেই চিরকেলে বুক-কাঁপানো সুরে—বউ কথা কও।